তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

ষোড়শকল্প।

দ্বিতীয় ভাগ।

১৮২৬ শক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৬১। কলিগতাব্দ ৫০০৫। ১ চৈত্র মঙ্গলবার।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ষোড়শ কল্পের দ্বিতীয় ভাগের সূচীপত্র

বৈশাখ ৭২৯ সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ ৭৩০ সংখ্যা।

আষাঢ় ৭৩১ সংখ্যা।

শ্রাবণ ৭৩২ সংখ্যা।

ভাদ্র ৭৩৩ সংখ্যা।

আশ্বিন ৭৩৪ সংখ্যা।

কার্ত্তিক ৭৩৫ সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ ৭৩৬ সংখ্যা।

পৌষ ৭৩৭ সংখ্যা।

মাঘ ৭৩৮ সংখ্যা।

ফাল্গুন ৭৩৯ সংখ্যা।

চৈত্র ৭৪০ সংখ্যা।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

শক ১৮২৫। ২৬ ফাল্গুন বুধবার।

উপদেশ।

ব্রাহ্মজীবনের আদর্শ ব্রাহ্মজীবনের বিষয় আলোচনা করিব মনে করিতেছি। যখন সমস্ত জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, দেখিতে পাই সকলই নিয়মের উপর চলিতেছে। পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ তথাপি তিনি তাঁহার সৃষ্টিকে নিয়মের উপর রাখিয়াছেন। ব্রাহ্মও সেইরূপ সকল বিষয়ে ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তিনি সকল বিষয়ে নিয়মপরায়ণ হইয়া চলেন। যথেচ্ছাচার তাঁহার জীবনের কোথাও লক্ষিত হয় না। সংসার সমুদ্রবিশেষ। এখানে আমাদের দেহ-মনতরী -জীবন-তরী ভাসিতেছে, সমুদ্রে যাইতে হইলে, জলপথে যাইতে হইলে, যেমন তরণীর হাইলের প্রয়োজন হয়; হাইল ভিন্ন তরণী চলে না, সংসার সমুদ্রে তেমন জীবনতরণী চালাইতে হইলে তাহার নিয়মরূপ হাইলের আবশ্যক। প্রথমে নিয়ম সকল আলোচনা করিয়া স্থির করিতে হয়; এবং কি কি সুনিয়ম অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা—মহাজনেরা জীবন যাপন করিয়াগিয়াছেন, তাহারও অন্বেষণ করিতে হয়; সেই সকল নিয়ম অবগত হইয়া জীবনের প্রথম ভাগ হইতে তাহা অভ্যাস করা উচিত। ইহা ভিন্ন জীবনকে নিরাপদ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সংসার প্রলোভন-সংকুল স্থান। প্রলোভনের বস্তু বার বার সম্মুখে আসিবে। তখন তাহার সহিত সংগ্রাম করিবে কিসের বলে? পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে হইবে। সাবধনতা ভিন্ন এখানে এক পদও অগ্রসর হওয়া যায় না। অর্জ্জুন জানিতেন, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ বাধিবেই বাধিবে। সুতরাং তিনি নিশ্চেষ্ট ও অসাবধান ছিলেন না। স্বর্গ ও মর্ত্ত্য লোক ভ্রমণ করিয়া উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র, পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কত তপস্যা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মও সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে জানিয়া, সেইরূপ করিয়া থাকেন। এস্থান অতি কঠিন স্থান; এখানে মায়াবশে রসোল্লাসে দিন কাটাইলে চলিবে না। প্রকৃত ব্রাহ্মজীবন লাভ করিতে হইলে, অর্জ্জুনের ন্যায় সাবধান

তপঃপ্রভাবশালী ও সংযত হইতে হইবে। তবে সংসারের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ; নতুবা দুঃখ শোক ও অনুতাপে ক্ষত বিক্ষত হইতে হইবে।

প্রকৃত ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি শরীর মন আত্মা তিনই পবিত্র রাখিতে যত্নবান থাকেন, দৈবদুর্ব্বিপাকের উপর মনুষ্যের হস্ত নাই, কিন্তু মনুষ্যের কর্ত্তব্য যাহা তাহা করিতে তিনি কখন পশ্চাৎপদ নহেন। শরীর দেবমন্দির, এই মন্দিরকে তিনি যৎপরোনাস্তি যত্নের সহিত রক্ষা করেন। শরীর যদি অনাচার ও অত্যাচারে অপবিত্র হয়, রুগ্ন ভগ্ন হয়, তাহা হইলে মন এবং আত্মাও অপবিত্র হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ শরীরী জীবের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছুই লাভ হয় না। সপ্তর্ষিমণ্ডল যেমন ব্রহ্মমূহূর্ত্তে উঠিয়া স্নান করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতেন, তিনিও সেইরূপ প্রত্যূষে উঠিয়া স্নানাদি শারীরিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া ব্রহ্মোপাসনায় রত থাকেন। ব্রহ্মোপাসনা তাঁহার হৃদয়ের প্রিয়ধন, ইহাতে বাধা পাইলে তিনি সর্ব্বত্যাগী হইতে পারেন, কি আনন্দ কি স্বর্গীয় বলই তিনি ইহা দ্বারা সঞ্চয় করেন। সূর্য্যের জ্যোতি চন্দ্রে পড়িলে চন্দ্র যেমন জ্যোতিষ্মান্ হয়, ঈশ্বরের জ্যোতি ব্রহ্মপরায়ণের হৃদয়ে—আত্মায় পড়িলে তাঁহার তেমনি অপূর্ব্ব শ্রী হইয়া থাকে। সেই শ্রীই তাঁহার সংসার ও দেশকে শ্রী ও সম্পদে বিভূষিত করে। মধুময় ঈশ্বর তাঁহার জিহ্বায় নৃত্য করেন; সুতরাং তাঁহার বাক্য ও হৃদয় মধুময় হইয়া থাকে। কটু কথা কাহাকে বলে—কঠিন কথা কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানেন না। কোকিল কিসের গুণে জগৎকে মাতাইয়া তুলে? এক মিষ্ট স্বরের গুণে। তিনিও তেমনি এক সত্য সরল মৃদু মধুর সম্ভাষণে জগৎকে বশীভূত করেন। দুষ্ট লোকের ন্যায় তিনি কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া কোন কথা কহেন না। যে এরূপ করে, সে চণ্ডাল অপেক্ষাও নীচ ও কঠিন-হৃদয়। তিনি মহাজ্ঞানী বিদুরের উপদেশ অনুসারে চলেন, সে উপদেশ এই "অন্যের মর্ম্ম-পীড়া দিবে না, কাহাকেও নিষ্ঠুর বাক্য কহিবে না, সমাগত ব্যক্তির সহিত অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক ব্যবহার করিবে না, এবং যে কথা কহিলে, অন্যে বিরক্ত হয়, এবম্ভূত বাক্য প্রয়োগ করিবে না। দুর্ব্বাক্য লোকের মুখ হইতে বিনির্গত হয়, কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই বাক্য উচ্চারিত হয়, উহা তাহার মর্ম্মস্পৃক হইয়া অহোরাত্র তাহাকে যন্ত্রণা দেয়।" তিনি সতত ক্ষমাশীল, শত্রুকেও তিনি হৃদয়ের সহিত ক্ষমা করেন, তিনি আশ্রিতবৎসল, তিনি জগৎকে আত্মবৎ দেখেন, তিনি নিজের সুখ ও ভোগবাসনা খর্ব্ব করিয়াও পরের দুঃখ মোচন করেন। দয়া ও প্রেমে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ থাকে। তিনি কুসংস্কারের বশীভূত হন না। কুসংস্কার পাপ অপেক্ষাও তীব্রতর ও অনিষ্টকর। তিনি সতত আত্মানুসন্ধান করেন, কদাপি আপনাকে মার্জ্জনা করেন না। আপনার ক্ষুদ্র ত্রুটি ও পাপ অনুসন্ধান করিয়া সংশোধন করেন। তিনি পরের ছিদ্র অন্বেষণ করেন না। পরের ধন মান ও যশে ঈর্ষা প্রকাশ করেন না। তিনি জগৎকে অনিত্য ও দুই দিনের জানিয়া কোন রূপে কিছুরই নিমিত্ত অহঙ্কার করেন না। তিনি সকলের নিকট বিনয়-নম্র ব্যবহার করেন। আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তির সহিতও আলাপ করেন। তিনি মৃত্যুকে স্মরণ করিয়া থাকেন। মহাত্মা রামমোহন রায়ের বৈরাগ্য-উদ্দীপক সেই ব্রহ্মসঙ্গীত তাঁহার

হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজিতে থাকে; "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর। অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর। যার প্রতি যত মায়া, কি বা পুত্র কি বা জায়া তার মুখ চেয়ে ততই হইবে কাতর। গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ, দৃষ্টি হীন নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর।" এক দিকে মৃত্যুকে স্মরণ অন্য দিকে অমৃতকে স্মরণ করিয়া তিনি এখানেই অমৃত লাভ করেন। তিনি অন্তরে বাহিরে অমৃতস্বরূপকে উপলব্ধি করেন। সখা যেমন সখার সহিত কথা কহেন, তিনি তেমনি নিয়ত তাঁহার পরম সখার সহিত বাস করিয়া, তাঁহার সহিত কথা কহেন। তিনি তাঁহাতে আত্ম সমাধান করিয়া কি অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করেন, তাহা কে বলিতে পারে? তিনি তাঁহাকে অন্তরে দেখিয়া বলিয়া উঠেন," কি সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয় দুয়ার খুলিয়ে, দুর্লভ দরশন লাভ হলো জীবনে ধন্য তাঁর করুণা"।

"স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি"

তিনি আনন্দনীয় পর ব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন, তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং হৃদয়-গ্রন্থি সমুদয় হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।" আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া থাকি; কিন্তু জীবন যদি ব্রহ্মময় না হয়, যদি ঘরে বাহিরে ব্রহ্ম প্রাপ্তির অনুরূপ জীবন যাপন না করি, তবে জীবন সে মৃত্যুসমান, বরং তদধিক। জীবন কি কেবল দুঃখ তাপ ও অনুতাপাগ্নি সহ্য করিবার জন্য? উঠ জাগ। করুণাময়কে ডাক। তাঁর নিকটে পবিত্র হইতে প্রার্থনা কর। তাঁহার নিকট তাঁহাকে পাইতে প্রার্থনা কর। বল, হৃদয়ের সহিত বল, "নাথ হে প্রেমপথে সব বাধা ভাঙ্গিয়া দাও, মাঝে কিছু রেখো না, রেখো না, থেকো না দূরে। অন্তরে বাহিরে, নির্জ্জনে সজনে, নিত্য হেরিব তোমারে।" এই রূপ প্রার্থনা করিয়া জীবনের ফল লাভ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বৰ্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ।

আজ আমাদের সাম্বৎসরিক মহোৎসব। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে যে ব্রহ্মনাম প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, সেই দিন স্মরণ করিয়া আমাদের এই উৎসব আয়োজন। নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরের পূজার্চ্চনা এখানে এতদিন ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে, ব্যাপক কাল পরে তাঁহার ভজন-মন্দির—এই স্থায়ী ভজন-মন্দির বিনির্ম্মিত হইয়াছে—ইহার প্রবেশদ্বার সাধারণের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। আমরা এই ব্রাহ্মসমাজের উপর—ভক্ত সাধুমণ্ডলীর উপর ঈশ্বরের শুভ দেবাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবার জন্য সমাগত হইয়াছি। তাঁহার করুণা তাঁহার প্রেম যাহাতে সকলের মস্তকের উপরে অজস্রধারে বর্ষিত হয়, সেইজন্য মুক্তহৃদয়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। যাহাতে তাঁহার সিংহাসন এখানে চিরদিনের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য ব্রাহ্ম ভ্রাতৃবর্গকে উদ্বোধিত করিতেছি। যাহাতে সর্ব্ববিধ অকল্যাণ—বিবাদ বিসম্বাদ অপসারিত হয় তাহার জন্য আজ স্বস্তিবচনে সেই শান্তিসদন পরমেশ্বরের নিকটে শান্তিবারি প্রার্থনা করিতেছি। যিনি মঙ্গলনিদান—জগতের মঙ্গল বিধান যাঁহার একমাত্র ব্রত, তাঁহার স্বরূপের প্রতি নিঃসংশয় হইয়া, আমরা তাঁহারই কল্যাণপথে অগ্রসর হইতেছি, তিনি অবশ্যই

আমাদিগকে জয়যুক্ত করিবেন। তিনি সত্যধর্ম্মা, সত্যের জ্যোতিতে যিনি নিখিল সংসারকে পরিপূরিত করেন, তাঁহারই ইঙ্গিতে আমরা বিচরণ করিতেছি, অবশ্যই তিনি অমৃতলোকে আমাদিগকে লইয়া যাইবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

কিন্তু আমরা সংসারের জীব, ধন মান যশ—পৃথিবীর ধূলিকণায় আমরা অন্ধীভূত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সুখে পরিবৃত হইয়া তাহারই সন্ধানে আমরা এমনই উন্মত্তভাবে বিচরণ করিতেছি, যে মহাকালের আহ্বানে আমরা বধির। ঊর্ণনাভের ন্যায় চারিদিকে জাল বিস্তার করিয়া সহস্র কুটিলতা সহস্র জটিলতার ভিতরে এমনই সতর্কতার সহিত অবস্থান করিতেছি যে মনে হইতেছে, যে এত সাবধানতাকে সে ব্যর্থ করিবে! সন্তানসন্ততির স্নেহ, আত্মীয় স্বজনের প্রেম, ধন ঐশ্বর্য্যের মোহিনী মায়ায় এমনই সুকৌশলে সংসারক্ষেত্র রচনা করিয়া বসিয়া রহিয়াছি, যে পরিণামচিন্তা কিছুতেই আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না।

যখন জীবন এই ভাবে চলিয়া যায়, জগতের কৌশল—বিশ্বরচনার শিল্পচাতুরী,—বিবেকবাণী কিছুতেই আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে পারে না, তখন সেই ঘোরতর অবস্থায় ঈশ্বরের করুণা—দেবপ্রসাদ আমাদের মস্তকের উপর অবতীর্ণ হয়, তাঁহারই কোমল হস্তের দান—মৃতসঞ্জীবন ঔষধ আমাদিগকে জাগাইয়া তোলে, সংসারের অল্পাধিক নির্য্যাতনে চেতনার সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয়, তখন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় নিজের অসহায় অবস্থা অন্তরে প্রতিভাত হয়, মনে হয় তবে সত্য সত্যই কি এই সংসার আমাদের তাবৎ নহে!!

পরমপিতা পরমেশ্বর কত উপায়ে যে তাঁহার প্রত্যেক দুর্ব্বল সন্তানের মোহবন্ধন ছিন্ন করিয়া দেন তাহা কে বলিবে। তাঁহার বিশ্ববিজয়ী মঙ্গল সংকল্প যে কত প্রতিকূল অবস্থাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়া নিত্য নব-গৌরবে মহিমান্বিত হয়, কে তাহার পরিমাণ করিবে। কোথায় রাজপুত্র শাক্যসিংহ রাজভোগে পরিবেষ্টিত হইয়া আপন প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন, কেমন করিয়া তাঁহার চক্ষু সংসারের দীনতার উপর নিপতিত হইল। তিনি দেখিলেন আত্মীয় স্বজন-বাহিতমৃত শরীর, আর বয়োধর্ম্মে জরাগ্রস্ত দুর্ব্বল দেহ। তাঁহার দেহমন প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। জীবনের পরিণাম চিন্তা করিয়া, বিলাস বৈভবের আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া, রাজশ্রী পদদলিত করিয়া, যেন তিনি কিসের উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া কি এক অনন্ত সুখের আস্পদ বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া নিজে উন্নততম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইলেন। অধিক দিনের কথা নয়, প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে গৌরাঙ্গ দেব যখন সংসারের ভাবে নিমগ্ন ছিলেন, কোথা হইতে প্রতিকূল বায়ু বহিল, যে তিনি নিজে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া জগৎকে বৈরাগী হইতে উপদেশ দিলেন। এই দুই মহাপুরুষের কথা ছাড়িয়া দিয়া ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে রামমোহন রায়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। তিনি নিজে বিষয়ী হইলেও কে তাঁহাকে অমানুষিক বল প্রদান করিল যে তিনি সত্যের সন্ধানে কৌমার বয়সে গৃহত্যাগ করিলেন, হিমালয়ও তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। তিব্বত পশ্চিমাঞ্চল ও বিভিন্ন স্থানে গিয়া তিনি বিভিন্ন ধর্ম্মভাব ধর্ম্মমত শিক্ষা করিয়া অবশেষে বেদবেদান্তের উপরে-সর্ব্বজনীন সত্যের উপরে ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘোষণা করিলেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ পৈত্রিক অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কালযাপন করিয়াছিলেন। উপনিষদের

ছিন্ন পত্র আসিয়া পড়িল "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" এই মহামন্ত্র তাহাতে পাঠ করিয়া জীবনতরণীর হাল স্বতন্ত্র দিকে পরিচালিত করিলেন। বলিতে কি, তাঁহারই শিক্ষা তাঁহারই উপদেশ আচার্য্য-পরম্পরায় প্রচারিত হইয়া বিগত অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া শিক্ষিত সমাজের চিন্তাস্রোতকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকে আকৃষ্ট ও পরিচালিত করিতেছে। এইরূপে ঈশ্বরের আহ্বানে কতলোক কতভাবে সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া আদর্শ জীবনের সৌরভে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন, মনুষ্যের পরম কল্যাণ ও চরম গতির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন।

যে সকল আর্য্য ঋষি আজীবন কাল অরণ্যে হোম যাগ তপস্যা লইয়া বিব্রত থাকিতেন, তাঁহাদের পুত্রকন্যার কণ্ঠ হইতে অজ্ঞাতসারে ব্রহ্মনাম ত নিনাদিত হইবেই কিন্তু যখন গৃহস্থের আশ্রমে, বিষয়ীর প্রাসাদে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তখন আমরা স্তব্ধ পুলকে ঈশ্বরের মহিমাই অবলোকন করি।

ঈশ্বরের পাপতাপহারী মলয়হিল্লোল—তাঁহার শুভ দেবআশীর্ব্বাদ আমাদের মস্তকের উপরে নিয়তই প্রবাহিত হইতেছে, তিনিও আমাদের অন্তরের মোহ-মেঘ অপসারিত করিবার জন্য অবসর অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার আহ্বানের প্রতি বিমুখ, তাই আমাদের এই দুর্দ্দশা।

উপনিষদ উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন "নাল্পে সুখমস্তি" অল্প বিষয়ে সুখ নাই। "ভূমৈব সুখং" ঈশ্বরেই আমাদের সুখ। যদি সেই পবিত্র সুখের প্রয়াসী হও, তাঁহাকে জান, তাঁহার সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত কর। যদি তাঁহার বিরাটমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে চাও, তাঁহার বিশালস্বরূপে আত্মহারা হইতে চাও, যদি তাঁহার জাজ্বল্যতর সত্তার পরিচয় পাইতে চাও, তবে যাও একবার অভ্রভেদী হিমালয় সন্দর্শনে, যাও সাগরসঙ্গমে, যাও চিরশান্তিময় নির্জ্জন গহনে, যাও বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। হিমালয়-চূড়ায় যে বৈরাগ্যের উপদেশ মিলিবে, তাহা আর জগতে মিলিবে না। ধবলগিরির পদপ্রান্তে বসিয়া আপনার ক্ষুদ্রতা ও নগণ্যতার যে শিক্ষা পাইবে, কোন গুরু সে শিক্ষা দিতে পারিবে না, গঙ্গা সমুদ্রে গিয়া যেখানে আত্মহারা হইতেছে, সেখানে আত্ম বিসর্জ্জনের যে শিক্ষা মিলিবে, তাহা আর কোথায় পাইবে? নির্জ্জন অরণ্যে যে শান্তিরসের আস্বাদ পাইবে, তাহা লোককোলাহলপূর্ণ নগরে পাইবে না। প্রান্তরের বিশালতায় হৃদয়ের বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে, সমুদ্রের উদ্দাম নৃত্য দর্শনে তোমার আত্মা ঈশ্বরকে পাইবার জন্য তেমনি ব্যাকুল হইয়া উঠিবে।

হিমালয়ের পদপ্রান্তে বসিয়া সাধনা করিতেন বলিয়া উপনিষদের গুরুগম্ভীরভাব ঋষিদিগের কণ্ঠ হইতে আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়িল। হিমালয় দর্শনে অপ্রতিম ঈশ্বরের ভাব—রামমোহনের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। হিমালয়প্রবাসে দেবেন্দ্রনাথে ঋষি-প্রকৃতি বহুদিনের পর ফিরিয়া আসিল। উপনিষদপ্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা যদি বুঝিতে চাও, শুভ্রকিরীটী হিমালয়ের সহিত ব্যাপক কাল ধরিয়া না হয় অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য পরিচিত হও এবং সাধুসঙ্গ কর, সৎশাস্ত্র পাঠ কর, চরিত্রকে বিশুদ্ধ কর এবং সাধনশীল হও।

পরমাত্মন্! তুমি নিম্ন বঙ্গকে বিশাল পর্ব্বত-পাথার তটিনী-নির্ঝর হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছ—তাই বুঝি তোমার বিশ্বব্যাপিনা বিরাটমূর্ত্তি দেখিতে পাই না। তাই বুঝি

তোমার মহান্ একত্ব ভুলিয়া গিয়া তাহার স্থানে বহুত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিয়াছি। তাই বুঝি সসীমে ক্ষুদ্রে তোমাকে আবাহন করিয়া তোমার বিরাটস্বরূপকে খণ্ডিত বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের কলঙ্ক আমাদের অপরাধ তোমার নিকটে অমার্জ্জনীয় হইলেও, দেব! আমরা এত-কাল ধরিয়া আস্তিকতার স্থানে নাস্তিকতার প্রতিষ্ঠা করি নাই। সেনানীর ভেরী-নিনাদ শ্রবণে বিভিন্ন দিকে পরিচালিত সৈন্যদল যেমন তাঁহার বিজয়নিশানের নিম্নে আসিয়া আবার সমবেত হয়, তেমনি সকলে আমরা বহুদিন পরে তোমার অজেয় বাণী শ্রবণ করিয়া তোমার মহান্ একত্বের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি। বহুকাল পরে তোমার উজ্জ্বল অখণ্ডমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইতেছি। কিন্তু এখনও আমাদের চক্ষুর ঘোর কাটে নাই। তুমি আমাদিগকে চক্ষুষ্মান্ কর। অন্তর্দৃষ্টিকে প্রখর কর। সাধনাকে উদ্দীপ্ত কর। অখণ্ড তোমার স্বরূপ অন্তরে চির-মুদ্রিত করিয়া দাও।

পিতা! উৎসবের পর কত উৎসব চলিয়া যাইতেছে। একবার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে আবার পরক্ষণেই অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। কতদিন আর কতদিন আমরা তোমা হইতে দূরে থাকিব। আমাদের আত্মা কি তোমাতে নিত্যযুক্ত হইতে পারিবে না। তোমার চরণপ্রান্তে বসিয়া অবিরল অমৃত পান আমাদের অদৃষ্টে কি ঘটিবে না। মানস-সরোবরের-হংসের ন্যায় কি আমাদের আত্মা তোমাতে নিত্যসঞ্চরণ করিতে পারিবে না, গগনবিহারী পক্ষীর ন্যায় কি আমরা তোমার মুখের জ্যোৎস্নাধবলিত গগনে নিত্য বিহার করিতে পারিব না। "তং হ দেবং-আত্মবুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে" আমরা মুমুক্ষু হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি আমাদিগকে সেই রাজ্যে লইয়া চল সেখানে পাপ নাই, তাপ নাই, জরা নাই, বিচ্ছেদ নাই, সেখানে স্বর্গীয় শান্তি অপার আনন্দ চিরবিরাজ করিতেছে, আর দেবতারা সমস্বরে তোমার যশোগান করিতেছেন। আমাদের দুর্ব্বল কণ্ঠের এই করুণ প্রার্থনা আজ তোমার সিংহাসনে উপনীত হউক। সমবেত ভ্রাতৃবর্গের উপর তোমার শুভ আশীর্ব্বাদ অবতীর্ণ হউক। অদ্যকার উৎসব সার্থক হউক, জগতে তোমার নাম জয়যুক্ত হউক এই আমাদের নিবেদন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সার সত্যের আলোচনা।

আছি এবং আছে।

এই সময়ে পথের কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা আবশ্যক বিবেচনায় বিগত দুইবারে সত্তা, শক্তি, জ্ঞান এবং আনন্দের মধ্যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ একাত্মভাব, তাহা বিধি-মতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ঐ তিনটি প্রয়ো-জনীয় দ্রব্য পাথেয় সম্বলের সহিত গাঁটরী বাঁধিয়া লওয়া হইয়াছিল।

এক্ষণে প্রয়াণ-পথের কোন্ স্থান হইতে কোন্ স্থানে আসিয়াছি এবং কতদূর অবধি গিয়া কোন্ স্থানে তাঁবু গাড়িতে হইবে, তাহা একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যক।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, দ্রব্যাদি-সংগ্রহের জন্য মাঝ-পথে থামিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বে আমরা আত্মজ্ঞানের দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি পৃথক্ পৃথক্ রূপে পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। সে দুই মূর্ত্তি হ'চ্চে—ভাব-মূর্ত্তি এবং সত্য-মূর্ত্তি। কিন্তু সঙ্কল্পিত পর্য্যালোচনা-কার্য্যের অর্দ্ধে-

কটা শেষ হইতে-না-হইতেই মাঝ-পথের ব্যাপারে আটক পড়িয়া গেলাম। আত্মজ্ঞানের ভাবমূর্ত্তি কিরূপ, তাহার আলোচনা আমরা যথাসাধ্য করিয়া চুকিয়াছি; তা বই, তাহার সত্যমূর্ত্তি কিরূপ, সে সম্বন্ধে এখনো পর্য্যন্ত একটি কথারও উল্লেখ করি নাই। আমরা দেখাইয়াছি যে, আত্মশক্তি খাটাইয়া আত্মজ্ঞানের ভাব-মূর্ত্তি উদ্ভাবন করা যাইতে পারে; আর, তাহার সাধনপদ্ধতি হ'চ্চে যোগশাস্ত্রের উপদেশানুযায়িনী ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। এ বিষয়ে যোগশাস্ত্রের প্রথম মন্তব্য এই যে, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। তুমি যেরূপ বিষয়ের প্রয়াসী, তোমার সিদ্ধিও সেইরূপ হইবে;—কিন্তু অমনি হইবে না, তাহার জন্য সাধন করা চাই। সাধন যেরূপে করিতে হইবে, তাহাই তোমাকে বলিয়া দেওয়া হইল।

দ্বিতীয় মন্তব্য এই যে, নীচের নীচের ভূমি মাড়াইয়া উচ্চোচ্চ ভূমিতে সংযম প্রয়োগ করা (অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি প্রয়োগ করা) কর্ত্তব্য। ভূমি-বিভাগ কিরূপ, তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর তবে তাহা মোটামুটি এইরূপ :—

প্রথম ভূমি পৃথিবী-তত্ত্ব; দ্বিতীয় জল-তত্ত্ব; তৃতীয় অগ্নি-তত্ত্ব; চতুর্থ বায়ু-তত্ত্ব; পঞ্চম আকাশ-তত্ত্ব; ষষ্ঠ মনস্তত্ত্ব; সপ্তম অহঙ্কার-তত্ত্ব; অষ্টম বুদ্ধি-তত্ত্ব; নবম প্রকৃতি। যোগশাস্ত্রের উপদেশ এই যে, পৃথিবী-তত্ত্ব হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া নীচের নীচের ভূমি একে একে মাড়াইয়া উপরের উপরের ভূমিতে আত্মশক্তি বা সংযম প্রয়োগ কর; অর্থাৎ, যে পথ দিয়া প্রকৃতির ক্রমবিকাশ হইয়াছে, সেই পথ দিয়া প্রকৃতি ভেদ করিয়া উচ্চে ওঠো; উচ্চে উঠিয়া পুরুষে—স্বরূপে—আত্মাতে—স্থিতি কর।

নীচের নীচের ভূমি মাড়াইয়া উপরের উপরের ভূমিতে উত্থান করিতে হইবে—এটা সাধারণ ব্যবস্থা; তা ছাড়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কোনো ব্যক্তির পাঠ আরম্ভ করা আবশ্যক ক খ হইতে; কাহারো বা—ব্যাকরণ হইতে; কাহারো বা—সাহিত্য হইতে। যাহার যোগ্যতার যতটা দৌড়, সেই অনুসারে তাহার সাধনের গোড়া'র পঁইটা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু কে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে? যে ব্যক্তি যাহা মনে করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতেই তাহার যোগ্যতার দৌড় প্রকাশ পায়; এবং তদনুসারে সাধক আপনিই আপনার সাধনের প্রথম পঁইটা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন; তাহাই তিনি করুন্; তাহা হইলে তিনি আন্তরিক ইচ্ছার সহিত সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন; আর তাহা হইলেই সাধন আশু-ফলপ্রদ হইবে। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, সঙ্গীতের দিকে যাহার স্বভাবতই মনের দৌড়, সে সঙ্গীতের চর্চ্চায় নিযুক্ত হইলে তাহার যেরূপ সহজে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, অপরের পক্ষে তাহা সম্ভাবনীয় নহে। এইজন্য যোগশাস্ত্রের প্রধান একটি মন্তব্য কথা এই যে, যেরূপ লক্ষ্য বস্তু তোমার মনের ইচ্ছার অনুযায়ী, তাহাতেই প্রথমে তুমি আত্মশক্তি বা সংযম প্রয়োগ কর—প্রয়োগ করিয়া সেই অভীষ্ট বিষয়টি আপনার সম্যক্ বশে আনয়ন কর; তাহার পরে ক্রমশ নীচের নীচের বিষয় বশীভূত করিয়া উচ্চ উচ্চ বিষয়ের সাধনে প্রবৃত্ত হও। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সাধনের লক্ষ্য বস্তু তত নয়—সাধনের পদ্ধতিই যত যোগশাস্ত্রের উপদেষ্টব্য বিষয়। যোগশাস্ত্রের একটি স্থানে কেবল সাধনের লক্ষ্য বস্তু সুনির্দ্দিষ্ট। কোন্ স্থানে? না, যেখানে বলিতেছেন—

"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।" এই স্থানটিতেই আত্ম-শক্তির পরিবর্ত্তে ঐশী শক্তির পরাকাষ্ঠা বলবত্তা এবং ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরে কর্ম্ম-সমর্পণের বিধেয়তা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই স্থানটির কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা আবশ্যক; এবং তাহা বুঝিয়া দেখিতে হইলে আমাদের জ্ঞানরাজ্যে আত্মকর্ত্তৃত্বেরই বা কার্য্যকারিতা কিরূপ, তাহার প্রতি রীতিমত অনুসন্ধান প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

আত্মকর্ত্তৃত্বের মূলে ঐশী শক্তির কার্য্যকারিতা কিরূপ, তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হইতে হইলে সাধনের কথা ছাড়িয়া দিয়া সহজে আমরা আত্মাকে কিরূপে উপলব্ধি করি, তাহারই প্রতি সর্ব্বপ্রথমে প্রণিধান করা কর্ত্তব্য।

আপামর-সাধারণ সকল ব্যক্তিই "আমি আছি" এই কথাটি খুবই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করে; হৃদয়ঙ্গম করিয়াও শুদ্ধকেবল সেই কথাটির বলে আপনার ধ্রুব অস্তিত্ব-বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারে না। অতএব, সহজ জ্ঞানের এই যে একটি কথা—"আমি আছি"—এ কথাটির বলবত্তার দৌড় কতদূর পর্য্যন্ত, তাহা একবার তোলাপাড়া করিয়া দেখা নিতান্তই আবশ্যক।

"আছি" এবং "আছে" এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? "আছি" এবং "আছের" মধ্যে ব্যাকরণঘটিত উত্তমপুরুষ এবং প্রথম-পুরুষের প্রভেদ তো আছেই—কিন্তু সে প্রভেদ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর বড়-একটা কাজে লাগে না; তা ছাড়া, দুয়ের মধ্যে নিগূঢ়-রকমের একটি প্রভেদ আছে—সেইটিই এখানে দ্রষ্টব্য; তাহা এই :—

আমি যদি বলি যে, "হিমালয়-পর্ব্বত আছে," তবে শ্রোতা বলিতে পারে যে, "তাহা যে আছে, তাহার প্রমাণ কি? পক্ষান্তরে, আমি যদি বলি যে, "আমি আছি" তবে আমার সেই কথাটিই আমার অস্তিত্বের প্রমাণ; কেন না, আমি না থাকিলে "আমি আছি" এ কথাটি আমার মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিত না। "আমি আছি" এ কথাটি আমি যদি মুখে না-ও উচ্চারণ করি—শুধু যদি কেবল মনে মনে বলি যে, "আমি আছি," তবে তাহাই আমার অস্তিত্বের যথেষ্ট প্রমাণ; কেন না, আমি না থাকিলে "আমি আছি" এ কথাটি আমার মনেও আসিতে পারিত না। তা শুধু না—আমি "আছি" না বলিয়া আমি যদি মনে মনে বলি যে, "আমি নাই" অথবা "আমি আছি কি নাই, তাহা আমি জানি না," তবে তাহাতেও প্রকারান্তরে বলা হয় যে, "আমি আছি"; কেন না, আমি যদি না থাকিতাম, তবে "আমি নাই" এ কথাও আমার মনে আসিতে পারিত না। এই স্থানটিতে দেকর্ত্তা (Des-cartes)-নামক ফরাসীস্ তত্ত্ববিদের প্রসিদ্ধ মহাবাক্যটি মনে পড়ে; কি? না, Cogito ergosum—"আমি চিন্তা করিতেছি, অতএব "আমি আছি।" কথাটি খুব ঠিক্; কিন্তু উহার বলবত্তার দৌড় যে 'চিন্তা করিতেছি'র মধ্যেই আবদ্ধ, দেকর্ত্তা তাহা বুঝিয়াও বোঝেন নাই; তাহা বুঝিলে তিনি 'আছি' এবং 'আছে'র মধ্যে একটা অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর সন্নিবেশিত করিবার বৃথা চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতেন না।

প্রকৃত কথা যাহা, তাহা এই :—

যখনই আমার মনোমধ্যে যে-কোনো চিন্তা উপস্থিত হইতেছে, তখনই সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে 'আমি-আছি' এই কথাটি আমার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু সে যে আমি আছি, তাহা তখন-আমি-আছি; আর, সেই তখন-আমি-আছি'র প্রমাণ তখনকার সেই চিন্তা। পক্ষান্তরে, আমি

গতকল্য যাহা চিন্তা করিয়াছিলাম, সে চিন্তা সাক্ষাৎসম্বন্ধে এখন-'আমি-আছি'র প্রমাণ নহে। আমার এখনকার চিন্তাই এখন আমি আছি'র প্রমাণ। দে-কর্ত্তার মতে "আছি"রই কেবল প্রমাণ আছে—'আছে'র কোনো প্রমাণ নাই। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, আছে'র যদি কোনো প্রমাণ না থাকিত, তবে "আছে" এরূপ একটা কথা আমাদের বুদ্ধিতে আমল পাইতেই পারিত না। আছি'র যেমন প্রমাণ হাতে-হাতে—আছে'-রও তেমনি; প্রভেদ কেবল এই যে, আছি'র প্রমাণ অপেক্ষাকৃত নিরবচ্ছিন্ন, আছে'র প্রমাণ অপেক্ষাকৃত ব্যবচ্ছিন্ন। আমি এখন লিখিতব্য বিষয় চিন্তা করিতেছি, আর, সেই সঙ্গে এই কথাটি জ্ঞানে উপলব্ধি করিতেছি যে, এখন আমি আছি; আমার এখনকার চিন্তা আমার এখনকার অস্তিত্বের এ যেমন প্রমাণ, তেমনি, আমার সম্মুখে আমি ঐ যে উদ্যান দেখিতেছি, ঐ উদ্যানের রশ্মি-প্রতিক্ষেপণী ক্রিয়া (অর্থাৎ ঐ উদ্যান সূর্য্যরশ্মি প্রতিহত করিয়া আমার চক্ষু-গোলকে যে বিচিত্র বর্ণ ক্ষেপণ করিতেছে—সেই প্রতিক্ষেপণী ক্রিয়া) উদ্যানের অস্তিত্বের প্রমাণ। প্রভেদ কেবল এই যে, যখন আমি ঘরে ঢুকিয়া জানালা বন্ধ করিব, তখন উদ্যান আমার নিকটে অদৃশ্য হইয়া যাইবে, আর, সেই সঙ্গে "উদ্যান আছে" এ কথাটির সাক্ষাৎ প্রমাণ আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া পালাইবে। পক্ষান্তরে, আমার জাগরিত অবস্থার মুহূর্ত্ত পরম্পরায় আমার মনোমধ্যে একটার পর আরেকটা চিন্তা উদিত হইতেছে এবং উদিত হইতে থাকিবেও; আর যখনই যে চিন্তা উদিত হইতেছে, তখনই তাহা "এখন আমি আছি" এই কথাটির প্রমাণ যোগাইতেছে। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, "এখন আমি চিন্তা করিতেছি, অতএব এখন আমি আছি" এবং "এখন উদ্যান আমার দৃষ্টি আক্রমণ করিতেছে, অতএব এখন উদ্যান আছে" এই দুই কথার মাঝখানকার দুই অতএবের মূল্য নিক্তির ওজনে সমান। তবে কি না, চিন্তা নিরবচ্ছেদে একটার পর একটা মুহুর্মুহু মনোমধ্যে উপস্থিত হইতেছে; উদ্যান কখনো বা আমার দৃষ্টিক্ষেত্রে উপস্থিত, কখনো বা অনুপস্থিত। যদি আমি অষ্টপ্রহর অনিমেষ-চক্ষে উদ্যানের প্রতি চাহিয়া থাকি, তাহা হইলে—আমি আছি এবং উদ্যান আছে—দুইই এক সঙ্গে আমার মন'কে ক্রমাগতই আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিবে। উদ্যানটি যখন মেঘাবৃত অমানিশার প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন তাহার অস্তিত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ সেই সঙ্গে তিরোহিত হয়—ইহা কাহারো অবিদিত নাই; ইহাও তেমনি কাহারো অবিদিত নাই যে, সুষুপ্তির মন্ত্রগুণে যখন আমার জ্ঞানের ক্রিয়াস্ফূর্ত্তি একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়, তখন সেই সঙ্গে আমার অস্তিত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ অন্তর্ধান করে। সুষুপ্তির অবস্থায় যখন আমার মনের কপাট বন্ধ থাকে, তখন "আমি আছি" বা "আমি নাই"-বা "আমি আছি কি নাই, তাহা জানি না" এই তিন রকমের তিন কথার কোনোটিই আমার মনে প্রবেশ পাইতে পারে না। আমার সে অবস্থায় "আমি আছি" ঘুচিয়া যায়—অথচ আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দর্শক বলে যে, "ইনি আছেন– কিন্তু নিদ্রায় নিমগ্ন।" ইনি যে আছেন, তাহার প্রমাণ কি? "ইনি আছেন" এ কথা তুমি বলিতেছ—আমি তো বলিতেছি না। আমার অস্তিত্বের প্রমাণ তোমার কথায় হইতে পারে না। তোমার মুখের কথা বা মনের

ভাবনা বা জ্ঞানের ক্রিয়াস্ফূর্ত্তি তোমার অস্তিত্বেরই প্রমাণ; তা বই, তাহা আমার অস্তিত্বের প্রমাণ নহে। তবেই হইতেছে যে, আছে'র সাক্ষাৎ প্রমাণ যেমন সময়ে সময়ে অন্তর্হিত হয়, আছি'র প্রমাণও সেইরূপ পরিবর্ত্তনশীল। অতএব, পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাবলীর মূলে অপরিবর্ত্তনীয় একটা-কিছু থাকা যদি আবশ্যক হয় তবে আছি এবং আছে দুয়েরই মূলে তাহা থাকা আবশ্যক; এইজন্য দুয়ের সন্ধিস্থানেই তাহা অন্বেসিতব্য।

উপরে যে ভাবের আছি এবং আছে'র প্রমাণ দেখানো হইল, তাহা কেবল এখন আছি এবং এখন আছে মাত্র; সুতরাং তাহা কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। এতদ্ব্যতীত ঐ দুই পরিচ্ছিন্ন আছি এবং আছে'র সন্ধিস্থানে সমস্ত লইয়া যে এক আছি বিরাজমান, তাহাই সত্যজগতের প্রবেশদ্বার। আগামী বারে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

অশ্রুমঙ্গল।

অশ্রু! তোমার গুণে আমি চিরকালই বিমুগ্ধ। যেখানে শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য যন্ত্রণা প্রভৃতির বিরস কঠোর মর্ম্মন্তুদ অভিনয়, জগতের মধ্যে সেই স্থানেই তোমার একমাত্র লীলানিকেতন। এইজন্য লোকমুখে তোমার বহুল নিন্দাবাদ শুনিতে পাই। জগৎ যাহা বলে বলুক, আমার নিকট তুমি চিরদিনই সৌম্য সুন্দর! শান্ত শীতল— নিত্য প্রাণারাম! তুমি মানবের জীবন মরণের একমাত্র প্রিয়সাথী। মানুষ যখন গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া জীবনের খেলা আরম্ভ করে, একমাত্র তুমিই তখন ক্রন্দনের আবরণে তোমার ঐ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দেহবিন্দুটিকে আবৃত করিয়া, তাহার অস্ফুট নেত্রমধ্যে লুক্কায়িত থাক। আবার শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনে, যখন তাহার জীবন নাটকের শেষ গর্ভাঙ্ক অভিনীত হইতে থাকে, যখন পুত্র কন্যা ভ্রাতা, বনিতা ও আত্মীয় স্বজন সকলেই আপনাপন কপোলদেশে করস্থাপন পূর্ব্বক তৎসমক্ষে মায়ার একটী মনোহর পুষ্পোদ্যানরূপে অবস্থান করে, তখন একমাত্র তোমাকেই সেই সংরুদ্ধবাক্ জীবনপ্রান্তোপনীতের নয়ন মধ্যে আবির্ভূত হইতে দেখি। তুমি পাপপুণ্যের একমাত্র সমন্বয়সাধক। তুমি আছ বলিয়াই এখনও এই পঞ্চভূতাত্মক জগৎ আছে; নতুবা কোন্ দিন এই বিশ্বসংসার পাপাসক্তের ভ্রূভিকট হাস্যতাণ্ডবে টলমলায়মান হইয়া মহাপ্রলয়ের অন্ধকারগর্ভে ডুবিয়া যাইত। যখন এই সন্তাপদগ্ধ জীবনের বোঝা মনুষ্যের পক্ষে একবারে দুর্ব্বহ হইয়া উঠে তখন একমাত্র তুমিই তাহার সেই আধিক্লিষ্ট জীবনে শান্তি ও ধৈর্য্যের মন্দাকিনী প্রবাহিত কর। যে হৃদয় অতিশয় নীরস কঠিন ও স্বার্থপর, তাহাও তোমার সহানুভূতিরূপ অমৃতবারি সেচনে কোমল হইতে কোমলতর হইয়া উঠে। যে চিত্তদৌর্ব্বল্য পাপানুষ্ঠানের মূলভিত্তি, তাহাও তোমার মোহিনী শক্তি বলে চিরতরে অপনীত হইয়া হৃদয়ে অতি গভীর উচ্চ চিন্তার অমৃত উৎস খুলিয়া দেয়। এই জন্যই তুমি আমার নিকট এত নিত্য সুন্দর! এত চিরহৃদয়স্পৃক্!

তুমি যখন সারল্য ও পবিত্রতায় পরিভূষিত হইয়া নরনারীর নেত্রাভ্যন্তরে নৃত্য করিতে থাক, তখনই তোমাকে সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ বলিয়া বোধ হয়। বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনী যখন বিনাদোষে নগেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিল, তখন তুমি সেই হতভাগিনী কুন্দের চক্ষে ছিলে, আবার একজন

নগণ্যা জঘন্যার চক্ষেও থাক; উভয়েই ত রমণী? তবে তোমার এই মূর্ত্তির বিভিন্ন ভাব দেখি কেন? তাহার কারণ, কেবল একে তোমার পবিত্রতা ও সরলতার অস্তিত্ব এবং অপরে তাহার অভাব। কোমলতা ও স্বাভাবিকতা মাখিয়া তুমি কুন্দনন্দিনীর চক্ষে আবির্ভূত হইয়াছিলে তাই সেখানে তোমার মূর্ত্তি অতি সুন্দর আর ঘৃণিত পাশবী লিপ্সার গরল এবং অপবিত্রতা মাখিয়া বাহির হও বলিয়া জঘন্যার চক্ষে তোমার মূর্ত্তি অতি কলুষ পঙ্কিল।

চতুরে! জগতের মধ্যে কোন্ স্থান তোমার অজ্ঞাত ও অগম্য? জলে, স্থলে, শূন্যমার্গে সকল স্থানেই ত তোমাকে দেখিতে পাই? কি জীবজগৎ কি জড়জগৎ সর্ব্বত্রই ত তোমার অব্যাহত গতি! যেখানেই তোমাকে দেখি, সেইখানেই তোমার একই মূর্ত্তির বিভিন্ন ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হই। বৃক্ষে পত্রে, প্রফুল্ল কমলে ও শ্যামল দূর্ব্বাদলে যখন তুমি তরুণতপনের স্বর্ণরাগে সুরঞ্জিত হইয়া বিরাজ কর, তখন তুমি কত সুন্দর—কত কবিত্বপূর্ণ বল দেখি? যে ওষধিকুল ইতঃপূর্ব্বে কৃষকের অতি যত্নের সামগ্রী ছিল, এতদিন যাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ক্ষেত্রস্বামী বিধিমত যত্নচেষ্টার ত্রুটি করে নাই, এমন কি পাছে তাহাদের স্বাস্থ্য হানি হয়, এই আশঙ্কায় যে একগাছি তৃণপীড়ন পর্য্যন্তও সহ্য করিতে পারে নাই, এতদিন সযত্নে প্রতিপালন করিয়া, আজ সেই কৃষক তাহাদিগকে কর্ত্তন করিবার জন্য আসিতেছে, এই দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া যখন সেই ওষধিকুল নতশিরে ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন হে অশ্রু! তুমিই না শিশিরচ্ছলে তাহাদের কাতর ক্রন্দন ইহজগতে প্রচার কর? আবার ভরা ভাদ্রের ভাগীরথী যখন সুবিশাল কলেবর ধারণ করিয়া উত্তাল তরঙ্গে ভীম রঙ্গভঙ্গে সাগরসঙ্গমের পথে প্রধাবিত হয়, তখন হে অশ্রু! তুমিই না অগণ্য মূর্ত্তিতে সেই বীচিমালিনী পূত জাহ্নবীর উদ্বেল তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্যে বিরাজমান থাকিয়া ফেনময় অট্টহাস্যে গর্জ্জন করিতে থাক? তখন তোমার দিকে তাকায় কাহার সাধ্য? আবার যখন ঐ ঊর্দ্ধস্থিত অগাধ অপার সুগম্ভীর আকাশ ঘনীভূত জলদপটলে সুসজ্জিত হইয়া মেদিনীর উৎফুল্ল বদনে নিবিড় মসীরাশি মাখাইয়া দেয়, তখন তুমিই না ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবিরল বৃষ্টিচ্ছলে বিশ্বসংসারে খণ্ডপ্রলয়ের সূচনা করিয়া থাক? তাই বলিতেছিলাম, সমগ্র জগতই তোমার দুরধিগম্য ক্রীড়ারহস্যে লীলায়িত।

তোমার স্বরূপ নির্ণয় করে কাহার সাধ্য? কখনও তোমার স্নিগ্ধ শান্তোজ্জ্বল বিনোদকান্তি হৃদয়ে ত্রিদিবের আভা প্রতিফলিত করে, শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে অমৃতের মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়া দেয়, আবার কখনও তোমার বিশ্বত্রাসিনী রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময় ও আতঙ্কসিন্ধুর তর তর তরঙ্গে ডুবিয়া যাই। কোমলতা সরলতা, পবিত্রতা ও স্বাভাবিকতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে যেন তোমার দেহখানি পরিগঠিত হইয়াছে। তোমার একদিকে স্বরতরঙ্গিণীর দিব্য মধুর কুলুকুলু ধ্বনি, অপর দিকে আবর্ত্তভীষণ মহাসমুদ্রের ফেন-হাস্যময় প্রবাহ-গর্জ্জন; একদিকে বাসন্তী পূর্ণিমার স্ফুটচন্দ্রালোকে কোকিল পাপিয়ার উচ্ছ্বাসমধুর স্নিগ্ধ নিক্বণ, অপর দিকে ঘনঘটাচ্ছন্ন অমানিশির শান্তিভঙ্গকারী শিবাকুলের কর্কশভীষণ নৈশ চীৎকার। ভক্তির সাধক যখন ভগবৎপ্রেমের উদার ভিত্তিমূলে পদস্থাপন করিয়া প্রশান্ত প্রেমের উচ্ছ্বাসে তাঁহার সেই চিরারাধ্য পরমপুরুষকে প্রাণ

ভরিয়া ডাকিতে থাকেন, তখন যে কিরূপ দিব্য লাবণ্যের পূর্ণ সৌকুমার্য্য বক্ষে ধারণ করিয়া তুমি সেই তন্ময় সাধকের অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রপ্রান্তে আবির্ভূত হও, তাহা তুমিই জান, আর তোমার স্রষ্টাই জানেন। পিতৃসত্য পালন করিয়া চৌদ্দ বৎসর পরে সীতাপতি রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, রাজপ্রাসাদের বহির্দ্দেশে সখিগণপরিবৃতা অন্ধ কৌশল্যা উদ্‌গ্রীব ভাবে দণ্ডায়মানা, জটাবাকলধারী রামচন্দ্র পার্শ্ববর্ত্তী সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে সাদরে সস্নেহে দেখিতে দেখিতে প্রাসাদের অনতিদূরে উপস্থিত, হে অশ্রু! বল দেখি কোন্ মূর্ত্তিতে তুমি তখন কৌশল্যা-নয়নে আবির্ভূত হইয়াছিলে?

বালক পদদ্বয়ের ভারকেন্দ্র রক্ষণে অক্ষম হইয়া ভূতলে নিপতিত, একএকবার জননীর মুখের দিকে তাহার সেই নীলোৎপল-বিনিন্দি নয়নযুগল সংযত করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, মাতা পুত্রকে ভুলাইবার জন্য ভূ-পৃষ্ঠে দুই তিনবার পদাঘাত করিলেন, অমনি সুবিমল হাস্য যখন শিশুর সেই কুসুমসুকুমার কমনীয় আস্যে বিস্ফুরিত হইয়া তাহার নবনীতকোমল কপোলদ্বয়কে ঈষৎ কুঞ্চিত করিল, অশ্রু! তখন তোমার সেই মানস-ভুবনমোহন অমল সৌকুমার্য্যের তুলনা স্বর্গেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই দেখি হাসির সহিত তোমার একটা চিরবিরোধী বিদ্বেষভাব বিদ্যমান থাকিলেও, শিশুর নিকট তোমার সেই বিদ্বেষবন্ধন বিচ্ছিন্ন। যেখানে প্রেম, প্রণয় ও স্নেহবাৎসল্যের পবিত্র অভিনয়, সেইখানেই তোমার শুভ সম্মিলন। মরি মরি, যেন নীলাকাশের একদিকে জলদের নিবিড়কৃষ্ণ শ্যামকান্তি, অপর দিকে বালতপনের মনোমদ কিরণসম্পাত। কিন্তু মৃগয়াবেশধারী রাজা দশরথ যখন যজ্ঞদত্তের শবদেহ স্কন্ধে লইয়া সেই অরণ্যচারী অন্ধদম্পতীর নিকট আগমন করিয়া ছিলেন তখন তোমার ঐ প্রশান্তমূর্ত্তি কত ভয়ঙ্কর—কত হৃদয়বিদারক! পতিব্রতা সব্যা যখন মৃত পুত্রকে কোলে লইয়া জাহ্নবীর শ্মশানসৈকতে সেই চণ্ডালবেশ হরিশ্চন্দ্রের নিকট আগমন করিয়াছিল, তখন তোমার ঐপ্রশন্তমূর্ত্তি কত ভয়ঙ্করী? রাজশ্রী-পরিভ্রষ্ট নৈষধ যখন বিচিত্র নিয়তি-নির্দ্দেশে ভ্রাম্যমান হইয়া নিবিড় বনান্তরালে সেই জানুদেশলম্বিনী নিদ্রিতা দময়ন্তীর কটিদেশ হইতে বস্ত্রার্দ্ধ ছেদন করত পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন তোমার ঐপ্রশান্ত মূর্ত্তি কত ভয়ঙ্করী হইয়াছিল? আবার এক তোমার দগ্ধভীষণ মূর্ত্তি, অশ্রু! জীবনসর্ব্বস্ব স্বামী উদরান্নের জন্য প্রবাসে, পরের দ্বারে দাসত্ব করিতে গিয়া আজ অন্তিমের ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে, পদতলে তদ্গতপ্রাণা সহধর্ম্মিণী শিশুসন্তানটীকে কোলে লইয়া পতির সেই মৃত্যুরেখাঙ্কিত বিমলিন মুখমণ্ডলের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছে, এক একবার কাতর স্বরে সেই পরমপিতা ভগবানকে ডাকিতেছে, রোগী বিকারের আবেশে কত কথা বলিতেছে, সমস্তই অসম্বদ্ধ প্রলাপ, পত্নীর হৃদয়াকাশ নিবিড় জলদজালে সমাচ্ছন্ন! নিবাত—নিষ্কম্প; ঠিক যেন প্রলয়ের মেঘের মত"

"অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহম্ অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং।"

দেখিতে দেখিতে আত্মারাম দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিল, পত্নী-হৃদয়স্থ প্রলয়মেঘও অমনি শতসহস্র অশনিমন্দ্রে গর্জ্জন করিয়া উঠিল; অহো! কি সৃষ্টিবিপর্য্যয়কারী লোমহর্ষণ দৃশ্য! পদতলে মেদিনী এক গভীর ভূকম্পনে টলমল করিতেছে, মস্তকোপরি অনন্ত আকাশ বিরাটমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া

যেন অনন্ত বহ্নি গণ্ডূষে যুবতীর ঐহিক সুখ-সম্ভোগকে চিরতরে পান করিয়া বলিতেছে হে অশ্রু! এ সময় তোমার দিকে নেত্রপাত করিতেও ইচ্ছা হয় না! এ সময় তোমার মূর্ত্তি ভয়ানকেরও ভয়ানক—"ভয়ানাম্ভয়ম্ভীষণং ভীষণানাং।" কিন্তু বদ্ধ জীব আমরা! সংসারের কলুষপঙ্কিল বাসনা-সলিলে হাবুডুবু খাইয়া আমরা অহর্নিশি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি; তাই তোমার এই দগ্ধকঙ্করসদৃশ কঠোর মূর্ত্তি আমাদের হৃদয়কে আতঙ্কের অন্ধ প্রেরণায় অভিভূত করিয়া ফেলে। কিন্তু যখন মনে হয় যে, এই মূর্ত্তিতেই তুমি ধর্ম্মবীর শাক্যসিংহকে সংসার-আশ্রম হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার প্রাণে বৈরাগ্যের প্রবলপ্রবাহ ঢালিয়া দিয়াছিলে তখন তোমাকে আর নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হয় না। তখন দেখি যে তোমার অমৃতসিক্ত উর্ব্বরক্ষেত্রে যেন ভাবী আত্মোন্নতির বীজ অলক্ষ্যে অঙ্কুরিত হইতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দুঃখ, শোক, দারিদ্র্য, যন্ত্রণা প্রভৃতি তোমার প্রিয় সহচর বলিয়া তুমি লোকসমাজে বিনিন্দিত, কিন্তু কোথায় কে কবে দেখিয়াছে যে মণিরত্নখচিত বেশভূষায় পরিভূষিত হইয়া, কিংখাপ ও মখমলের সুকোমল শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া এবং গোলাপগন্ধি ক্ষীর নবনীতের সুবর্ণপাত্র মুখে লইয়া, মানুষ সুদূরবর্ত্তিনী উন্নতির পুণ্য-মন্দিরে উপনীত হইয়াছে? সুখসৌভাগ্য মস্তিষ্কের মত্ততা আনয়ন করে? উহা ত মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব বিকাশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী? জগতের খ্যাতনামা মহাপুরুষগণের জীবন-বৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে দুঃখদারিদ্র্যই সকলের উন্নতির একমাত্র পথপ্রদর্শক। যে বীরকেশরী নেপোলিয়নের বজ্রহুঙ্কারে একদা য়ুরোপের সমগ্র রাজসিংহাসন কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল, যিনি একদিন অনন্যসাধারণ সমরপ্রতিভায় জগৎকে স্তম্ভিত ও চমকিত করিয়াছিলেন, সেই নেপোলিয়ন বাল্যকালে দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে পেষিত হইয়া সমুদ্রবক্ষে ঝম্প প্রদান করিতে গিয়াছিলেন। চিরনির্ব্বাসিত দান্তে (Dante) যখন সুদূর নিভৃত কারাগারে বসিয়া তাঁহার সেই মূল্যবান "Divins Comedy" রচনা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, হে অশ্রু! তুমিই ত তখন সেই দৈন্যনিগৃহীত কবিহৃদয়ে আগ্নেয় উদ্দীপনাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিলে? পুত্রশোকাতুর হালাম্ তোমাকে সাথে লইয়াই জগতে আজ প্রধান ঐতিহাসিক বলিয়া প্রখ্যাত। তাই যখন দেখি, তুমি মনুষ্যের আত্মদর্শন ও জীবনের উন্নত ও মহীয়ান্ অংশের উন্মেষণ বিষয়ে একমাত্র প্রধান সহায় ও অবলম্বন, যখন ভাবি, তুমি ধৈর্য্যের চতুষ্পাঠী, উন্নতির বিশ্ববিদ্যালয়, স্বাভাবিকতার রঙ্গনিকেতন ও সহানুভূতির প্রস্রবণ, তখন স্বতঃই তোমার মহিমায় আত্মবিস্মৃত হইয়া ভক্তের ভাষায় সেই অনন্তমহিমাময়কে ডাকিয়া গাহি,—

"না শুকায় যেন নয়নের বারি,
ফিরি দ্বারে দ্বারে মমতা ভিখারী,
যেন সন্তাপের শ্বাস বহে বারমাস,
নিরাশার কালী মুছে না হে!"

স্বাস্থ্য।

সুস্থ থাকিতে সকলেরই ইচ্ছা অথচ সকল সময়ে এই স্বাস্থ্য পাওয়া যায় না। অনেক চেষ্টা করি, অনেক সাধনা কাব কিন্তু ইহা অনেক সময়ই বিমুখ। ধন মান ঐশ্বর্য্য যা কিছু বল প্রকৃত স্বাস্থ্য না থাকিলে কিছুই ভাল লাগে না, সুতরাং সংসারে উহাই উৎকৃষ্ট সুখ। কি পার্থিব

কি পারমার্থিক সকল কার্য্যের উহাই মূল। বিদ্যা উপার্জ্জন, অর্থ সংগ্রহ, ধর্ম্ম সঞ্চয় যা কিছু বল স্বাস্থ্য না থাকিলে কিছুই হয় না। আমরা অনেক সময় মনে করি পরিমিত পান ভোজন ও ব্যায়ামে বেশ্ সুস্থ থাকিব কিন্তু সকল সময়ে তাহা ঠিক হয় না, অসুস্থ হই এবং স্বাস্থ্য লাভের অন্য উপায় দেখি। কেন এইরূপ হয় এই প্রশ্নের একটী উত্তর আছে তাহা মনের স্বাস্থ্যে অবহেলা। মনের সহিত শরীরের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মন সুস্থ না থাকিলে শরীর কিছুতেই সুস্থ হয় না। এই মনের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে শাস্ত্রের প্রধান উপদেশ ঈশ্বরসেবা। প্রতিদিন ত্রিকালীন ঈশ্বরকে সেবা করিতে হইবে। গগন আকাশে অরুণরাগের সহিত দুই একটী ক্ষীণজ্যোতি তারকা দৃষ্ট হয়, প্রভাতের মৃদুমন্দ সুশীতল বায়ু বহমান, নানাবিধ বিহঙ্গ আলোক লাভে পুলকিত হইয়া সুস্বর সঙ্গীতে মন প্রাণ চমকিত করিতে থাকে, সমস্ত বাহ্য প্রকৃতি শিশিরসিক্ত যেন সুস্নাত হইয়া পবিত্র ভাব ধারণ করে সেই ব্রহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান কর এবং দেহশুদ্ধি করিয়া প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী মন্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ঈশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক সৃষ্টিশক্তি চিন্তায় তাঁহার অর্চ্চনা কর; যখন সূর্য্য নভোমণ্ডলের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া প্রখর তাপে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থের দোষ দূর করিয়া তাহাতে অপ্রত্যক্ষ ভাবে জীবন সঞ্চার করিতে থাকে, যখন সমস্ত বাহ্য প্রকৃতি নিস্তব্ধ ও স্থির, পশু পক্ষীরা সম্পূর্ণ নীরব, সেই মধ্যাহ্নে ঈশ্বরের পালনী শক্তি চিন্তা করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা কর; যখন সূর্য্য অস্তাচল আশ্রয় করিয়া সিন্দুর রাগে আকাশের পশ্চিম প্রান্ত রঞ্জিত করিয়া ফেলে, গাভির দল সমস্ত দিন বিচরণ পূর্ব্বক পথের ধূলিজাল উড্ডীন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে থাকে, অসীম শূন্যে দুই একটী নক্ষত্র উঠিয়া হীরকের উজ্জ্বল আভা বিস্তার করে এবং বিহঙ্গেরা কোলাহল সহকারে স্ব স্ব কুলায়ে গিয়া বিশ্রাম করিতে থাকে সেই সায়াহ্নে ঈশ্বরের সর্ব্বসংহারিণী শক্তি আলোচনা করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা কর, সংসারের নানারূপ বিঘ্নবাধা সত্ত্বেও তোমার মন সুস্থ থাকিবে। ফলত বেদাদিশাস্ত্রে ঈশ্বরোপাসনাই মানসিক স্বাস্থ্যের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তদ্ব্যতীত তাহাকে সুস্থ রাখিতে যে কোনই উপায় উদ্ভাবন কর তাহা অস্থায়ী ও ভঙ্গুর। এই ঈশ্বরচিন্তায় মন সুস্থ হইলে আপনা হইতেই সমস্ত শারীর বিকার নষ্ট হইবে। মনে করিও না ইহা কেবলমাত্র উপদেশের কথা, বস্তুত ইহার ফল প্রত্যক্ষ। জীবনের সকল কার্য্য অপেক্ষা ঈশ্বরসেবাকে মুখ্য কর, প্রভাত হইতে রাত্রির বিশ্রাম কাল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি নেত্র স্থির রাখিয়া আনন্দ উপভোগ কর, অল্প কালের মধ্যে—মহর্ষি মনুর নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই নিশ্চয় ফল পাইবে। তুমি দেহ মনের অখণ্ড স্বাস্থ্য নিশ্চয় উপভোগ করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ ব্রহ্মচিন্তাপর, যিনি এইরূপ নিয়মিত রূপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য সোৎসুক চিত্তে ত্রিকালের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহার কেবল শরীরকে ঐ অভীষ্ট কার্য্যের উপযোগী করিবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ আহারের প্রয়োজন হয়, লোভের বশীভূত হইয়া চর্ব্ব্য চোষ্যাদির জন্য তাঁহার আর প্রবৃত্তি থাকে না। তিনি চান, কিসে ত্রিধাতু সমতা লাভ করিয়া জড়তা ও দীর্ঘসূত্রিতা দূর হয়, কিসে শরীর লঘু ও কার্য্যক্ষম হয়, সুতরাং দৈনন্দিন পরীক্ষাফলে অনুত্তেজক

বলবর্দ্ধক মিতাহারেই তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে। তিনি দেখেন এক আত্মাই চরাচর বিশ্বব্যাপী, যিনি আমাতে তিনিই কৃমি কীট পতঙ্গে, তখন বিশ্বজনীন দয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হয়, তিনি সকলকেই দয়া ও স্নেহের চক্ষে দেখেন, কোনরূপ প্রাণি-হিংসাতেই তাঁহার আর প্রবৃত্তি থাকে না। সেই অবস্থায় হিংসাবর্জ্জিত মেধ্য আহারই তাঁহার প্রাণরক্ষার উপায় হয়। ফলত এই রূপ হিংসাবর্জ্জিত মেধ্য আহার দ্বারাই ধর্ম্ম-পরায়ণের দেহ মন সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে। প্রতিদিন ত্রিকালীন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে তাঁহার মন সবল এবং প্রতিদিন যৎকিঞ্চিৎ লঘু ও পথ্য আহারে তাঁহার দেহ বলীয়ান্। কিন্তু আমরা স্বাস্থ্যলাভের এমন উৎকৃষ্ট পথ থাকিতে স্বদোষেই কষ্ট পাই। আমাদের মধ্যে অনেকেই ব্রহ্মোপাসক কিন্তু বল দেখি কয় জন ব্রহ্মোপাসনাকে জীবনের মুখ্য কার্য্য এবং প্রাণের তৃপ্তিকে গৌণ কার্য্য করিতে পারিয়াছেন। ফলত আ-মরা অত্যন্ত অসংযত, আমাদের লোভই প্রবল। প্রাণের তৃপ্তিই সর্ব্বস্ব। এই-জন্য নানা চেষ্টায়ও স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারি না।

পূর্ব্বে এদেশে শরীর মন ও আত্মা এই তিন লইয়া ধর্ম্মসাধন ছিল। ইহার এক-টীকে উপেক্ষা করিলে ধর্ম্মসাধনের ব্যাঘাত হইত। ঈশ্বরচিন্তায় আত্মা ও মনকে যেমন সবল রাখিতে হইবে সেইরূপ মিত ও পথ্য আহারে দেহকেও বলীয়ান্ করা চাই। স্বাস্থ্য রক্ষা যে ধর্ম্মসাধনের একটী মুখ্য অঙ্গ, পূর্ব্বকালের লোকেরা ইহা ঠিক্ বুঝিতেন। তাঁহারা বলিতেন 'শরীরমাদ্যংখলু ধর্ম্মসাধনং'। প্রত্যেক সংহিতা খুলিয়া দেখ আহার্য্যগত বিধিনিষেধ ইহার বিশেষ প্রমাণ। এখন অনেকে হয়তো ঘোর কুসংস্কার বলিয়া সেই সমস্ত বিধি নিষেধ উপেক্ষা করিতে পারেন কিন্তু তখন সাধ-নাঙ্গ বলিয়া তৎসমুদায়ের প্রতি সকলের অত্যন্ত আস্থা ছিল। ইহার ফল যে স্বাস্থ্য-বৃদ্ধি তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বড় অধিক পূর্ব্বের কথা নয় এখনও এমন অনেক প্রাচীন লোক জীবিত আছেন তাঁহারা শৈশবাবধি আহার্য্যগত শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ পালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বেশ নীরোগ ও দীর্ঘজীবি, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার অনেকটা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। স্বাস্থ্য রক্ষা যে ধর্ম্মসাধনের একটা অঙ্গ এই ধারণা অনেকেরই নাই। এই জন্য নানাবিধ পীড়া ও অকাল মৃত্যুর বিশেষ প্রাদুর্ভাব।

এখানে একটী বিশেষ কথার অবতারণা করিতে চাই। গীতার টীকাকার শ্রীধরস্বামী শরীরকে সবল রাখিয়া ধর্ম্মসাধনের উপ-যোগা করিবার জন্য একটী ব্যবস্থা করি-য়াছেন। তিনি বলেন প্রতিদিন আহার কালে খাদ্য দ্রব্য দ্বারা উদরের অর্দ্ধাংশ পূরণ করিবে এবং অপর অর্দ্ধাংশ জল ও বায়ুর জন্য রাখিবে। ফলত আমরা যদি স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখি স্বাস্থ্য রক্ষার ইহাই প্রকৃত ব্যবস্থা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। আকণ্ঠ কতকগুলা উদরস্থ করিলে কি হইবে, যাহা উদরস্থ করিবে তাহা সহজে পরিপাক হইয়া বলাধান করে সে দিকে দৃষ্টি রাখা চাই। সুতরাং স্বামীকৃত আহার ব্যবস্থাই এই বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে অনুকূল। স্বাস্থ্য রক্ষার্থে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। এখন অনেকে ইংরাজ-দিগের অনুকরণে অনেকবার আহার করেন। এদেশের পক্ষে তাহা ঠিক নয়। এদেশে একটী প্রবাদ আছে 'ব্রাহ্মণো দ্বিন-ভুংক্তে' ব্রাহ্মণ একাহারী। একে ত আমাদের

দেশ একরূপ উষ্ণ প্রধান। এখানে বিশ্রামই শরীর মনের বিশেষ উপযোগী। এরূপ অবস্থায় একাহারী হইয়া পরিপাকের জন্য অবশিষ্ট সময় বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করা বিশেষ আবশ্যক। এইটী এখনকার পরিশ্রমী যুবার পক্ষে কতদুর খাটিবে বলিতে পারি না কিন্তু বর্ষীয়ান বৃদ্ধের পক্ষে ইহা একান্ত অপরিহার্য্য। ইহার অন্যথায় বৃদ্ধের দীর্ঘজীবন লাভের উপায়ান্তর নাই। ফলতঃ প্রতিদিন ধর্ম্মসাধনের দ্বারা মনকে সুস্থ রাখা এবং সুপাচ্য লঘু আহার দ্বারা দেহকে বলীয়ান করা সর্ব্বসাধারণের পক্ষেই ব্যবস্থেয়।

Sermons of Mahairsh Debendranath Tagore.

(Translated from Bengalee.)

Sermon XLII.

Our End and Aim.

Beloved Brahmos, my mind is being saturated with the sweetness of joy by the contemplation of the fact that you have come here with a peaceful mind at this peaceful hour of the morning for the worship of God. I rejoice that you have come here in a peaceful spirit to worship the Being who is peace if self. While you are here, your minds will be pervaded with holiness, I make no doubt. When you approach the throne of God, the longings of your soul will be satisfied, and you will feel you have a new life after you have tasted the nectar of divine companionship for the brief space of time that you will be here. Walk ye all with your minds fixed on God and your faces lifted up towards Him, and He will grant light to your eyes, and send strength to your souls and, delivered from sin and suffering, you shall be enabled to come to His presence. Where is to be found a greater gain than this ? What a precious gain in this life must we think it to be if, while yet confined within this body of mere dust, we obtain that holy immortal light. We should think that we have obtained the best fruit ef earthly life when, through all its misery and affliction, we have rendered ourselves fit for seeing God in the next world—that beautiful mansion on high. We should be steadfast to one end and aim and that is to obtain Him who is the One without a second and allholy and impervious to sin. All our intelligence, all our effort and all our labour have to be devoted to this one object. For God only pray ye all here with a joyful spirit, for God only do ye all patiently perform the duties of the righteous house-holder, and to God alone do ye all offer your body, your mind and your soul. Purify your heart and then approach God. Righteousness is that which profiteth man and it is the God-given religion: to do righteousness in the midst of the trials and tribulations of life is the only education of man. For such education depend not upon others, but depend upon God and yourself. Cultivate the effortful earnestness of the God-devoted ascetic and seek God's help, and your holy aspiration to be righteous will be fulfilled, and passing unscathed through the

ordeal of life you will obtain God who is without decay and without death and who is goodness itself.

O Supreme Spirit, reveal thyself unto us. Plant thou the truth in those who eagerly seek it ; send thou the religion of selflessness to those who are ready to suffer all affliction for the sake of religion ; appease Thou the thirst of those who have all through their lives wandered thirsting after thee, just as the thirst-tormented hart wander about panting after the water brook; to these all reveal Thy religion and bestow to them Thy knowledge and spread the truths of Brahmoism through all India.

১৮২৫ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধীনি পত্রিকার সাহার্য্য ও মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

R. G. Vanderkar Esqr Bombay Rs 25 ।—

L. N. Bezbaruah Esqr Howrah Rs 3 —

শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ	ভাণ্ডাড়া	১২॥০
,, ,, প্যারিমোহন রায়	কলিকাতা	৮৲
,, ,, সুরেন্দ্রমোহন গুহ	বাঁকিপুর	৩।৶০
,, ,, পরাণকৃষ্ণ সরকার	কলিকাতা	২৲
,, ,, নীলকমল মুখোপাধ্যায়	,,	৩।৶০
,, ,, অক্ষয়কুমার ঠাকুর	,,	৩৲
,, ,, যাদবকৃষ্ণ দাস	,,	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ ভট্টাচার্য্য	কলিকাতা	২।৶০
,, ,, প্রসন্নকুমার বসু	হাওড়া	৩।৶০
,, ,, গোপাল চন্দ্র দে	কলিকাতা	২৲
,, ,, এইচ, সি, মল্লিক এস্কোয়ার		৩।৶০
,, ,, তুলসীদাস দত্ত	কালীঘাট	৩।৵
আর, সি, রায় এস্কোয়ার	রাঁচি	৩॥৴
শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী বড়াল	বালি	৩৶
,, ,, মহেন্দ্রনাথ সেন	ডিব্রুগড়	৩৶
,, ,, আশুতোশ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	১৲
,, ,, ক্ষীরোদচন্দ্র দাস	,,	৫৲
,, ,, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার	,,	৯৲
,, ,, শ্যামলাল সরকার	,,	৩৲

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৪, মাঘ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪৩৮৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৩৮৶০
সমষ্টি	...	৯৭৬।৵৬
ব্যয়	...	৪৪০৵৯
স্থিত	...	৫৩৬৶৯

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ৩৬৶৯

৫৩৬৶৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ৩৪৪৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৩০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০০৲

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী

শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন রায়

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু ২৲

৩৪৪৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		৩।৵০
পুস্তকালয়		২৭৵৬
যন্ত্রালয়		৫৫।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	৮।৶০
সমষ্টি		৪৩৮৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩১৬॥৶৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩১৸৬
পুস্তকালয়	...	১৸৬
যন্ত্রালয়	...	৮৯৸৵৬
সমষ্টি		৪৪০৵৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি। ধনরক্ষক। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৪, ফাল্গুন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৮৩॥ ৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৩৬৶৯
সমষ্টি	...	৯১৯৸৩
ব্যয়	...	৩৭৮॥/৯
স্থিত	...	৫৪১৵৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন একেকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ৪১৵৬

৫৪১৵৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৮৪॥৶০

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮০৲

এককালীন দান।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী ৪৲

বাজে কাগজ বিক্রয় বাবৎ ॥৶০

১৮৪॥৶০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		১১/৬
পুস্তকালয়		১৫৸ ৬
যন্ত্রালয়		১৫৭।৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	১৪॥ ৬
সমষ্টি	...	৩৮৩॥ ৬

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৪৮৸৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৯॥৶৯
পুস্তকালয়	৯৵৩
যন্ত্রালয়	১০০৸৶০
	৩৭৮॥/৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি। ধনরক্ষক। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদক

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বর্ষশেষ ব্রাহ্মসমাজ।

সাগরের তরঙ্গরাশির মত অনন্ত কাল-সিন্ধুতে নিমেষ মুহূর্ত্ত পক্ষ মাস ঋতু সম্বৎসরের তরঙ্গ-পরম্পরা উঠিতেছে আর বিলীন হইতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিক্ষণেই একটি একটি মাস একএকটি বৎসরের আরম্ভ আর এক একটির শেষ হইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গ কেহ গণিয়া রাখে না—গণিয়া রাখিতে পারে না; এই কাল-সিন্ধুর অনন্ত অসীম তরঙ্গ,—কাহার সাধ্য তাহা গণনার কল্পনা-মাত্র করে।

"কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ" এই অবধিহীন কাল—আদিঅন্তহীন কালকে আমরা আমাদের কর্ম্মনির্ব্বাহের জন্য কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণ করিয়া শতধা বিভক্ত করিয়াছি; তন্মধ্যে বর্ত্তমান ভারত-বর্ষে বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বজনীন-রূপে বর্ষ গণনা হয়, সুতরাং অদ্যকার রজনীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেইরূপ একটি বর্ষ আমাদের অধিকারের সীমা অতিক্রম করিয়া অতীতের গর্ভে আশ্রয় লইতেছে।
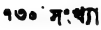
গত বৎসরের আরম্ভে আমরা কত শত সাধুভাব ও মঙ্গলকর্ম্মের উৎসাহ লইয়া সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কত পুণ্য সঙ্কল্প প্রাণকে পুলকিত করিয়া তুলিয়াছিল। যাঁহারা ভাগ্যবান্, তাঁহারা সম্বৎ-সরের সফলতা লইয়া আজি প্রফুল্ল মুখে অখিলবিধাতার দ্বারে উপস্থিত, আর মন্দ-ভাগ্য প্রতিকর্ম্মের মঙ্গল সঙ্কল্পের অন্যথা করিয়া আজ ম্লানমুখে রিক্তহস্তে কম্পিত-হৃদয়ে তাঁহার শরণাগত। আজ আমরা অতীত বর্ষের সাংসারিক সুখ দুঃখের—মানাপমানের ব্যর্থ আলোচনার জন্য এখানে মিলিত হই নাই, সে সকল যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে, অন্যথা করিবার আমাদের কাহারও সাধ্য নাই। আজি যিনি পুণ্যবান্ সিদ্ধকাম তিনি তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া কৃতজ্ঞতা অর্পণপূর্ব্বক দৃঢ়তররূপে নববর্ষের জন্য প্রস্তুত হউন, আর অকৃতার্থ বিফলকাম, অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার চরণে মার্জ্জনাভিক্ষা করিয়া নববর্ষের জন্য সাবধানতার সহিত গভীর নবীন উৎসাহে সচেতন হইয়া উঠুন। আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে এই—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোস্তেয়ঃ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যাসত্যমক্রোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণম্।"

ধৈর্য্য, ক্ষমা, দম, অচৌর্য্য, শৌচ ইন্দ্রিয়দমন, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ এই যে ধর্ম্মের দশটি লক্ষণ আছে তাহা আমাদের জীবনে কি পরিমাণে সাধিত হইয়াছে। অবশ্যই আমাদের প্রায় প্রত্যেকের মধ্যে এই ধর্ম্মসাধন বিষয়ে ন্যূনাধিক প্রভেদ আছেই, সেই প্রভেদ আমাদের নিজ নিজ জীবনের রহস্য—আমাদের প্রত্যেককে অন্তরে অন্তরে আপনাদের সফলতা নিষ্ফলতার আলোচনা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য বিশেষরূপে সাবধান হইতে হইবে। ধর্ম্মের যে দশটি লক্ষণের কথা বলা হইল তাহা তন্ন তন্ন করিয়া জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হইবে।

১ ম ধৈর্য্য—সংসারসমুদ্রে কতশত দুঃখশোক বিপদাপদের ঝঞ্ঝাতরঙ্গ নিরন্তর উঠিতেছে আর আমাদিগকে তাহাতে ডুবাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছে, একমাত্র ধৈর্য্যকে আশ্রয় করিয়া আমরা এই সংসারসাগরের প্রবল তরঙ্গে রক্ষা পাইতে পারি। আমরা এই বৎসরব্যাপী দুঃখ শোকে তাহা কি পরিমাণে সাধন করিয়াছি আজ তাহা ভাবিবার দিন।

২য় ক্ষমা—সংসার বড় কঠিন স্থান, বড়ই সাবধানতার সহিত আমাদিগকে এখানে পদনিক্ষেপ করিতে হয়, অকারণে সকারণে অজ্ঞাত কারণে শতদিক্ হইতে শতলোকের শত দুশ্চেষ্টা শত শত মর্ম্মভেদী তীব্রবাণ মনুষ্যকে কঠিনরূপে পীড়িত করে, তাহার প্রতিদান করিলে বা প্রতিদানের চেষ্টামাত্র করিলে আপনারই সর্ব্বনাশের পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, অতএব এই দারুণ সঙ্কটে ক্ষমা আমাদের মুখ্য সহায়; ক্ষমা দুর্ব্বলের রক্ষা-কবচ এবং—"শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা" সবলের ভূষণ। আজ হৃদয়ের ভিতরে অনুসন্ধান করিয়া দেখুন অন্যকৃত অপকার অপমানে ক্ষমা করা আমাদের সহজ হইয়াছে কি না!

৩য় দম—সংসার কঠোর পরীক্ষার স্থান, অবহেলাভরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অনুরোধ উপরোধে এখানকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চলে না; "দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি" পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন এ পথ অতি দুর্গম; সর্ব্বদা সচেতন ভাবে এখানে মনুষ্যকে ধীরে ধীরে গন্তব্যের প্রতি অগ্রসর হইতে হয়, প্রলোভনসঙ্কুল সংসাররঙ্গভূমিতে পদে পদে কামনার প্রলয়ঙ্করী কুমন্ত্রণা মনুষ্যকে চারিদিকে বিভ্রান্ত ও চঞ্চল করিয়া তুলে, নিত্য নূতন ভোগ্য বিষয়ের প্রতি চিত্তকে একান্ত লুব্ধ করিতে থাকে, কামনার অন্ত নাই, কামনার অধীন মানুষের কখনও শান্তি নাই; এই ভয়ঙ্কর শত্রুকে দমন করিতে না পারিলে আমাদের অন্তরের অগ্নিদাহ কিছুতেই শান্ত হয় না, দমগুণ প্রভাবেই কামনারূপ দুরাসদ শত্রুকে জয় করা যায়, সংসারের বিচিত্র কর্ম্মে বিচিত্র ঘটনায় আমরা কামনার দমনে কতটুকু কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহাও অদ্যকার বিশেষ আলোচ্য।

৪র্থ অস্তেয়—আমরা ঈশ্বরের প্রসাদে যে বিষয়ে অধিকারী হইয়াছি, তাহা ছাড়া পরের ধনে লোভ করাও পাপ। লোভ চৌর্য্যের জনক। নিরবচ্ছিন্ন বাহিরের নহে, সুধু পরের ধন নহে; অন্যের খ্যাতি প্রতিপত্তি হরণে আমরা বিরত থাকিতে পারিয়াছি কিনা তাহাও বিশেষ চিন্তনীয়।

৫ম শৌচ—প্রতিপলে প্রতিক্ষণে বিচিত্র রকমের মলিনতা আমাদের অন্তর বাহির সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, সেই মালিন্য মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত করে; তজ্জ-

ন্যই সাবধানতার সহিত মনুষ্যকে সর্ব্বপ্রকার মালিন্য দূর করিতে হয়। শরীরের মলিনতা শারীরিক ব্যাধির জন্ম দেয়, অন্তরের মালিন্য মনুষ্যকে পশু করিয়া তোলে, তজ্জন্যই শৌচ অর্থাৎ পবিত্রতা মনুষ্যধর্ম্মের একটি অঙ্গ।

৬ষ্ঠ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ—ইন্দ্রিয়াধীনতা আর পশুত্ব এক কথা। ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে মনুষ্যত্ব না হারাইয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে আত্ম-কর্ত্তৃত্বের শাসনাধীন করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য; আজ অন্তরের ভিতরে অনুভব করিব যে, আমরা কি পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের উপরে আত্ম-কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া সফলতার প্রতি অগ্রসর হইয়াছি।

৭ম ধী—ধীশক্তি অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি এইটি পরমেশ্বরের বিশেষ দান। এই ধীশক্তি অতুল-প্রভাব-সম্পন্ন। ধীশক্তিকে অযোগ্য বিষয়ে নিয়োগ করিলে তাহার ধীনাম লোপ পায়। অধর্ম্মে নিয়োজিত ধীর নাম কুবুদ্ধি। সাধু কর্ম্মে মঙ্গলানুষ্ঠানে প্রয়োজিত ধীই ধী, কল্যাণকর্ম্মে মঙ্গলানুষ্ঠানে যাঁহার ধীবৃত্তি বা প্রজ্ঞা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তিনিই ধীমান্। "ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ" যিনি নিরন্তর আমাদের মধ্যে ধীশক্তিকে প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার সংসারে ধী তাঁহার প্রিয়কর্ম্মানুষ্ঠানে ধ্যানে ধারণায় সার্থক না হইলে আমাদের দুঃখের হাহাকার মর্ম্ম-স্থল ভেদ করিয়া উঠিবেই উঠিবে।

৮ম বিদ্যা—অজ্ঞানতাই যথার্থ অন্ধতা। অজ্ঞানতা আমাদিগের তত্ত্ব বস্তুকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, যাহা জ্ঞেয়—যাহা বোদ্ধব্য অজ্ঞানতা তাহা জানিতে দেয় না, বুঝিতে দেয় না, দেখিতে দেয় না; জ্ঞান আমাদের প্রকৃত চক্ষু। "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যানযোগে অনন্ত পূর্ণ পুরুষকে দেখিতে পান। জগতের তুচ্ছ কার্য্যেও তত্তৎ কার্য্যের জ্ঞানের বা অভিজ্ঞতার সাধন চাই; যথার্থ জ্ঞান—অবশ্যই কঠোর সাধনের সামগ্রী; তাহা অপূর্ব্ব বাগ্‌বিন্যাস বা বিপুল অর্থের সহায়-তায় লাভ করা যায় না। সূর্য্য সম্বন্ধীয় আলোচনায় যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয় না, জ্ঞানের গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতায় তেমনি অজ্ঞা-নান্ধকার অপসারিত হয় না, সাধনপ্রভাবে নির্ম্মল চিত্তাকাশে জ্ঞানসূর্য্যের অভ্যুদয় হইলে অজ্ঞানের কুহেলিকা বিদূরিত হয়, আজ সকলে চিন্তা করিয়া দেখুন সেই বিদ্যা—সেই জ্ঞান অন্তরাকাশের কতটুকু পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে।

৯ম সত্য—"সত্যান্নাস্তি পরোধর্ম্মঃ" সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই। বাক্যে সত্যপরায়ণ হইতে হইবে, কর্ম্মে সত্য পালন করিতে হইবে, চিত্তে সত্যনিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে সকলই সহজ—সকলই সুকর। সমস্ত কল্যাণকর্ম্ম সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সকলপ্রকার মানবোচিত সৌভাগ্য সত্যের আশ্রিত, "সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্" সেই সত্য হইতে যে, যে পরিমাণে স্খলিত, সে সেই পরিমাণ মনুষ্যত্ব হইতে—ধর্ম্ম হইতে—ব্রহ্ম হইতে বিচ্যুত।

১০ম ক্রোধ—"ক্রোধঃ সুদুর্জ্জয়ঃ শত্রুঃ" ক্রোধকে জয় করিতে না পারিলে সমস্ত চেষ্টা সমস্ত তপস্যা নিষ্ফল হইয়া যায়।

আজ সকলে স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, দ্বেষ আমাদের অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে কি না; পরার্থা প্রীতি, দয়া, শ্রদ্ধা, প্রেম, ভক্তির সুগন্ধ কুসুমরাজি অন্তরোদ্যানে বিকশিত হইয়া জীবনকে সৌন্দর্য্যে সৌগন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে কি না। যিনি যে পরি-

মাগে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনি তজ্জন্য অহঙ্কৃত না হইয়া ফলদাতার চরণে আজ কৃতজ্ঞতা অর্পণ করুন, আর ভবিষ্যতের জন্য সাবধান ও সুদৃঢ় হউন, আর স্খলিতপদ—অকৃতকার্য্য ব্যক্তি অতীত বৎসরে আপনার ব্যর্থতার অনুতাপে এক্ষণেই সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তি দগ্ধ করিয়া বীর্য্যের সহিত ধৈর্য্যের সহিত উৎসাহের সহিত আগামী বর্ষে সফলতা লাভের জন্য প্রস্তুত হউন।

"নাত্মানমবমন্যেত পুর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ।
আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাং॥"

পূর্ব্ব অসমৃদ্ধি চিন্তা করিয়া আপনাকে অপমান করিবে না, মৃত্যু পর্য্যন্ত সৌভাগ্য-সম্পদের অন্বেষণ করিবে,ইহাকে দুর্লভ মনে করিবে না।

আজ সকলে সংসারের খণ্ডতা বিচ্ছিন্নতা—সমস্ত ভুলিয়া যান, অতীত বর্ত্তমান ও অনাগত সমস্ত সুখ, দুঃখ, মানাপমান, জয় পরাজয়, হাস্য, ক্রন্দন, সম্পদ্ বিপদ্, সফলতা ও নিষ্ফলতা সমস্তই আজ সেই অনন্ত আনন্দস্বরূপের অখণ্ড মঙ্গল-সূত্রে গ্রথিত করিয়া নির্ভয়ে কল্যাণের পথে দ্বিগুণ উৎসাহে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হউন।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং"

ঈশ্বরের দ্বারা জগতের সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া সমস্ত খণ্ডতাকে নিষ্ফলতাকে আজ সকলে দূর করিয়া দিন। আজ সুখে সম্পদে মানে জয়ে সকলে উপলব্ধি করুন—

"শান্তং শিবমদ্বৈতম্।"

তিনি শান্ত মঙ্গল ও অদ্বিতীয়।

আজ দুঃখে, বিপদে, অপমানে, পরাজয়ে অন্তরে অনুভব করুন—

"শান্তং শিবমদ্বৈতম্।"

তিনি শান্ত মঙ্গল ও অদ্বিতীয়।

আজ অন্তরে বাহিরে সঙ্গীতে বাদ্যে গগনে পবনে ধ্যানে জ্ঞানে সকলে প্রত্যক্ষ করুন—

"শান্তং শিবমদ্বৈতম্।"

তিনি শান্ত মঙ্গল ও অদ্বিতীয়। অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর! তুমিই আমাদের আত্মার অবলম্বন। মিথ্যা মরীচিকার ব্যর্থ অনুসরণে সময় ও শক্তির যথেষ্ট অপচয় করিয়াছি, যে শাশ্বত সুখের আশা মনুষ্য-জীবনের একমাত্র উপজীব্য, তাহার সাধনে কত ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে,মঙ্গলবিধাতা,সকলের সহায় তুমি, তুমি আমাদিগকে ভ্রান্তি হইতে—প্রমাদ হইতে—বিপথ হইতে রক্ষা কর, তুমি আমাদিগকে অজ্ঞানতা হইতে অহঙ্কার হইতে দম্ভ হইতে রক্ষা কর, তুমি আমাদিগকে অন্যায় চেষ্টা হইতে ধৃষ্টতা হইতে নিষ্ফলতা হইতে রক্ষা কর, অতীতের সমস্ত অভাব সমস্ত শূন্যতা সমস্ত দুর্ভাগ্য তোমার মঙ্গল সত্তায় পূর্ণ করিয়া দাও। ভবিষ্যতের জন্য তুমি আমাদের অন্তরে শুভ্র কল্যাণশক্তিকে জাগাইয়া দাও। হে মঙ্গলময়! আমাদের দুর্লভ মনুষ্যজন্ম ব্যর্থ হইতে দিও না, আমাদিগকে নিষ্ফল হইতে দিও না।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

২৪ চৈত্র বুধবার ১৮২৫ শক।

সংসার-সমুদ্র।

ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান
স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি।

সম্মুখে এই সংসার-সমুদ্র; কি ভয়ানক ইহার তরঙ্গ। ইহা হইতে মোহ-কুজ্ঝটিকা উত্থিত হইয়া চারিদিকে কি

অন্ধকার—অজ্ঞানঘন বিস্তার করিয়াছে। উপর হইতে অশনিপাতের কি হৃদয়বিদারক শব্দ। নিম্নে দেহ-তরীতে সবেগে তরঙ্গাঘাত। এ তরঙ্গলীলা দর্শনমাত্রেই মনে কি আতঙ্কেরি সঞ্চার হয়; আমরা কি আপন ইচ্ছাতে এমন ভয়ঙ্কর স্থানে আসিয়াছি? তাহা নহে। মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদের মঙ্গলের জন্য, শিক্ষার জন্য, আমাদিগকে এখানে আনিয়াছেন। তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক এ সংসারকে সুখের সংসার করেন নাই; শিক্ষার স্থান করিয়া দিয়াছেন। এখানে শোক দুঃখ বিবাদ বিসম্বাদ বিরহ বিচ্ছেদ কপটতা নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। এখানে বন্ধুতায় শান্তি নাই। আমি এই পবিত্র ব্যাখ্যানের কথাতেই বলি, এখানে যাহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে যাই; সে শত্রুর রূপ ধারণ করে। উদারস্বভাব মহাবীর জুলিয়স সিজার যখন রাজকার্য্য সম্পাদনের জন্য সিনেট সভায় বসিলেন, ষড়যন্ত্রকারিরা অমনি ছল করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল এবং গুরুতর রূপে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। আঘাতকারীদিগের মধ্যে তাঁর পরম বন্ধু ব্রুটসকে তিনি দেখিতে পাইলেন। সেও তাঁহার উরু দেশে আঘাত করিল। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তুই ব্রুটি এর মধ্যে আছিস্ তবে আর আত্মরক্ষায় চেষ্টা কেন?" জগতের অদ্বিতীয় বীর, রোমের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু বান্ধবের উপকারী সিজার পম্পের প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তির পদতলে অচেতন হইয়া পড়িলেন। হায় তিনি আর নাই। এই ত বন্ধুতার সুখ! খুজিঁলে এখানে এমন অনেক ব্রুটসই দৃষ্ট হইয়া থাকে। হায়! "হেথা কোথা প্রেম কোথা সুখ" এখানে প্রীতিতেও পরিতৃপ্তি নাই। যাহাকে হৃদয়ের সহিত প্রীতি কর, হায়! সে প্রাণের সহিত অকপটে হৃদয় দান করিয়া হয় অসময়ে সংসারে ঘোর ক্রন্দনের রোল তুলিয়া জন্মের মত চলিয়া যায়, নয় কপটতা দ্বারা প্রতারণা করিয়া হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক আঘাত করে। এখানে স্নেহের পুত্তলী অন্ধের যষ্টি, বৃদ্ধাবস্থার একমাত্র সহায়, প্রিয় সন্তান অসহায় পিতাকে ফেলিয়া জন্মের মত বিদায় লইতেছে। এখানকার সৌভাগ্য নিতান্তই চঞ্চল। "নীরবিন্দু দুর্ব্বাদলে, নিত্য কিরে ঝল ঝলে, কেনা জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যপাতী।" এখানে যার আশ্রয় আমরা গ্রহণ করিতে যাই, তিনিই হয় ত আমাদের নির্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হন। স্কট্‌লণ্ডের রাণী মেরী স্বরাজ্যে প্রপীড়িত হইয়া, স্বীয় ভগিনী ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মাছি যেমন মাকড়শার জালে আশ্রয় গ্রহণ করে, তিনিও তাই করিলেন। পাষাণহৃদয় নিষ্ঠুরপ্রকৃতি এলিজাবেথ প্রথমে তাঁহাকে বন্দী করিয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়া, পরিশেষে তাঁহার প্রাণ দণ্ড করিলেন। ইংলণ্ডের প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজা অষ্টম হেন্‌রীর রাজসভায় কর্ডিন্যল উল্‌সীর কি প্রতিপত্তি, কি প্রভাব, কি অসীম ক্ষমতা; তাহা সকলেই জানেন। রাজা তাঁহার হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকা মাত্র। তিনি যে দিকে লওয়ান রাজা সেই দিকেই যান। যেন তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে ইংলণ্ডের বড় বড় লোকের ভাগ্যস্রোত কিরিয়া দাঁড়াইত। এই উল্‌সি পরিশেষে রাজার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে দিবানিশি অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইয়াছিলেন। দুঃখ ও অনুতাপে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি মৃত্যুশয্যায় উৎকৃষ্ট শিক্ষা পাইয়া বলিয়াছিলেন, "হায়! যে অনুরাগে রাজসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, যদি সেই অনুরাগে

রাজ-রাজের সেবা করিতাম, তাহা হইলে তিনি আমাকে কখনই এই বৃদ্ধ বয়সে পরিত্যাগ করিতেন না।

যে কলম্বস্ পৃথিবীর অপরার্দ্ধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনিও অকারণে রাজ-আজ্ঞায় লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আমেরিকা হইতে রাজসমীপে বন্দীরূপে আনীত হইয়াছিলেন। এখানে অধিক স্থলেই সৎকার্য্যের এইরূপ পুরস্কার হইয়া থাকে। তবে এখানে কার উপর নির্ভর করিয়া আমরা শান্তি পাইতে পারি? "সংসার-সঙ্কটে ত্রাণ নাহি কোনরূপে, বিনা তাঁর সাধনা" কেবল একমাত্র দুঃখীর ধন, অকিঞ্চনের গুরু, সেই দয়াময় প্রেমময়ের আশ্রয় ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। তাঁর প্রেমমুখের আলোকই কেবল এ সংসারের ঘোর অন্ধকার দূর করিতে সক্ষম। তিনি হৃদয়ে আসিলেই আমরা এ সংসারের কণ্টকময় পথে লৌহ-দণ্ডের ন্যায় চলিতে পারি। এ প্রেমমুখের আলোক কি কেবল কল্পনাসম্ভূত। কখনই নহে। যিনি পিপাসু হইয়া, সংযত ও পবিত্র হইয়া তাঁহার জন্য আশাপথ চাহিয়া থাকেন, তিনি নিশ্চয় স্বীয় হৃদয়ে তাঁহার আবির্ভাব বুঝিতে পারেন। ঋষিরা বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া স্তিমিত লোচনে যে ভগবানের ধ্যানধারণায় নিযুক্ত থাকিতেন, তাহার ফল কি শূন্যে শূন্যে ভাসিয়া যাইত, কখনই নহে। সেই সার সত্য যদি জগতে না থাকিতেন; তাঁহাকে যদি ভক্ত হৃদয়ে প্রত্যক্ষ না করিত, সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করিত, তাহা হইলে কেহ আর তপস্যায় নিরত হইয়া তাঁহাকে ডাকিত না। আধ্যাত্মিক জগতে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে। তাঁহার পদানত ভৃত্য তাহা স্পষ্টই দেখিতে পান—তাঁর নিকটে ব্রহ্মলোক নিয়তই প্রকাশমান্ থাকে। তিনি নিয়তই সেই অসীম শক্তির সাহায্য পাইয়া থাকেন। তাঁর আত্মাই তার সাক্ষী। বাহিরে এ কথার কোথাও প্রকাশ নাই। আমরা অতি ক্ষুদ্র হইয়াও যদি যত্ন ও তাঁর কৃপা ভিক্ষা করি, আমরাও সেই পরমানন্দস্বরূপ হৃদয়ে লাভ করিতে পারি। আমরা বীজবপন ও ভূমি-কর্ষণ করিতে পারি; কিন্তু উপর হইতে বারিধারা বর্ষিত না হইলে আমাদের সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যায়। সেইরূপ তাঁহার কৃপা তাঁহার প্রসন্নতা ভিন্ন আমরা সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারি না। অতএব যত্ন কর, তপস্যা কর, সংযত হও এবং তাঁহার কৃপা ভিক্ষা কর, দেখিবে, সময়ে অপূর্ব্ব ফললাভ হইবে। তাঁহাকে পাইবার জন্য অকপটে তাঁর নিকট প্রার্থনা কর। তাঁহাকে পাইবার এমন সহজ পথ আর নাই। প্রতিদিন তাঁর দ্বারে উপনীত হইয়া বল,—

"প্রতিদিন আমি হে জীবন স্বামী
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!
করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!
তোমার অপার আকাশের তলে,
বিজনে বিরলে হে,
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে,
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!"

যখনই তিনি তোমার হৃদয়ের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিবেন তখনি তিনিও তোমার সম্মুখে দাঁড়াইবেন। হৃদয়ে দর্শন দিয়া, হৃদয়তন্ত্রীকে বাজাইয়া দিবেন,—

"আমি সহজে মিলিত হই
পাপির সনে,
যদি ডাকে সে একবার আমায়
কাতর প্রাণে।
অহঙ্কারী পাপী যারা, পায় না দেখা
আমায় তারা,

দীনজনের বন্ধু আমি
জানে সর্ব্বজনে।”

নাথ! অনাথের নাথ! সংসার-সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। কোথা যাই; কার শরণাপন্ন হই। আমরা তোমারি শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি। তুমি অভয় দান কর। এ অন্ধকার সংসারের পর পারে, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামে—শান্তি-নিকেতনে, তুমি আমাদিগকে লইয়া যাও।

“তব বলে কর বলী যে জনে;
কি ভয় কি ভয় তাহার।”

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সার সত্যের আলোচনা।

আছে এবং আছি'র অধিকারভেদ।

বিগত বারের প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছিলাম এই বলিয়া ঃ—

“উপরে যে ভাবের আছি এবং আছে'র প্রমাণ দেখানো হইল, তাহা কেবল এখন আছি এবং এখন আছে মাত্র; সুতরাং তাহা কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। এতদ্ব্যতীত ঐ দুই পরিচ্ছিন্ন আছি এবং আছে'র সন্ধি-স্থানে সমস্ত লইয়া যে এক আছি বিরাজমান, তাহাই সত্যজগতের প্রবেশদ্বার।”

এখন দ্রষ্টব্য এই যে, সমস্তের আদি-অন্ত মধ্য লইয়া সেই-যে সর্ব্বমূলাধার আমি আছি, তিনি সাধনের পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ—সকল বিষয়েই সিদ্ধ—সকল প্রকারেই সিদ্ধ—পরাকাষ্ঠা-সিদ্ধ—স্বতঃসিদ্ধ। পক্ষান্তরে, কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন এই যে, আমি আছি, ইহাকে ক্রমাগতই সাধন দ্বারা বর্ত্তমান থাকিতে হইতেছে;—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বায়ু সেবন করিয়া, প্রহরে প্রহরে অন্নপানীয় সেবন করিয়া, নিরন্তর আলোক এবং উত্তাপ সেবন করিয়া প্রাণধারণ করিতে হইতেছে; অষ্টপ্রহর চলা-ফেরা বলা কহা দেখা-শোনা করিয়া মনের পাথেয় সম্বল যোগাইতে হইতেছে; বিচার-বিবেচনা এবং যুক্তি পরিচালনা করিয়া বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে হইতেছে। এ আছি সকল বিষয়েই আছে'র নিকটে ঋণী;—আছে'র খাইয়া মানুষ, আছে'র কাঁধে ভর দিয়া দাঁড়ায়, আছে'র হাত ধরিয়া চলা ফেরা করে। আছে'র বলেই আছি—অথচ যেন আপনার বলে আছি, এইরূপ একটা নাট্যাভিনয় চলিতেছে। দৈবাৎ কখনো রঙ্গভূমি হইতে আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইয়া, আমরা যখন আমাদের শরীরের বিসদৃশ সাজসজ্জার প্রতি চক্ষু নির্বিষ্ট করি, তখন আমাদের চমক লাগে। ক্ষণপরে আবার যখন অধিকারীর ধমকের চোটে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া স্বাধীনতার উচ্চশিখরে উন্নতমস্তকে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াই, তখন আমাদের মনে হয় যে, আছিই গোড়ার কথা—আছে তাহার একটা লেজুড় মাত্র; পক্ষান্তরে, যখন আমরা দৈবদুর্ব্বিপাকে আক্রান্ত হইয়া স্বাধীনতার প্রতি আস্থাহীন হই, তখন আমাদের মনে হয় যে, আছেই গোড়ার কথা, আছি তাহার একটা লেজুড় মাত্র।

যাহাই হউক্ না কেন—আমরা স্বাধীনতায় ভর করি তো! কিসের জোরে ভর করি—সেইটিই এখন বিবেচ্য। শুধু কি কেবল গায়ের জোরে স্বাধানতায় ভর করি? অথবা আর কোন কিছু'র জোরে?

এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া যখন আমরা অন্তরে-বাহিরে চারিদিকে চাহিয়া দেখি, তখন আমরা দুই ক্ষেত্রে আপনার দুইপ্রকার বিপরীত ভাব দেখিতে পাই; বুদ্ধিক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেখিতে পাই এবং ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রে পরাধীনতা দেখিতে পাই।

বুদ্ধি ক্ষেত্রে আছি'র স্ফূর্ত্তি।

ফরাসাস্ তত্ত্ববিৎ দে-কর্ত্তা'র উদ্দীরিত (চিন্তয়ামি)Cogito(অতঃ) ergo (অস্মি)" sum "ভাবিতেছি অতএব আছি" আজিকের কালের বিদ্যার বাজারে সকলেরই জানা কথা। পরন্তু, আমাদের স্বদেশের পঞ্চদশীগ্রন্থে, এবং সাংখ্যসার নামক একখানি চটি সংস্কৃত পুস্তকে অবিকল উহারই দুইটি জুড়ি-বচন স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—এ রহস্যটি অনেকেই জানেন না। দে-কর্ত্তা বলিয়াছেন "আমি আপ • অস্তিত্বে সংশয় করিতে পারি না, কেন না সংশয় করিলেই সংশয়কর্ত্তা যে আমি আপনি, তাহা সপ্রমাণ হইয়া সংশয় তৎক্ষণাৎ ঘুচিয়া যায়। ইহারই একটি জুড়ি ধাচা'র কথা এই যে, আমার "জিহ্বা নাই" এইরূপ বাক্য আমি বলিতে পারি না ; কেন.না, "জিহ্বা নাই" বলিলেই প্রমাণ হয় যে. আমি জিহ্বা দ্বারা ঐ কথাটি উচ্চারণ করিলাম। পঞ্চদশীর গ্রন্থকার তাই বলেন যে—

জিহ্বা মেঽস্তি ন বেত্যুক্তির্লজ্জায়ৈ কেবলং যথা।
ন বুধ্যতে ময়া বোধো বোদ্ধব্য ইতি তাদৃশী॥

ইহার অর্থ এই যে—"আমার জিহ্বা আছে কি নাই" এ কথা যেমন হাস্যাস্পদ, "আমার জ্ঞান আছে কি না তাহা আমি জানি না" এ কথাও তদ্বৎ। পুনশ্চ দে-কর্ত্তা বলেন—"আমি চিন্তা করিতেছি" এই রূপ জ্ঞানের বলেই আমার অস্তিত্ব সপ্রমাণ। সাংখ্যসার-প্রণেতা বলেন—

"দ্রষ্টা সামান্ততঃ সিদ্ধো জানেঽহমিতি ধীবলাৎ।"

ইহার অর্থ এই যে—"আমি জানিতেছি" এইরূপ বুদ্ধিবলে দ্রষ্টার অস্তিত্ব সাধারণত সপ্রমাণ। দে-কর্ত্তা বলেন—"ভাবিতেছি, অতএব অছি,"সাংখ্যসার -প্রণেতা বলেন—"জানিতেছি, অতএব আছি"; ভাবার্থ একই।

প্রকৃত কথা এই যে, অতএবের সাঁড়াষী দিয়া 'ভাবিতেছি' হইতে 'আছি' টানিয়া বাহির করা যুক্তির একটা ভড়ং বই আর কিছুই না। যদি ভাবিতেছি এবং আছি'র মাঝখানে একটা রাস্তা-বন্দি করা নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তবে তাহা একটিমাত্র অতএবের সোজা রাস্তা বাঁধিয়া দেওয়ার কর্ম্ম নহে ; একটির জায়গায় উপর্য্যুপরি তিনটি অতএবের সিঁড়ি বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক :—স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক যে—

(১) ভাবনা জ্ঞানক্রিয়া,

অতএব

"ভাবিতেছি" বলিলেই বুঝায় যে, জ্ঞান কার্য্য করিতেছে।

(২) কার্য্য-মাত্রই শক্তিসাধ্য,

অতএব

"জ্ঞান কার্য্য করিতেছে"বলিলেই বুঝায় যে, তাহার মূলে ধীশক্তি আছে।

(৩) শক্তিমাত্রই সত্ত্বাশ্রিত,

অতএব

"ধীশক্তি আছে" বলিলেই বুঝায় যে, ধীমান্ পুরুষ আছে—আমি আছি।

তুমি হয় তো বলিবে যে, "তোমার তিন অতএব স্যাকরার ঠুক্‌ঠাক্, দে-কর্ত্তার এক অতএব কামারের এক ঘা :—এক অতএবই যথেষ্ট—তিন অতএব বহ্বাড়ম্বর!" ইহার উত্তর এই যে, কামারের এক ঘা খাটাইবার উপযুক্ত স্থান অনেক আছে—দার্শনিক তত্ত্বের কাঁচা সোণার উপরে কেন এ দৌরাত্ম্য। ভূয়োদর্শনের লৌহপিণ্ডের উপরে অনুমান-হাতুড়ির এক ঘা প্রয়োগ করিয়া জগৎ-জোড়া বিশাল তত্ত্বসকল উদ্ভাবন করুন্— তাহাতে বারণ নাই। পরন্তু দার্শনিক তত্ত্বের হার গাঁথিতে হইলে সূক্ষ্ম যুক্তিসূত্রের—(অতএব-পরম্পরা'র) সঞ্চালন ব্যতিরেকে আর-কোনো উপায়ে

তাহা সম্ভাবনীয় নহে—ইহা জানা উচিত। কথাটা হ'চ্চে এই :—

"আমি চিন্তা করিতেছি" বলিলে যেমন বুঝায় যে, আমিই চিন্তা করিতেছি সুতরাং আমি আছি; "আমি কার্য্য করিতেছি" বলিলেও তেমনি বুঝায় যে, আমিই কার্য্য করিতেছি সুতরাং আমি আছি; তা যদি বুঝায়—তবে কেন দে-কর্ত্তা "কার্য্য করিতেছি অতএব আছি" না বলিয়া "চিন্তা করিতেছি অতএব আছি" বলিলেন। আমি যে-কেনো কার্য্য করি, তাহাতেই যদি আমার অস্তিত্ব যথেষ্ট সপ্রমাণ হয়, তবে আমার আর-আর কার্য্যের মধ্য হইতে চিন্তা-কার্য্যটিকে বাছিয়া লইয়া সেই কার্য্যটিকেই কেবল আমার অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ বলিয়া ধার্য্য করিবার তাৎপর্য্য কি? তাহার বিশেষ একটি তাৎপর্য্য আছে; তাহা এই:—

আমার সকল কার্য্য শুদ্ধ যে কেবল আমার নিজের শক্তিতে কৃত হয়, তাহা নহে। মনে কর, আমি চন্দ্রোদয় দেখিতেছি। চন্দ্রের প্রতি তাকাইয়া চন্দ্রের প্রকাশ চক্ষুরিন্দ্রিয়ে অনুভব করিতেছি। চন্দ্রের প্রকাশ এক-প্রকার প্রভাব, আর আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ে প্রকাশের সেই যে অনুভূতি, তাহা সেই প্রভাবেরই অনুভাব। প্রতিধ্বনি যেমন ধ্বনির অনুক্রিয়া, অনুভাব তেমনি প্রভাবেরই অনুক্রিয়া। তবেই হইতেছে যে, চন্দ্রেরই শক্তিপ্রভাবে আমি চন্দ্রদর্শন করিতেছি—আমার নিজের শক্তিপ্রভাবে নহে। তাহার পরে, মনে কর, আমি বিছানায় পড়িয়া শুয়ে-শুয়ে চন্দ্র ভাবিতেছি। এখন আর চন্দ্রের প্রভাব আমার চক্ষুর উপরে কার্য্য করিতেছে না; এখন আমি তাই স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি যে, আমি আমার নিজের ধীশক্তির প্রভাবে চন্দ্র ধ্যান করিতেছি। অনুভাবের গোড়ায় যে অনু রহিয়াছে, সেটি বড় সহজ পাত্র নহে। সেই অনুটাই ইঙ্গিতচ্ছলে জ্ঞাপন করিতেছে যে, অনুভাব তোমার আপন শক্তির প্রভাব নহে, তাহা অপর-কোনো বস্তুর প্রভাবের অনুক্রিয়া। কিন্তু এক্ষণে যখন আমি বিছানায় শুইয়া চন্দ্র ভাবিতেছি, তখন, অনুভাবনার অনু ঘুচিয়া গিয়াছে, আর, সেই-গতিকে আমার এখনকার জ্ঞানক্রিয়া নিখুঁত ভাবনা-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এখন আমি অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, এ-যে আমার ভাবনা—এ ভাবনা অনুভাবনা নহে, এ ভাবনা প্রভাবনা; ইহা আমার নিজের ধীশক্তির প্রভাব-স্ফূর্ত্তি। এই যে একটি কথা যে, "ভাবনা-কার্য্যে আমাদের নিজের ধীশক্তির প্রভাব স্ফূর্ত্তি পায়, অতএব ভাবনা আমাদের নিজের অস্তিত্বের পরিচায়ক"—এ কথাটি দে-কর্ত্তা যদি-চ বলেন নাই—আমরাই কেবল বলিতেছি; কিন্তু ভাবে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আমাদের ঐ কথাটি দে-কর্ত্তার মনোমধ্যে বিলক্ষণই আধিপত্য করিয়াছিল; তবে কি না—তাঁহার নিয়োজিত একটিমাত্র অতএবের শরীরে এতাধিক বল নাই যে, তাঁহার ঐ প্রকৃত মন্তব্য-কথাটির গুরুভার স্কন্ধে বহন করে। আমরা যেরূপ উত্তরোত্তর-ক্রমে 'ভাবিতেছি' হইতে 'আছি'তে নাবিলাম—প্রথম অতএবে ভর দিয়া ভাবনা হইতে জ্ঞানে নাবিলাম, দ্বিতীয় অতএবে ভর দিয়া জ্ঞান হইতে ধীশক্তিতে নাবিলাম, তৃতীয় অতএবে ভর দিয়া ধীশক্তি হইতে ধীমান্ পুরুষের অস্তিত্বে নাবিলাম; এরূপ না করিলে (মন্তব্য-কথাটি খুলিয়া খালিয়া না বলিলে) হয় এই:—"ভাবিতেছি অতএব আছি" "দেখিতেছি অতএব আছি" "নাচিতেছি অতএব আছি" ইত্যাকার সমস্ত কথারই মূল্য সমান হইয়া দাঁড়ায়, আর, সেই-

গতিকে দে-কর্ত্তার মহাবাক্যটি সচ্ছিদ্র নৌকার ন্যায় জলমগ্ন হইয়া যায়।

প্রশ্ন উঠিয়াছিল এই যে, আমরা যখন স্বাধীনতায় ভর করিয়া দাঁড়াই, তখন কি গায়ের জোরে স্বাধীনতায় ভর করি—অথবা আর-কোনো কিছুর জোরে? এখন দেখিতেছি যে, ধীশক্তির জোরে আমরা স্বাধীনতায় ভর করিয়া দাঁড়াই। আমি আছি'র বোধ হইতে স্বাধীনতার ভাব আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে। আসিয়া পড়ে এইরূপে :—

আমার আপনার অস্তিত্ব আমার আপনারই ধীশক্তির প্রভাবে সমর্থিত হয়, তদ্ব্যতীত অপর-কোনো-কিছুর শক্তির প্রভাবে সমর্থিত হয় না—আমি আছি'র সমর্থন-কার্য্য আমার আপনারই ধীশক্তির অধীন, তদ্ব্যতীত আর-কোনো কিছুর অধীন নহে—সুতরাং আমি স্বাধীন।

এইরূপে আমরা স্বাধীনতায় ভর করিয়া দাঁড়াই বুদ্ধিক্ষেত্রে। কিন্তু তা ছাড়া—আর-এক ক্ষেত্র আছে;—সেটা হ'চ্চে ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্র। ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রেও আমরা পূর্ব্বের ন্যায় তিন অতএবের সিঁড়ি ভাঙিয়া—

কার্য্য হইতে শক্তিতে এবং শক্তি হইতে সত্তাতে অবতরণ করি। এবারকার সোপান-পদ্ধতি এইরূপ :—

(১) দর্শন ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া,

অতএব

"আমি দর্শন করিতেছি" বলিলেই বুঝায় যে, আলোক দ্বারা আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় উপরক্ত হইতেছে।

(২) কার্য্যমাত্রই শক্তিসাধ্য,

অতএব

"আলোক দ্বারা আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় উপরক্ত হইতেছে" বলিলেই বুঝায় যে, আলোকের উপরঞ্জনী শক্তি আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উপরে কার্য্য করিতেছে।

(৩) শক্তিমাত্রই সত্তাশ্রিত,

অতএব

"আলোকের উপরঞ্জনী শক্তি কার্য্য করিতেছে" বলিলেই বুঝায় যে, আলোক-পদার্থ আছে।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, দর্শনক্রিয়া আমার আপনারই ইন্দ্রিয়ক্রিয়া। আমার আপনার ক্রিয়াতে আমার আপনারই অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। অতএব ভাবনা-ক্রিয়াও যেমন, দর্শন-ক্রিয়াও তেমনি—দুইই শুধু-কেবল আমার আপনার অস্তিত্বেরই সাক্ষ্য-প্রদান করে; তা বই দৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্বের সাক্ষ্যপ্রদান করে না। স্বপ্নেতেও তো আমরা আলোক দর্শন করি; কিন্তু তাহা তো আর বাস্তবিক আলোক নহে। ইহার উত্তর এই যে, ধ্বনি না থাকিলে যেমন প্রতিধ্বনি থাকিতে পারে না, জাগরিতাবস্থা না থাকিলে তেমনি স্বপ্নাবস্থা থাকিতে পারে না। স্বপ্নাবস্থা জাগরিতাবস্থারই প্রতিধ্বনি। ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি উভয়ে যেমন নিরবচ্ছিন্ন কার্য্যকারণসূত্রে সংগ্রথিত, জাগরিতাবস্থার আলোকদর্শন এবং স্বপ্নাবস্থার আলোকদর্শন, এ দুইটি ব্যাপার তেমনিই নিরবচ্ছিন্ন কার্য্যকারণসূত্রে সংগ্রথিত। মনে কর, একজন পাচকের হস্ত হইতে একটা লোহার হাতা দৈবক্রমে খসিয়া জ্বলন্ত উনানের ভিতরে পড়িয়া গেল। অগ্নি-সংযোগে হাতা এরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল যে, পাচক তাহা তুলিয়া লইতে পারিল না। এরূপ অবস্থায় হাতাটি যে অগ্নির শক্তিপ্রভাবে উত্তপ্ত হইয়াছে—পাচকের এটা দেখা কথা। মনে কর, তাহার পরে, উনানে একঘটি জল ঢালিয়া অগ্নি সমূলে নির্ব্বাণ করিয়া ফ্যালা হইল; কিন্তু হাতাটা এখনো উত্তপ্ত। অগ্নি যদি-চ এখন নাই, তথাপি পাচককে হাতার উষ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, পাচক

বলিবে যে, অগ্নির শক্তিপ্রভাবেই হাতাতে উত্তাপের সঞ্চার হইয়াছে। এ যেমন দেখা গেল, তেমনি স্বপ্নদর্শকের চক্ষু এখন যদি-চ নিমীলিত, এবং সূর্য্য এখন যদি-চ অস্তমিত, কিন্তু সাত-আট ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহার চক্ষু উন্মীলিত ছিল এবং সূর্য্য আকাশে দীপ্তি পাইতেছিল। আর চক্ষুর সেই উন্মীলিত অবস্থায় তাহার গোলকের অভ্যন্তরে সূর্য্যালোক যেরূপ শক্তিসঞ্চার করিয়াছে, স্বপ্নের আলোক-দর্শন তাহারই অন্যতম প্রভাব-স্ফূর্ত্তি। ইহার প্রমাণ যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহা স্পষ্টই পড়িয়া আছে;—তাহা এই যে, স্বপ্ন-দর্শকের আলোক-দর্শন যখন তাহার নিজের ইচ্ছাধীন নহে, তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, কোনো-না-কোনো বহির্বস্তুর শক্তিপ্রভাবেই তাহা সংঘটিত হইতেছে। বলিলাম, "সূর্য্যের শক্তিপ্রভাবে স্বপ্নদর্শক আলোক দর্শন করিতেছে"; তাহা না বলিয়া বলিতে পারিতাম যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৈজস-তন্তুর (Nerve-এর) শক্তিপ্রভাবে স্বপ্নদর্শক আলোক দর্শন করিতেছে; দুই কথা একই কথা;—"নেপোলিয়নের সৈন্য যুদ্ধ জয় করিয়াছে" বলাও যা, আর, "নেপোলিয়ন যুদ্ধ জয় করিয়াছেন" বলাও তা—একই কথা। মরুভূমির বালুকার উত্তাপ এবং সূর্য্যের উত্তাপ, একই বস্তু। সূর্য্যালোকের প্রভাব যদি চাক্ষুষ তৈজস-তন্তুতে কোনোকালেই সংক্রামিত না হইত, তাহা হইলে স্বপ্নেও সূর্য্যালোকের দর্শনলাভ সম্ভাবনীয় হইত না। অতএব এটা স্থির যে, ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রে আমরা (১) বহির্বস্তুর শক্তির প্রভাব, (২) তাহারই সত্তার প্রাদুর্ভাব এবং (৩) আমাদের নিজের স্বাধীনতার অভাব, তিনই একসঙ্গে অনুভব করি।

আমাদের গোড়া'র কথাটি এতক্ষণে সপ্রমাণ হইল; সে কথা এই যে, "আমরা দুই ক্ষেত্রে আপনার দুইপ্রকার বিপরীত ভাব দেখিতে পাই ঃ—বুদ্ধিক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেখিতে পাই—ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রে—পরাধীনতা দেখিতে পাই।"

অতঃপর দেখিতে হইবে এই যে, বুদ্ধিক্ষেত্রে আমরা স্বাধীনতা অনুভব করি বটে—কিন্তু কতক্ষণ? বুদ্ধি যতক্ষণ চলে—ততক্ষণ। কোনো-গতিকে যদি আমার বুদ্ধিক্রিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায় (যেমন ক্লোরোফর্ম্ম-সেবন-গতিকে) তাহা হইলে সেই সঙ্গে আমার স্বাধীনতাবোধও অন্তর্ধান করে—আছি-বোধও অন্তর্ধান করে। ফল কথা এই যে, আমি আছি এই বোধ এবং সেই সঙ্গে আমার স্বাধীনতাবোধ, দুইই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আমার নিজের ধীশক্তির উপরেই নির্ভর করে—এ কথা সত্য। কিন্তু তা বলিয়া এটা ভুলিলে চলিবে না যে, পরোক্ষ-সম্বন্ধে তাহা বহির্বস্তুর অস্তিত্বের উপরে নির্ভর করে। সাক্ষাৎসম্বন্ধ হ'চ্চে বস্তু-গুণের সম্বন্ধ; পরোক্ষসম্বন্ধ হ'চ্চে কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ। আর, সে দুই সম্বন্ধের গোড়া'র কথা হ'চ্চে সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের একাত্মভাব।

পূর্ব্বে দেখা হইয়াছে যে, সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান, পরস্পরের সহিত এরূপ হরিহর-ব্রহ্মাত্মা যে, সে তিন পদার্থ একপ্রকার তিনে এক একে তিন। ইহা হইতেই আসিতেছে এই যে, আমাদের জ্ঞান এক-দিকে সত্তার সহিত এবং আর-এক-দিকে শক্তির সহিত—দুয়েরই সহিত—ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত। কাজেই জ্ঞানকে দুই কূল রক্ষা করিয়া চলিতে হয়—দুই দিকের দুই প্রকার সম্বন্ধ সমান মানিয়া চলিতে হয়। এক-দিকের সম্বন্ধ হ'চ্চে সত্তা-ঘটিত বস্তুগুণের সম্বন্ধ; আর-এক-দিকের

সম্বন্ধ হ'চ্চে শক্তি-ঘটিত কার্য্যকারণের সম্বন্ধ।

বস্তুগুণের দ্বার।

বস্তুগুণ-সম্বন্ধের দ্বার দিয়া আমি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, জ্ঞান আমারই একপ্রকার গুণ; তাহা আমাতেই উত্থান করে, আমাতেই বিলীন হয়; তাহা ষোলোআনা আমার নিজস্ব সম্পত্তি—তাহার অপর কোনো অংশী নাই—সরিক নাই। আর, আমার আপনারই সেই জ্ঞানে আমার অস্তিত্ব সপ্রমাণ। আমার অস্তিত্বের দৃঢ়তা এবং বলবত্তা সাধন করিবার জন্য আমাকে অপর-কাহারো দ্বারস্থ হইতে হয় না; আমার অস্তিত্ব স্বাধীন অস্তিত্ব—আমি স্বাধীন।

কার্য্যকারণের দ্বার।

পক্ষান্তরে, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের দ্বার দিয়া আমি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমার জ্ঞান একপ্রকার কারণমূলক কার্য্য; তাহা আমার ধীশক্তির স্ফূর্ত্তির উপরে নির্ভর করে; ধীশক্তির স্ফূর্ত্তি চেতনাশক্তির উপরে নির্ভর করে; চেতনাস্ফূর্ত্তি প্রাণস্ফূর্ত্তির উপরে নির্ভর করে; প্রাণস্ফূর্ত্তি বহির্বস্তুর শক্তিস্ফূর্ত্তির উপরে নির্ভর করে।

স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা।

আমরা যখন জ্ঞানরূপ গুণের আধার-বস্তুর উপরে লক্ষ্য নিবিষ্ট করি, তখন স্বাধীনতা অনুভব করি; পক্ষান্তরে, যখন জ্ঞানরূপ কার্য্যের কারণের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করি, তখন পরাধীনতা অনুভব করি। আমি যদি পরাধীনতার হস্ত এড়াইবার জন্য বুদ্ধি-ক্ষেত্রের কৈলাসশিখরে স্বাধীনতায় ভর করিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকি, আর, মনে করি যে, কার্য্যকারণের সম্বন্ধ এখানে আমাকে হাত বাড়াইয়া নাগাল পাইবে না—তবে তাহা শুদ্ধকেবল মনে করা মাত্র। কেন না, আমি যতই কেন আপনাকে স্বাধীন মনে করি না—নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য আমাকে বায়ুর আশ্রয়ে নির্ভর করিতে হইবেই; অন্ন-পানীয়ের জন্য মৃত্তিকা-জলের আশ্রয়ে নির্ভর করিতে হইবেই; আলোক-উত্তাপের জন্য অগ্নি-সূর্য্যের আশ্রয়ে নির্ভর করিতে হইবেই। তবে, এমন হইলে হইতে পারে যে, কোনো যোগসিদ্ধ পুরুষ দেবলোকনিবাসীদিগের ন্যায় পৃথিবীর সঙ্গ ছাড়িয়া নূতন এক সূক্ষ্মতর জগতের সহিত বন্ধুতা পাতাইয়া সেখান হইতে সূক্ষ্ম-শরীরের উপাদান এবং প্রাণ-মন-বুদ্ধির উপজীবিকা তলে, তলে সংগ্রহ করেন। তাহা যদি হয়, তবে সে-সমস্ত উপাদান এবং উপজীবিকা'র জন্য যোগী পুরুষ পৃথিবীর নিকটে ঋণী না হইলেও নূতন-এক-তরো সূক্ষ্ম অপার্থিব রাজ্যের নিকটে অবশ্য বলিতে হইবে ঋণী। মনে কর, যেন পূর্ব্বে আমি কলিকাতায় বাস করিতাম—এক্ষণে হিমাচলে বাস করিতেছি। এক্ষণে আমাকে কলিকাতার আইন মানিয়া চলিতে হইতেছে না—ইহা সত্য। কলিকাতার যেন আইন মানিয়া চলিতে হইতেছে না—হিমাচলের তো আইন মানিয়া চলিতে হইতেছে! তার সাক্ষী—কলিকাতায় আমি খালি-গায়ে থাকিতাম, এখানে আমি আমার গায়ে সাতপুরু কম্বল জড়াইয়াও সন্তুষ্ট নহি। তেমনি কোনো যোগী পুরুষ যদি পৃথিবীরাজ্য হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া আর-এক উচ্চ রাজ্যে ভর্ত্তি হন, তবে সেই নূতন রাজ্যের নিয়মাবলী অবশ্যই তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হইবে। প্রকৃত কথা যাহা, তাহা এই:—

এরূপ মহাপুরুষ কালে কালে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং করেনও, যাঁহারা আমাদের ন্যায় তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তির তুলনায় সিদ্ধপুরুষ। কিন্তু আমাদের তুলনায় সিদ্ধ-

পুরুষ স্বতন্ত্র, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সিদ্ধপুরুষ স্বতন্ত্র। প্রকৃত কথা এই যে, মনুষ্য সিদ্ধ-পুরুষ নহে—মনুষ্য সাধক পুরুষ। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, যোগসাধক যে-কোনো সিদ্ধি লাভ করিতে চেষ্টা করুন্ না কেন—সে সিদ্ধি পূর্ব্ব হইতেই আমাদের চক্ষের সম্মুখে অনেক কাল হইয়া বসিয়া আছে। তুমি আকাশে উড়িতে ইচ্ছা করিতেছ—পতঙ্গ-বিহঙ্গ অনেক কাল পূর্ব্ব হইতে আকাশে উড়িতেছে। তুমি ধোঁয়া-কলে জাহাজ চালাইতেছ -ধোঁয়া অপেক্ষা শতকোটিগুণ সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্ম বাষ্পযোগে জীব-শরীর অনেককাল হইতে পৃথিবীতে চলা-ফেরা করিতেছে। যে-কোনো বিষয়েই তুমি সিদ্ধির অল্প একরত্তি আভাস অনেক সাধ্য-সাধনায় উপার্জ্জন করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনেক পূর্ব্বে তাহা পূরামাত্রায় হইয়া বসিয়া আছে। তুমি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড—তোমার চতুর্দ্দিকে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ সিদ্ধি তাহার চিরন্তন সম্পত্তি—তোমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সিদ্ধি সবে-মাত্র আজিকের নূতন আম-দানি। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ সিদ্ধি তোমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সিদ্ধিকে অনেক কাল গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে। তুমি সাধন দ্বারা যত-কিছু শক্তি উপার্জ্জন করিতেছ, সমস্তই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে আসিয়াছে; আর, যত-যত-প্রকার সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করিতেছ—সমস্তেরই পরাকাষ্ঠা আদর্শ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অতএব এটা স্থির যে, প্রকৃত পক্ষে সিদ্ধপুরুষ একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য—যিনি নিখিল বিশ্ব-ভুবনের আদি-অন্ত-মধ্য সমস্ত লইয়া এক-আমি-আছি-রূপে চির-বিরাজমান। আমরা যখন বলি যে, আমি বহির্বস্তুর অধীন—আছি আছে'র অধীন—তখন তাহার অর্থই এই যে, আমি ঐশী শক্তির অধীন। "ভারতবর্ষ ইং-রাজসৈন্যের বশতাপন্ন" এ কথার অর্থই এই যে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডাধিপের বশতাপন্ন। এ আমি আছি একমাত্র অদ্বিতীয় আমি-আছি'র অধীন। কার্য্য-কারণ-হিসাবে অধীন; তত্রাচ, বস্তুগুণ-হিসাবে—জলের সহিত যেমন জলের ঐক্য, আছি'র সহিত তেমনি আছি'র ঐক্য রহিয়াছে; ঐক্য আছে বলিয়াই সমস্ত জগতের আদ্যন্তব্যাপী পরাকাষ্ঠা সত্যকে আমরা "আছে" না বলিয়া "আছি" বলি। তা ছাড়া, আমরা যে দীন-হীন-পরাধীন হইয়াও স্বাধীনতার গোঁ কিছুতেই ছাড়ি না—তাহার কারণই ঐ; কি? না, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বাত্মক চিরন্তন আছি'র সহিত অধীন জীবের এই কালাবচ্ছিন্ন আছি'র ঐক্য। কেন না সমস্ত লইয়া এক অদ্বিতীয় সত্য যিনি চির-বিরাজ-মান, তাঁহার বাহিরে দ্বিতীয় কিছুই নাই; সুতরাং তাঁহার শক্তি বাহিরের অন্য-কোনো-কিছুর শক্তি-দ্বারা প্রতিহত বা ব্যাহত হইতে পারে না—সুতরাং বাস্তবিক-হিসাবে তিনিই কেবল স্বাধীন। তবেই হইতেছে যে, কালাবচ্ছিন্ন সুতরাং পরাধীন এই যে আছি, এ আছি'র স্বাধীনতা অন্য-কোনো প্রকারেই সম্ভাবনীয় নহে—সওয়ায় চিরন্তন আছি'র সহিত ঐক্যের উপলব্ধি। আছি'র সহিত আছি'র ঐক্যই আমাদের একমাত্র স্বাধী-নতা——অস্ফুট ঐক্য অস্ফুট স্বাধীনতা, পরিস্ফুট ঐক্য পরিস্ফুট স্বাধীনতা। বিষয়টি অতীব গুরুতর এবং গভীর। স্থান-সংক্ষেপের বাধ্যবাধকতায় শেষের কথা-গুলি সাঁটে-সোঁটে ইঙ্গিত-ইষারায় অতীব সংক্ষেপে বলা হইল—বারান্তরে তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়া বলিতে চেষ্টা করা যাইবে।

চিন্তার প্রভাব

আমরা যে দুর্ব্বল তাহা পদে পদে অনুভব করিতেছি। বাহ্য জগতের যে সকল শক্তির মধ্যে আমরা বাস করিতেছি তাহাদের প্রত্যেকেই ন্যূনাধিক পরিমাণে নিয়তই আমাদের দুর্ব্বলতা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যদিও বর্ত্তমান কালে মনুষ্য বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া তাড়িত, বাষ্প প্রভৃতি শক্তি সকলকে নিজবশে আনিয়া অনেক কার্য্য করাইয়া লইতেছে, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ও অশনিপাত হইতে রক্ষা পাইতেছে, বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিয়া তরঙ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্র পার হইতেছে, দেশ কালের দূরত্বকে হ্রাস করিতেছে, দশ দিনের পথ ২। ৪ ঘণ্টায় ভ্রমণ করিতেছে, অথচ পদে পদে দেখিতেছি এই বশীভূত শক্তি সকলই আমাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিতেছে।

বাহ্য জগতে যেরূপ,আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ। আমরা কত কার্য্য করিব মনে করি কিন্তু কার্য্য অল্পই করিতে সক্ষম হই। আমাদের সৎ ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা কয়টী পূর্ণ হয়। কতবারই উঠিতেছি কতবারই পড়িতেছি।

আমাদের যখন এই দশা তখন ঈশ্বর লাভ কিরূপে হইবে? ঋষিরা যে বলিয়াছেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" তখন আমরা যাই কোথায়।

তিনি আমাদের দুর্ব্বলতা জানেন, আমাদিগকে সবল করিবার ব্যবস্থা এই জগতে রহিয়াছে। তাহারই মঙ্গল বিধানে অসহায় শিশু ক্রমশ বল সঞ্চয় করিয়া স্বাধীন হইতেছে। মানুষকে তিনি চিন্তাশক্তি ও ধর্ম্মভাব দিয়াই অপর প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, বিশেষ করিয়াছেন। আমরা ঐ শক্তি যদি যথাযথ চালনা করি তাহা হইলে বল লাভ করিতে পারি এবং তাঁহাকে পাইতে পারি। আমরা বাহ্য জগতের উপর যে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছি তাহা এই চিন্তাশক্তিরই প্রভাবেই করিয়াছি। আর আমাদের দেশের আর্য্য ঋষিরা ধ্যানযোগেই সেই পরমেশ্বরের সন্নিকটস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইহারই প্রভাবে আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করিতেন। তাই বলি চিন্তাই যথার্থ শক্তি। পুরাতন প্রবাদে বলে "জ্ঞানই শক্তি" কিন্তু জ্ঞান আর কিছুই নয় চিন্তারই সার সংগ্রহ। পূর্ব্বকালে জলীয় বাষ্প মেঘ হইতে মেঘে সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া ক্রিয়া করিত। কোনরূপেই তাহার গতি রোধ হইত না। জলের শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিত। বাস্তবিক মনুষ্যের নিকট উহার কোন শক্তিই ছিল না। কিন্তু চিন্তা যেমন তাহার মোহিনী শক্তির দ্বারা উহাকে স্পর্শ করিল অমনি বাষ্পীয় পোত বাষ্পীয় জলে চারিদিকে দ্রুতবেগে গমনাগমন করিতে লাগিল। কত মাকু ধাবিত হইয়া নিমেষের মধ্যে কত বস্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল। এই বাষ্পের শক্তি মনুষ্য নিজ কার্য্যে লাগাইয়া জগৎকে কত ধনী করিয়াছে। মনুষ্য নিজ শক্তিতে অতি অল্প কার্য্যই করিতে পারে কিন্তু ইহার সাহায্যে কত গুরুভার ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছে। মনুষ্যের চক্ষু অতি অল্প দূরই দেখিতে পায় কিন্তু তাহার চিন্তা দূরবীক্ষণ আবিষ্কার করিয়া আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেখিয়া থাকে। মনুষ্য চন্দ্র সূর্য্যের মধ্যে যে সকল পদার্থ আছে তাহা গণনা করিতেছে এবং অপর কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্য আবিষ্কার করিতেছে। এইরূপে

আমরা দেখিতেছি চিন্তার মূল্য নাই ইহা অমূল্য পদার্থ। যদি কোন বস্তুর উপকারিতা দেখিয়া তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয় তাহা হইলে চিন্তারও মূল্য তাহার নানা উপকারিতা দেখিয়া স্থির করা যাইতে পারে। দয়ালু ধনী ব্যক্তিরা যে সমাজে বাস করে তাহার স্থায়ী উপকার সাধিত হয়। কিন্তু চিন্তাই সকল ধনের আকর। চিন্তাই বিজ্ঞানের মূল। উহা হইতে নানা প্রকার শিল্প কৌশল কলকারখানার সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহারা জনসমাজে ধনের আকর। চিন্তার আবিষ্কার শক্তি ও নির্ব্বাচন শক্তির সহিত তুলনায় স্বর্ণের আকর তুচ্ছ। পর্ব্বতগুহায় মূল্যবান প্রস্তর বা ধাতু রহিয়াছে কেবল হস্তের দ্বারা তাহা খনন করিয়া কি উদ্ধার করা যায়? আমাদের পদতলে কুবেরের ধন সঞ্চিত থাকিতে পারে কিন্তু চিন্তা আমাদের হস্তে উহার খননোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র প্রদান না করিলে আমরা কিছুই করিতে পারি না। চিন্তাশক্তির সাহায্য ভিন্ন সুন্দর শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা রাজপ্রাসাদ চিত্রশালা প্রভৃতি নগর সকল উৎপন্ন হইতে পারে না। চিন্তাই স্বর্ণ প্রভৃতি নানা প্রকার ধাতুকে অলঙ্কার মুদ্রা ও নানা প্রকার গৃহসামগ্রীতে পরিণত করে। আমাদের শ্রমজাত প্রত্যেক দ্রব্যতেই আমাদের চিন্তার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঘটিকাযন্ত্রের বিষয় একবার চিন্তা করিলে ইহার কত কৌশল দেখিতে পাই। ইহার আবিষ্কারে জনসমাজের বিশেষ উপকার হইয়াছে। আজ যদি সভ্যজগতে ইহার অভাব হয় আমরা পুনরায় অনেক শতাব্দীর পশ্চাতের অন্ধকার অসভ্যতায় পতিত হইব। বাস্তবিক এই যে ক্ষুদ্র যন্ত্র যাহা আমরা অক্লেশে আমাদের বস্ত্রমধ্যে লইয়া যাই ইহার আবিষ্কারে মনুষ্যকে যেন শত শত বৎসরের অন্ধকার হইতে আলোকের রাজ্যে আনিয়াছে। ইহার আবির্ভাবে কত প্রখর বুদ্ধি ও তেজস্বী প্রতিভা বিকশিত হইয়াছে। মনুষ্য চিন্তা-উদ্ভূত এই যে ক্ষুদ্র যন্ত্র ইহার আশ্চর্য্য প্রভাব। এই পৃথিবী ৫০ কোটি মাইল ভ্রমণ করিয়া যে সময়ে তাহার নিজ স্থানে আসিবে তাহার এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য না করিয়া ইহা বলিয়া দেয়। জড় পদার্থ হইয়াও ইহার কার্য্য বুদ্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন মনুষ্যের ন্যায়। ইহার কার্য্য অতীব বিস্ময়জনক। মনুষ্য কয়েকটা পিতলের চাকাকে ও কয়েকখণ্ড স্থিতিস্থাপক ইস্পাতকে এইরূপ গণনা করিতে শিক্ষা দিয়াছে। ইহাকে যেন একরূপ প্রাণে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ইহাতেই সে দ্রুতগামী সময়কে আশ্চর্য্য রূপে পরিমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তার হস্ত ও মন যখন নিদ্রায় অভিভূত থাকে তখনও ইহা চলিতেছে ও প্রহরীর ন্যায় কার্য্য করিতেছে। তিনি মরিলেও ইহার কার্য্যের বিরাম নাই। ইহা তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন গ্যালিলিওর মস্তিষ্কের চিন্তারশ্মির ফল। কোন রাজধানীর ভজনালয়ে একদিন তিনি দণ্ডায়মান হইয়া উপরে একটী আলোক জ্বলিতে দেখিলেন উহা বায়ুভরে ইতস্ততঃ দুলিতেছিল। ইহা কোন আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। পূর্ব্বে ইহা অনেক লোকে দেখিয়াছে কিন্তু কেবল তাঁহারই উর্ব্বর মস্তিষ্ক ইহা হইতে একটী ভাব সংগ্রহ করিয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল এবং অবশেষে তিনি সময় পরিমাণ ও নিরূপণ যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। ইহাই তাঁহার চিন্তার গৌরব। নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার কালে একটী আপেল পতিত হওয়ায় কত সাহায্য পাইয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। তৎ-

কালীন লণ্ডনে প্লেগবশত গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া পল্লিগ্রামে বাস করিতে ছিলেন। তাঁহার পুস্তকাগার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল সুতরাং নির্জ্জন স্থানে বেড়াইয়া কেবল চিন্তাশক্তির চালনার দ্বারা সুখ-সম্ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই-রূপ প্রখর চিন্তা আপেলপাতকে উপলক্ষ করিয়া মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করিল। সেইরূপ ফ্র্যাঙ্কলিন একটী বালকের ঘুড়ি উড়ান দেখিতে দেখিতে বিদ্যুৎ ও তড়িৎ যে এক পদার্থ তাহা ঠিক করিয়াছিলেন। পরে তিনি স্বয়ং একটী ঘুড়ি রচনা করিয়া শোণের সুতা দিয়া বিদ্যুল্লোকিত মেঘের রাজ্যে ছাড়িয়া দেন, ঐ সুতার দ্বারা তাড়িত প্রবাহিত হয়। তিনি তাঁহার বদ্ধমুষ্টি উহাতে প্রয়োগ করেন তাহাতেই তাড়িতের স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পান।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৪, চৈত্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪২৮॥/৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৪১ ৵৬
সমষ্টি	...	৯৬৯৸০
ব্যয়	...	৩২০।৵৬
স্থিত	...	৬৪৯।/৬

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত

আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন

এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

১৪৯।/৬

৬৪৯।/৬

আয়

ব্রাহ্মসমাজ ১৮৯৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র

৫৲

১৮৯৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪৪৵০
পুস্তকালয়	...	১৪ /৬
যন্ত্রালয়	...	১৭৩।০
গচ্ছিত	...	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	৭॥৵০
	...	৪২৮॥/৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	২৬০ /৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৪১৲
পুস্তকালয়	৪৸৶০
যন্ত্রালয়	১৪।/৯
সমষ্টি	৩২০।৵৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি ধনরক্ষক।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদক।

Sermons of Maharshi Debendranath Tagore.

(Translated from Bengalee.)

SERMON XLIII.

God's Mercy Towards Man.

In undertaking the task of proclaim- the ingglory of God who is all-good and sweet as nectar, I know not where to begin and where to end. There is no beginning and there is no end to His glory. He is above, He is below, He is in the north, He is in the south, He is in the east, He is in the west. The past, the present, the future are in the palm of His hand. All events come to pass at His beck. How shall I proclaim His glory, for He is without a beginning and without an end? He exists in the fulness of His glory. "স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা।" "All that is knowable He knoweth, but He has no knower." He has endowed us with life and sent us into this world and adorned our soul with righteousness, knowledge, and love, only for our good and for our happiness. How are we to fulfill the object for which we have been blessed with righteousness, knowledge and love? There is only one way to such fulfilment. If we can only perceive God, we shall attain such fulfilment. If we fail to perceive Him, neither does the righteousness in us enable us to perform the works He loveth, nor does love attain its fruition. Actuated by love has God brought us into existence from the state of non-existence. We were but nought, and He the Lord has createdus out of dust and bestowed on us the ornaments of righteousness, love and knowledge. May we really adorn ourselves with these ornaments! May we perceive Him by that knowledge, may we worship Him with that love, and may we fulfill His commandments that are so dear to Him by the help of that righteousness! The God whom we should perceive, love and obey is brightly manifested everywhere; He is as fire, He is pervaded with knowledge and is the Lord of all. He reveals Himself everywhere as joy itself and immortality itself. If that Sun of Love rises in the firmament of our heart even for a while, then "সকলং হস্ততলং" "all comes within the palm of our hand," that is, we become the possessor of all that is really covetable. "প্রেমসূর্য্যোযদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে সকলং হস্ততলং।" If we can but keep Him in our heart for a brief space of time with all the desire it is capable of, prosperity, adversity and everything else appear to be of trifling interest to us. It matters but little if decline comes upon us after we have grasped in our heart that Being who is the very perfection of knowledge and tasted His love even for a while. Let the eyes lose their power of vision, let the body decay, after we have once beheld God. Such mishaps would not then matter much. We shall then feel happy in the consciousness that though confined in this body that has no intrinsic and lasting worth, we had seen the Most High though for a short time. Further, when we realize that released from the body the soul will eternally revel in God, then our head bends down under the heavy weight of our gratitude to Him. What can I say of the infiite mercy of the Lord? Yesterday

we did wander about mourning, and to-day has God mercifully called us to this sacred temple. Yesterday we knew nothing of the joy of holiness that was in store for us to-day. Yesterday, perplexed by the tumult of worldly affairs the body, the mind and the soul were sore depressed and we were as like the dead, but to-day, hearing His sweet call have we congregated together here. While in the midst of this congregation, what a wondrously bright manifestation of His presence do we behold! "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং আশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ। আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।" Wonderstruck some behold Him, wonderstruck some speak of Him, wonderstruck some hear His voice ; but though they thus behold Him, speak of Him, and hear His voice, none knoweth Him. Perceive here the manifestation of the gleams of the joy of that wondrous Being. Behold how his motherly gaze is now fixed upon our eyes as we look up to Him. Realize how by slow degrees is He drawing our hearts nearer and nearer unto Him, and how is He sanctifying our souls! Have we not by coming to this temple of worship now gained more than we had hoped for ? Has not this fine morning begun to look finer because of our perception of His presence all around us at this time ? Have we not gathered here sufficient material for divine worship—the material of love and reverence ? Ye have now beheld Him here in your midst, for He has appeared here to accept our worship; let us then all render our lives blessed at this very moment by worshipping him with the offering of our heart's loving reverence. If we can feel so highly blessed on earth by His worship in this prayer-hall, how can it be possible for us to know any thing of the beatitude that awaits us in Heaven, the abode of absolute bliss, the Lord's kingdom of perfect goodness ? Who knows what treasures of bliss will the Divine Mother lavish upon us after She has gathered us in her immortal abode.

O Spirit Supreme, how can I describe Thy glory ? In describing it I do not know where to begin and where to end. I can not dive into Thy beginning nor command any conception of Thy end. But the nearer I approach the end of my days on this earth the more I feel Thee to awaken in my soul. My hair once dark has now grown white, the lustre of my eyes has dimmed, my body is daily growing more and more feeble, but Thy mercy knows no decline. At this very moment Thy mercy makes its way into my inner being and invigorates my soul with fresh strength and vivacity. O Thou who art merciful lead me to Thy abode of bliss. I now yearn for nothing but Thee. Here I am keenly reproved by praise and blame, by the sorrows of life and by the pang caused by separation from those whom I held dear to my heart. Thou art my Protector. Thou bearest the burden of the whole universe, and wilt Thou not bear the burden of this little heart of mine. Thou art my hope and encouragement. When Thou art near me, misery can not approach me nor any danger can assail me, but when Thou art away, even the thorny point of the little Kusha grass turns mighty enough to deal as hard blows to me as the heavy iron goad does to the elephant in the hands of its driver. O Supreme Spirit, sorely afflicted by the tumult of the world caused by the infatuation it exercises on all men, I come to Thee and seek Thy shelter ; do Thou make me worthy of thy Abode of Bliss.
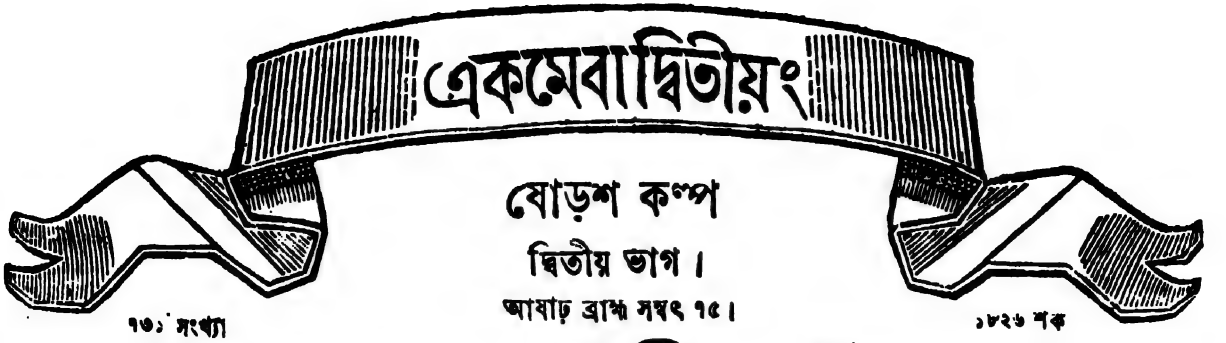
ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীমন্মহর্ষিদেবের জন্মোৎসব।

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষিদেবের অষ্টাশীতি বৎসরের জন্মোৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ উৎসব উপলক্ষ্যে তিন সমাজের ব্রাহ্মেরা উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহর্ষিদেবের গৃহপ্রাঙ্গণ লোকে পরিপূর্ণ হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়া উপাসনা করেন। উপাসনান্তে তিনি যে বক্তৃতা করেন আগামী মাসে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। তাঁহার পর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় যে বক্তৃতা পাঠ করেন নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

"আমাদের সম্মুখে মহর্ষির মহজ্জীবন, এবং মহৎ কীর্ত্তি, আমরা তাঁহার উত্তরাধিকারা ভাবী বংশ; তাঁহার সাধু গুণ গ্রহণ ব্যতীত এ সকল পবিত্র কীর্ত্তি এবং স্বর্গীয় সম্পত্তি কার সাধ্য সম্ভোগ বা রক্ষা করিতে পারে? এস ভ্রাতৃগণ, আজ আমরা প্রাণ ভরিয়া মহর্ষির চরিত্রসুধা পান করি, আর ব্রহ্মগুণ গান করি।

বিগত দুই বৎসর কাল যাবৎ আমাদের ভক্তিভাজন ধর্ম্মপিতা মহর্ষি বহুল রোগ-যন্ত্রণা, এমন কি, আসন্ন মৃত্যুর ভিতর দিয়া এক্ষণে অষ্টাশী বর্ষ বয়সে উপনীত হইলেন। আমাদের পরমানন্দের বিষয় যে ভগ্ন জীর্ণ দেহস্থিত এই মহান্ আত্মার শুভ জন্ম দিনে আমরা পুনরায় পবিত্র ঈশ্বরের নামে সকলে মিলিত হইতে পারিলাম। সাধু মহাজনগণের সহিত সাধকবংশের সম্বন্ধ যদিও দেশ কালের অতীত, মুমুক্ষু আত্মার অন্ন পানস্বরূপ ভগবৎ-প্রসাদের তাঁহারা পরিবেশক, নিত্যকালের চরিত্রাদর্শ, পথপ্রদর্শক এবং অমরাশ্রয়; তথাপি তাঁহাদের দৈহিক জীবনের জন্ম কর্ম্ম চিরস্মরণীয় এবং প্রধান অবলম্বন হইয়া আমাদিগকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। তাই আজ দয়াময় পরমেশ্বরের বিশেষ কৃপার দানস্বরূপ মহর্ষিজীবনের জন্ম দিবসে কৃতজ্ঞতা ভক্তি সহকারে আমরা ভগবান্ ও তাঁহার এই প্রিয় ভক্তের গুণ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রের দেবগুণরাশি আত্মস্থ করিবার জন্যই এ আয়োজন, সামাজিক ভাবে লৌকিক নিয়মের অনুসরণ কেবল মাত্র আমাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। এ

জীবনে পরম দেবের দেবাবির্ভাব এবং দেবক্রিয়া কি প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে তাহা আলোচনা ধ্যান চিন্তা করিয়া আমরা যেন আধ্যাত্মিক যোগ জীবনে সকলে জীবিত হইতে পারি, দয়াময় ঈশ্বর আমাদের এ বিষয়ে সহায়তা বিধান করুন।

এত দিন পরে আমরা মহর্ষিজীবনের বিকাশ প্রণালীর বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বয়ং ভগবানের হাতের গড়া এই দিব্যদেহধারী মহাত্মার আদ্যোপান্ত চরিত্র-কাহিনী যতই আমরা অধ্যয়ন করি ততই দেখি বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! তিনি কেবল তাঁহাকে কৃতার্থ এবং জীবন্মুক্ত করিবার জন্য নহে, কিন্তু পৌত্তলিক ভারতের অন্ধবিশ্বাসী, অল্পবিশ্বাসী পতিত আর্য্যসন্তানদিগকে চিন্ময় পরব্রহ্মের উপাসনা শিক্ষা দিবার জন্যই যে স্বহস্তে এ জীবন রচনা করিয়াছেন এখন বিশেষ রূপে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। অতএব মহর্ষিদেবের দেবগুণগ্রাম যদি আমরা হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া লইতে পারি তাহা হইলেই অদ্যকার দিনের সার্থকতা হইবে।

সাধারণতঃ দুঃখ দারিদ্র্য অভাবের পীড়নেই লোকের মনে ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, আবার তদ্বিপরীত অবস্থা ঘটিলে ধর্ম্মকর্ম্মে তাহারা জলাঞ্জলি দিয়া বসে। অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু সে শ্রেণীর লোক নহেন। তিনি বলিতেছেন,—"আমি কিন্তু প্রথমে কাহারো মুখে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিবার কোন সুযোগই প্রাপ্ত হই নাই। আমার চারিদিকে কেবল বিলাসের ও আমোদের অনুকূল বায়ু অহর্নিশি প্রবাহিত হইতেছিল। এই প্রতিকূল অবস্থাতেও ঈশ্বর আপনি দয়া করিয়া আমার মনে বৈরাগ্য দিলেন। সেই আনন্দময় স্বীয় আনন্দের ধারা আমার মনে বর্ষণ করিয়া আমাকে নূতন জীবন প্রদান করিলেন। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পিতা।"

(দিব্যজ্ঞান।)

সহজ জ্ঞানে সরল হৃদয়ে কেমন তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব শিখিয়াছিলেন তাহা এইরূপ বর্ণিত আছে। "আমি য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিস্তর পড়িয়াছিলাম; এত করিয়াও মনের যে অভাব তাহা কিছুতেই ঘুচাইতে পারিলাম না। ভাবিলাম প্রকৃতির অধীনতাই কি সর্ব্বস্ব? তবে তো গিয়াছি। কিন্তু এক জন নাস্তিকের নিকট এই টুকুই যথেষ্ট। আমার চেষ্টা ঈশ্বরকে পাইবার জন্য। তাহা না পাইয়া আমার ব্যাকুলতা দিন দিন আরো বাড়িতে লাগিল। এক একবার ভাবিতাম, আর বাঁচিব না।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার অন্তরে বিদ্যুতের ন্যায় একটা আলোক চমকিত হইল। দর্শন স্পর্শন আঘ্রাণ ও মননের সহিত "আমি" যে দ্রষ্টা স্প্রষ্টা ঘ্রাতা ও মন্তা এ জ্ঞানও জন্মিল। এই জ্ঞান লাভের পর বলিতেছেন, "অনেক অনুসন্ধানে এই আলোক টুকু পাই। যেন ঘোর অন্ধকারাবৃত স্থানে সূর্য্যকিরণের একটী রেখা আসিয়া পড়িল। যখনই আমি বুঝিলাম যে ঈশ্বরের শরীর নাই, তখন হইতে আমার পৌত্তলিকতার উপর ভারি বিদ্বেষ জন্মিল। রামমোহন রায়কে স্মরণ হইল। তাঁহার অনুগামী হইবার জন্য প্রাণ মন সমর্পণ করিলাম। আমার ভাইদের লইয়া একটা দল বাঁধিলাম। যখন বিদ্যাবাগীশের মুখ হইতে "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" ইহার অর্থ বুঝিলাম, তখন স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া আমাকে অভিষিক্ত করিল। আহা কি কথাই শুনিলাম!—তিনি আপনাকেই দান করিয়াছেন। সেই পরমধনকে উপভোগ কর।"

বহুল শাস্ত্র পাঠ, প্রার্থনা, ধ্যান, চিন্তার পর সারসত্য লাভ করত তিনি বলিতেছেন ;—"সাধকদিগকে এই তিন স্থানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে। অন্তরে তাঁহাকে দেখিবেন, বাহিরে তাঁহাকে দেখিবেন এবং আপনাতে আপনি যে আছেন সেই ব্রহ্মপুরে তাঁহাকে দেখিবেন।" কি বিশদ, কি সূক্ষ্ম তাঁহার ব্রহ্মধারণা! জীবাত্মার মুক্তির লক্ষণ এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—"যখন সে আপ্তকাম আত্মকাম হয়, ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ থাকিয়া, সহিষ্ণু হইয়া তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্মকার্য্য সাধন করিতে থাকে, তখন দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মের প্রেমসিক্ত ক্রোড়ে সে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।"

ব্রাহ্মধর্ম্মকে আধ্যাত্মিক, পারিবারিক এবং সামাজিক নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া ও তাবৎ বিষয়ের উপযোগী করিবার জন্য মহর্ষির বুদ্ধিমত্তা এবং অধ্যবসায়ও যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। "তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।" এই দুইটী বাক্যে এ ধর্ম্মের সারভূত তত্ত্ব তিনি নিহিত করিয়া দিয়াছেন। আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সার্ব্বভৌমিক মূল বিশ্বাস ইহার পত্তনভূমি, পরিশেষে ইহাই তাঁহার দিব্যজ্ঞানে প্রতিভাত হইয়াছিল।

একদা প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইহাঁকে বলেন, "আচ্ছা ঈশ্বর যে আছেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেও দেখি?" তদুত্তরে মহর্ষি বলিলেন, "ঐ দেওয়ালটা যে ওখানে আছে আপনি আমাকে বুঝাইয়া দেন দেখি?" তাহাতে তিনি হাস্য করায় মহর্ষি পুনরায় বলিলেন, "এই দেওয়াল হইতেও ঈশ্বর আমার নিকটের বস্তু। তিনি আমার অন্তরে আছেন, আমার আত্মাতে আছেন। ঈশ্বর যে এই সর্ব্বত্র রহিয়াছেন আমি দেখিতেছি, ইহা আর আমি বুঝাইব কি?" দিব্যজ্ঞানে, দিব্য চক্ষে এই যে সহজ ব্রহ্মদর্শন, এইটী মহর্ষির মহত্ত্বের নিদান। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অপরোক্ষ ভাবে হৃদয়বাসী পরমাত্মা হইতে সার্ব্বভৌমিক সারসত্য সকল তাঁহার অন্তরে সমাগত হয়। উপনিষদের যেখানে যেখানে তিনি তাঁহার অন্তরস্থ সত্যের সায় পাইয়াছেন তদ্দারা বিশ্বাসের দৃঢ়তা সাধন করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার এই ভক্তি-প্রবণ জ্ঞানপ্রতিভা পরিত্রাণার্থী সাধকদিগের সকল সংশয় দূর করিয়া দিয়াছে।

(উপাসনা ও দর্শন শ্রবণ।)

একদিকে অদ্বৈতবাদ ও পৌত্তলিকতায় অবিশ্বাস, অপর দিকে ব্রহ্মোপাসনায় ভক্তি বিশ্বাস ও উপনিষদে তাহার প্রমাণ প্রাপ্তি। বেদবেদান্ত পড়িয়া কত লোক পণ্ডিত হইয়াছেন, কিন্তু উপনিষদের ঋষিগণের ভাবে ভাব মিলাইয়া, তাঁহাদের সঙ্গে একাত্মা হইয়া এরূপে ব্রহ্মসম্ভোগ এ যুগে কয়জন করিতে পারিয়াছেন? এমন সারগ্রাহী মধুপ আমরা অল্পই দেখিতে পাই। অপর এক স্থানে মহর্ষি বলিয়াছেন,—"তাঁহাকে উপাসনা করিয়া তাহার ফল আমি তাঁহাকে পাই। তিনি আমার প্রভু, আমি তাঁহার ভৃত্য, তিনি পিতা, আমি পুত্র। এই ভাবই আমার নেতা।" প্রচলিত উপাসনাপ্রণালীর মূলমন্ত্র "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্" তিনিই উপনিষদ্‌সিন্ধু হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা ব্রাহ্মমাত্রেরই এখন সাধনমন্ত্র। পরে নিজরচিত একটী প্রার্থনা উপাসনা পদ্ধতিতে তিনি সংলগ্ন করিয়া দেন। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার অন্তরে এইরূপ ভাবোদয় হয়, "কখন্ আমি আমার উপাস্য দেবতাকে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে

দণ্ডায়মান হইব, কখন্ আমার হৃদয়ের ভক্তি-উপহার দিয়া তাঁহাকে পূজা করিব; জলাভাবে পিপাসার ন্যায় এই বলবতী স্পৃহা আমাকে কঠিন দুঃখ দিতেছিল।” তাহার পর বলিতেছেন, “এখন আমার সেই স্পৃহা পূর্ণ হইল, সব দুঃখ দূর হইল। আমি আমার সেই প্রাণদাতা উপাস্য দেবতাকে পাইলাম এবং নির্জ্জনে সজনে তাঁহার উপাসনা করিয়া পবিত্র হইলাম। আমি তো এতটা পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু তিনি আরো দিতে চাহেন।—আমি সম্যকরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য প্রতিদিনই অভুক্ত অবস্থায় অতন্দ্রিত ও সংযত হইয়া গায়ত্রী দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে “ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ” আমার সমস্ত হৃদয়ে মিশিয়া গেল।—এই অবধি আমি তাঁহার আদেশ শুনিবার শিক্ষা করিতে লাগিলাম। যাহা আমার প্রবৃত্তির কুটিল মন্ত্রণা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল তাহা পরিত্যাগ করিতে সযত্ন হইলাম এবং তাঁহার আদেশ বলিয়া আমার ধর্ম্মবুদ্ধিতে যাহা প্রতিভাত হইতে লাগিল তাহাতে আপনাকে নিয়োগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তখন আমি তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম,—ধর্ম্মবল প্রেরণ কর—ধৈর্য্য দেও—বীর্য্য দেও—তিতিক্ষা সন্তোষ দেও। তিনি আমার হৃদয়ে আসীন হইয়া চালাইতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম।” ঈশ্বরাদেশ শ্রবণের ইহা একটী জীবন্ত দৃষ্টান্ত। আবার বলিতেছেন,—“যখনি নির্জ্জনে অন্ধকারে তাঁহার আদেশের বিপরীত কোন কর্ম্ম করিতাম, তখনই তাঁহার “মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং” রুদ্রমুখ দেখিতাম, সকল শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইত। আবার যখনি কোন সাধু কর্ম্ম গোপনে করিতাম, প্রকাশ্যে তিনি তাহার পুরস্কার দিতেন। তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিতাম, সমুদায় হৃদয় পুণ্যসলিলে পবিত্র হইত। দণ্ডেতেও তাঁহার স্নেহ দেখিতাম।—তাঁহাকে না পাইয়া আমার যে তৃষ্ণা ছিল, এখন তাঁহাকে পাইয়া তাহা শত গুণ বাড়িল। যে ছেলে যত খায় সে ছেলে তত লালায়।” এই ভাব অনুভবের পর বলিতেছেন,—“হে নাথ! দর্শন পাইয়াছি, তুমি জাজ্বল্য হইয়া আরো আমাকে দর্শন দাও। আমি তোমার বাণী শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, তোমার আরো মধুর বাণী শুনাও।”

(প্রচার স্পৃহা।)

সত্য লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা প্রচারের জন্য ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন,—“যখন উপনিষদে সত্যের আলোক পাইয়া আমার জ্ঞান ক্রমে উজ্জ্বল হইতে লাগিল, তখন এই সত্যধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আমার প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। আমাদের বাড়ীর পুষ্করিণীর ধারে একটী ছোট কুঠরী পরিষ্কার করিয়া লইলাম। এ দিকে দুর্গা-পূজার কল্প আরম্ভ হইল। আমাদের বাটীর আর সকলে এই উৎসবে মাতিলেন। আমরা কি শূন্য হৃদয়ে থাকিব? আত্মীয় বন্ধুবান্ধব এবং ভ্রাতাদিগকে লইয়া একটী সভা স্থাপন করিলাম। সকলে প্রাতঃস্নান করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া পরিষ্কৃত কুঠরীতে আসিয়া বসিলাম। অমনি যেন শ্রদ্ধা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। সকলের মুখেই শ্রদ্ধার রেখা। আমি ভক্তিভাবে ঈশ্বরকে আহ্বান করিয়া কঠোপনিষদের শ্লোক ব্যাখ্যা করিলাম। এই আমার প্রথম ব্যাখ্যান। যখন আমরা ব্রাহ্মসমাজ অধিকার করিলাম তখন চিন্তা হইল, সমাজে অধিক লোক কি করিয়া আসে। ক্রমে আমাদের যত্নে ঈশ্বরের প্রসাদে লোক

বাড়িতে লাগিল। কোন কার্য্যই বিধিপূর্ব্বক না করিলে তাহার কোন ফল হয় না। যাহাতে পৌত্তলিকতার পরিবর্ত্তে ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত হয় তাহার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের একটী প্রতিজ্ঞা-পত্র রচনা করিলাম। ১৭৬৭ শকের পৌষ মাসের মধ্যে ৫০০ জন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম হইলেন। তখন ব্রাহ্মের সহিত ব্রাহ্মের আশ্চর্য্য হৃদয়ের মিল ছিল।" এই মিলনভূমি যে মহর্ষির প্রশস্ত হৃদয় তাহা সহজেই আমরা বুঝিতে পারি। ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধির জন্য ৬৭ শকের ৭ই পৌষে পল্‌তার পরপারে গোরিটীর বাগানে ব্রাহ্মসম্মিলনের তিনি একটী মেলা করেন। তথায় সকলকে লইয়া উপাসনানন্দ এবং ভ্রাতৃপ্রেম উপভোগ করিয়াছিলেন। অতঃপর প্রথমেই তাঁহার মনে হইল,—"যদি বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি তবে সমুদায় ভারতের ধর্ম্ম এক হইবে।" ইহার পর বলিতেছেন,—"আমার বেদ জানিবার জন্য বড়ই আগ্রহ হইল। কাশীতে বেদশিক্ষার জন্য ছাত্র পাঠাইতে আমি মানস করিলাম।"

স্বয়ং এই সময় কাশীতে গিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তথাকার পণ্ডিতদিগের মুখে মহর্ষি বেদের ব্যাখ্যা এবং সামগান শুনিয়াছিলেন। পরে বিশুদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র রচনার জন্য বহু পরিশ্রমে পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সকল তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরপ্রেরিত দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে তাহার সত্য গ্রহণপূর্ব্বক ভ্রমাংশ পরিহার করিয়াছেন। ইহাঁকে এক হিসাবে উপনিষদ্ধর্ম্মের সংস্কর্ত্তাও বলা যাইতে পারে। তথাপি ঋষিবাক্যে তাঁহার কি অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা! বেদবেদান্তের আধ্যাত্মিক সার মর্ম্ম তিনি যেমন আস্বাদ করিয়া থাকেন এমন অল্প লোকেই পারে। ঋষিবাক্য সংস্কৃত শ্লোক ও স্তোত্র পাঠের সময় তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠে। উপনিষদ্ যে এমন সারগর্ভ ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণ তাহা পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে কে জানিত?

(নীতিসাধন।)

পিতার আদেশ সত্ত্বেও বেলগাছিয়ার বাগানে বাইনাচ মদ্যপান ইত্যাদি অপবিত্র আমোদে যোগ না দিয়া "তত্ত্ববোধিনী" সভার কার্য্যে তিনি নিযুক্ত থাকেন, পর্ব্বতবাসের সময় ভর্জ্জির রাণার গৃহে মদ্যমিশ্র ভোজে আহার করেন নাই, ইহা দ্বারা আমরা মহর্ষির নৈতিক নিষ্ঠার পরিচয় পাই। দান-ধর্ম্মের ত কতই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। সৌজন্য ভদ্রতা বিষয়েও দৃষ্টান্তস্থল।

(সত্যনিষ্ঠা।)

যখন ইনি ঈশ্বরাদেশে নীত হইয়া যাহা সত্য বুঝিয়াছেন তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিয়া মিথ্যা ভ্রান্তি বর্জ্জন করিয়াছেন। এক স্থানে বলিতেছেন,—"ব্রাহ্মসমাজে দেখিলাম যে, একটী নিভৃত গৃহে শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদ পাঠ হইত। যখন ট্রষ্টডীডেতে আছে যে, সকল জাতিই নির্ব্বিশেষে একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিবে তখন কার্য্যে ইহার বিপরীত দেখিয়া আমার মনে বড় আঘাত লাগিল। আমি প্রকাশ্যে বেদ পাঠের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম।" তদনন্তর বেদ অভ্রান্ত নয় যখন বুঝিলেন, তখন বলিলেন,—"কর্ম্মকাণ্ডপোষক যে বেদ তাহা দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা প্রচারের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল। এখন আমরা বেদসন্ন্যাসী গৃহস্থ হইলাম।" সত্যপ্রাণ সত্যপ্রিয় হইয়া অপূর্ব্ব ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার সুমধুর ব্যাখ্যান গুলি যেন তাঁহার আধ্যাত্মিক ধর্ম্মজীবনের এক খানি সুন্দর প্রেমচ্ছবি।

(পরীক্ষায় অটল)

একদা বিদেশে সপরিবারে জলপথ ভ্রমণকালে যখন ঘোর তুফানে পতিত হন, ঠিক্ সেই সময় পিতৃবিয়োগ সংবাদ পাইলেন। তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—পিতৃবিয়োগে পুত্রের যেরূপ কঠোর তপস্যা পালন করিতে হয় তাহা আমি সমুদায় করিয়া ছিলাম। আমার ছোট কাকা রমানাথ ঠাকুর সতর্ক করিয়া দিলেন, 'দেখো! ব্রহ্ম, ব্রহ্ম করে এ সময় কোন গোলমাল তুলিও না। দাদার বড় নাম!" এই সময় রাজা রাধাকান্ত দেবের সঙ্গেও দেখা করিতে যান। "তিনিও বন্ধু ভাবে পরামর্শ দিলেন, শাস্ত্রে যেমন যেমন বিধান আছে সেই অনুসারে শ্রাদ্ধটী করিও।" তাঁহাকে মহর্ষি বিনয়ের সহিত বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত লইয়াছি, সে ব্রতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে পারিব না।" অন্যত্র বর্ণিত আছে, "একে এই পিতৃবিয়োগ, তাহাতে লৌকিকতাতে সারা দিন পরিশ্রম ও কষ্ট, তাহার উপর এই আন্তরিক ধর্ম্মযুদ্ধ।" শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। মহাসমারোহ ব্যাপার। পুরোহিত কুটম্ব সজ্জনে সভা পরিপূর্ণ। তৎকালের কথা এইরূপ বলিতেছেন, "আমি পৌত্তলিকতা-সংস্রববর্জ্জিত দানোৎসর্গের একটী মন্ত্র স্থির করিয়া দিয়া শ্রাদ্ধ স্থানের এক সীমান্তে যাইয়া দান সামগ্রী উৎসর্গ করিতে লাগিলাম। এই সকল গোল মিটিয়া গেলে মধ্যাহ্নের পর কঠোপনিষৎ পাঠ করিলাম।" এই ব্যাপারে মহর্ষির ব্রতনিষ্ঠার দৃঢ়তা কেমন প্রকাশ পাইয়াছে! তিনি বলিয়াছেন, "জ্ঞাতি বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে আরো গ্রহণ করিলেন।" ধনী সম্ভ্রান্ত পৌত্তলিক পরিবারে আদ্য শ্রাদ্ধের সমারোহের স্থলে তৎকালে একাকী তিনি কেবল ব্রহ্মবলে বলীয়ান হইয়া সত্যব্রত রক্ষা করিয়াছেন। যখন পৈতৃক সমস্ত বিষয় ঋণদায়ে বিক্রয় হইবার আশঙ্কা হইল, তখন সাহস সহকারে সত্যরক্ষার জন্য বলিয়াছিলেন, "যদি অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয় করিরা ঋণ পরিশোধ না হয় তবে ট্রষ্ট সম্পত্তিও বিক্রয় করিতে হইবে।" তৎপরের অবস্থা এইরূপ বলিয়াছেন,—"চাকরের ভিড় কমাইয়া দিলাম, গাড়ী ঘোড়া সব নিলামে দিলাম, খাওয়া পরা খুব পরিমিত করিলাম, ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলাম। কল্য কি খাইব, কি পরিব, কিম্বা এবাড়ী ছাড়িতে হইবে তাহার ভাবনা নাই। একেবারে নিষ্কাম হইলাম। এই সময়ে আমি গভীর দর্শন শাস্ত্রের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম।" এতাধিক সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, এবং বৈষয়িক প্রতিকূলতার মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞান উপার্জ্জনে, সাধনে এবং প্রচারে কি অভূতপূর্ব্ব অনুরাগ মত্ততা আমরা এখানে দেখিতে পাই। বিষয়সুখ অপেক্ষা ব্রহ্মানন্দ উপভোগ যে কত লোভের বিষয় তাহা মহর্ষি পূর্ণ যৌবন সময়েই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। "বিষয়সুখে মন তৃপ্তি কি মানে" এই সঙ্গীত তাঁহার মুখেই শোভা পায়।

(পর্ব্বতে তপস্যা ।)

বন উপবন, পর্ব্বত প্রান্তর, নদী সমুদ্রের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং গাম্ভীর্য্যের মধ্যে স্বভাবের দেবতার আবির্ভাব এবং জীবন্ত প্রকাশ মহর্ষি যথেষ্ট সম্ভোগ করিয়াছেন। তিনি স্বভাবকবি এবং ভক্তকবির প্রেমানুরঞ্জিত চক্ষে এই সকল দেখিয়া আনন্দে মস্‌গুল্ হইতেন। তদ্বিষয়ক তাঁহার বর্ণনা পাঠে শুষ্ক হৃদয়েও কবিত্বের সঞ্চার হয়। তদানীন্তন ব্রাহ্মদিগের কঠোর বিচারের ধর্ম্মে, পারিবারিক অশান্তিতে যখন তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত বিরক্ত হইল তখন মনে এই

ভাব আসিল,—"আর আমি লোকদের সঙ্গে হো হো করিয়া বেড়াইব না। একাগ্রচিত্ত হইয়া একান্তে তাঁহার কঠোর তপস্যা করিব। আমি বাড়ী হইতে চলিয়া যাইব, আর ফিরিব না। আত্মার মূল তত্ত্ব কি, ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। হৃদয়ের উচ্ছ্বাসস্রোতে যে সকল সত্য ঈশ্বরপ্রসাদে আমার নিকট ভাসিয়া আসিয়াছে তাহা জ্ঞানালোকে পরীক্ষা করিতে এবং তাহার নিগূঢ় অর্থ সকল আবিষ্কার করিয়া তাহা জীবনে পরিণত করিতে দৃঢ় যত্নবান হইলাম।"

তৎকালে রেলপথ ছিল না, অধিকন্তু সিপাহিবিদ্রোহের সময়, সেই কালে মহর্ষি ডাকগাড়ীতে হাজার হাজার মাইল পথ ভ্রমণ করত উত্তর-পশ্চিম পঞ্জাবে চলিয়া যান। তথন হইতে শিমলা পর্ব্বতে বৎসরাধিক কাল নিঃসঙ্গ ভাবে একাকী বাস করেন। এ অবস্থায় প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া পরব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিবার জন্য অতি দুর্গম স্থানেও তিনি গিয়াছিলেন। সুখে পালিত শরীরকে ইচ্ছাপূর্ব্বক তখন কতই কষ্ট দিয়াছেন! প্রাণের আশঙ্কাও করেন নাই। কিন্তু এত কষ্ট কিসের জন্য? কেবল আত্মার মূলে পরমাত্মাকে দেখিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন পূর্ব্বক অধ্যাত্ম তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য কি নহে? কঠোর তপঃসাধনের এ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান যুগে বিশেষ অনুকরণীয় বলিতে হইবে। বিদ্রোহিতার বিভীষিকার সময় তিনি বিশ্বাসের বীরত্ব এবং নির্ভীকতার যে নিদর্শন দেখাইয়াছেন তাহা ভীরু বাঙ্গালীর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। যখন চারিদিকে পলাও পলাও শব্দ, বাঙ্গালী বাবু দেওয়ালের চূণ দিয়া নাকে কপালে ফোঁটা পরিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রদর্শনে ব্যস্ত, তখন মহর্ষি শান্তভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। পর্ব্বতপ্রস্রবণে ও মহোচ্চ জলপ্রপাতের নিম্নে, তুষারগলিত হিম জলে অবগাহন করিয়া মনের আনন্দে ব্রহ্মানন্দ যাহা তিনি ভোগ করিয়াছেন, তাহার কথা শুনিলেও প্রাণ পুলকিত হয়। শিমলার উত্তর প্রদেশ ভ্রমণের পর বলিতেছেন,—"এই বিংশতি দিবসের পর্ব্বত ভ্রমণে ঈশ্বর আমার শরীরকে আধিভৌতিক কত বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন, আমার মনকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, বিবেক বৈরাগ্যের কত উচ্চ শিক্ষা দিলেন, তাঁহার সহবাসসুখে আমার আত্মাকে কত পবিত্র উন্নত করিলেন, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা আমার হৃদয়ে ধরিল না।"—"আমি কম্বল জড়াইয়া, বিছানায় বসিয়া সকল ভুলিয়া অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত ব্রহ্মসঙ্গীত ও হাফেজের কবিতা গান করিতাম। দিনের বেলায় গভীর ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন থাকিতাম। প্রতিদিন দুই প্রহর পর্য্যন্ত আমি দৃঢ় আসনবদ্ধ হইয়া একাগ্র চিত্তে আত্মার মূল তত্ত্বের আলোচনা ও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিতাম। অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, মূল তত্ত্বের প্রামাণিকতা আর কাহারো উপরে নির্ভর করে না। তাহা আপনি আপনার প্রমাণ। তাহা স্বতঃসিদ্ধ, যেহেতু, ইহা আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত"।

এক দিন কোন বনাকীর্ণ পার্ব্বত্যপথে তন্মনস্ক হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ভাবে বিভোর হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া যান। বাসায় ফিরিতে রাত্রি হইল, মনে তখন ভয় জন্মিল। তখনকার কথা এইরূপ বলিয়াছেন,—"ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের কি এক গম্ভীর ভাব হইল। রোমাঞ্চিত শরীরে সেই বনের মধ্যে ঈশ্বরের চক্ষু দেখিলাম। সেই চক্ষুই সেই সঙ্কটে আমার নেতা হইল। যখনি কোন সঙ্কটে

পড়ি, তখনি তাঁহার সেই দৃষ্টি দেখিতে পাই"।

নদীর নিম্নগামী স্রোত দর্শনে যখন বাড়ী ফিরিবার আদেশ পাইলেন তখন পর্ব্বত ছাড়িতে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সেই আদেশ তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল, তাহার তেজে বুক ধড়াশ ধড়াশ করিতে লাগিল। পরে যখন আদেশ পালনার্থ প্রস্তুত হইয়া যান-বাহন সব আনিতে লাগিলেন তখন ক্রমে ক্রমে শরীর সুস্থ হইয়া উঠিল, হৃৎ-কম্প থামিল।

তাঁহার জীবন যৌবনে যেমন ভগবল্লীলার জীবন্ত প্রত্যক্ষ নিদর্শন সকল দেখা যায় তেমনি মৃত্যুর মধ্যেও দৃষ্ট হইয়াছে। চুঁচুড়া বাসের সময় একদিন এমন হইল যে এখন তখন! যান! যান! সকলেই জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া আছেন। মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণই দেখা দিয়াছে। এমন সময় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি শুনিলাম! ঈশ্বরের আদেশ। ঈশ্বর বলিলেন, হে প্রিয় পুত্র, তুমি এ যাত্রা রক্ষা পাইলে। তুমি এখনো সম্পূর্ণরূপে তোমার গম্য স্থানের উপযুক্ত হও নাই, যখন তুমি সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত হইবে তখন তোমাকে তোমার গম্য স্থানে লইয়া যাইব।"

এবারকার এই মুমূর্ষু অবস্থায় একদিন কম্পিত হস্তে বঙ্কিম অক্ষরে এইরূপ লিখিয়া দেন;—"আমার শরীর এক্ষণে অন্য কর্ত্তৃক যন্ত্রশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। আমার আত্মা এক্ষণে সেই শান্তং শিবমদ্বৈতং এর ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছে। এক্ষণে সংসারে কোন কষ্ট নাই, কোন শোক নাই। সকলই শান্তিময় দেখিতেছি।"

প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের শব্দচিত্রিত চরিত্রের এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছবি, দেবশ্রী কেবল দেখিবার শুনিবার বিষয় নহে। তাঁহার অভিজ্ঞতার বিশ্বাসবাক্য আমাদিগকে একদিকে যেমন আশা ও উৎসাহ প্রদান করে, তেমনি লজ্জা দেয়, ভর্ৎসনা করে। তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা এবং দৃষ্টান্ত আমাদের জীবন মরণের সম্বল হইয়া রহিয়াছে। তথাপি হায় আমরা তাঁহার এত যত্নে উপার্জ্জিত পরম ধনে কেন বঞ্চিত রহিয়াছি? কেন তাঁহার মত উপাসনা এবং সাধনানুরাগ নিষ্ঠা ভক্তি আমাদের হইবে না? নিতান্তই আমরা কৃপাপাত্র যে স্বর্গের অমূল্য ধন হাতে পাইয়াও তৎপ্রতি যত্ন করি না। হায় যে ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের জন্য এত ব্যাকুলতা উদ্যম, এত পরিশ্রম কষ্টবহন ত্যাগস্বীকার এবং অর্থব্যয় তিনি করিলেন তাহার উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমরা কি করিতেছি? আমরা কি কেবল বর্ষে বর্ষে মুখের কথায় তাঁহার জন্ম-উৎসব করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব? যে প্রগাঢ় ভক্তি, অটল নিষ্ঠা এবং আগ্রহ ব্যাকুলতার সহিত ব্রহ্মপূজা করিয়া, ব্রহ্মবলে বলী হইয়া তিনি ধর্ম্মবীরের ন্যায় ভারতের পৌত্তলিকতা, বদ্ধমূল ভ্রান্তি কুসংস্কার এবং আধুনিক সভ্যতার স্বেচ্ছাচারের প্রতিকূলে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন,—জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যে জন্য এত তাঁহার চেষ্টা যত্ন, হায়! আমরা তাহার জন্য কি এক-বিন্দু রক্তও দান করিব না! মহর্ষির বীর-পরাক্রম, অজেয় সাহস, ধৈর্য্য, বীর্য্য এবং নিঃস্বার্থ জীবন নবযুগের নবীন আর্য্যসন্তানদিগকে তাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণের জন্য জাগ্রত করুক! আমরা যেন তাঁহার পথের পথিক হইয়া, পরব্রহ্মের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া সত্যের গৌরব ঘোষণা করিতে পারি। এই মহাপুরুষের পশ্চাতে যদি অধিক দূরও অগ্রসর হইতে আমরা সক্ষম না হই, অন্ততঃ তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসারে পৌত্তলিকতার পরিবর্ত্তে গৃহপরিবারে নিত্যকর্ম্মে এক অদ্বি-

তায় ব্রহ্মের উপাসনা কি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না? ধর্ম্মভয়হীন লোকভয়মূলক কপট পৌত্তলিকতা এবং জ্ঞানকৃত পাপের বিরুদ্ধে তাঁহার মত নির্ভয়ে অকপটে যদি আমরা দাঁড়াই, আর দৈনিক, পারিবারিক এবং সামাজিক যাবতীয় অনুষ্ঠানে যদি এক ব্রহ্মের পূজা প্রতিষ্ঠিত করি, তাহা হইলেই মহর্ষির প্রতি আমাদের যথার্থ কৃতজ্ঞতা ভক্তি প্রেম প্রকাশ পাইবে, তদ্ভিন্ন আমরা তাঁহার নিকট কপট শ্রদ্ধা ভক্তি জানাইয়া আরও ঘোরতর অপরাধী হইব। তিনি কি আমাদের গুটিকতক মৌখিক মিষ্ট কথার ভিখারী? অপৌত্তলিক অকপট সরল সত্যপ্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইলেই তাহাকে ভক্তি করা হয়, তাহাই তিনি কেবল চান। এস আমরা অমিশ্র ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ এবং একটী সাধকদল হইয়া অনন্তধামে গমনোন্মুখ তাঁহার আত্মার তুষ্টি বিধান করি।

হে দয়াময় পিতা, তুমি পতিত ভারতের জন্য, ব্রাহ্মসমাজের জন্য যাঁহার জীবনকে এমন সুন্দর করিয়া সাজাইলে তাঁহার ভাব স্বভাব যেন তোমার প্রসাদে আমরা নিজস্ব এবং আত্মস্থ করিয়া লই। ভাবী ও বর্ত্তমান ব্রাহ্মবংশের চরিত্রে তুমি এই পবিত্র দেবচরিত্রকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেও যেন তাঁহার এই অমর জীবনকে আমরা বংশপরম্পরা নিজ নিজ জীবনে জাগাইয়া রাখিতে পারি। এক মহর্ষি-জীবনকে তুমি ক্ষুদ্রাকারে শত শত মহর্ষিজীবন প্রস্তুত করিয়া দাও। জরা ব্যাধি মৃত্যুর ঘোর অন্ধকারের ভিতরে এই অমর প্রশান্ত দেবাত্মার স্বর্গীয় শোভা তুমি এখনো আমাদের চর্ম্ম চক্ষের সম্মুখে দেখাইতেছ, এবং কালের ব্যবধান ভেদ করিয়া ভবিষ্যতে ইহা তুমি বিশ্বাসচক্ষুর সম্মুখে চিরদিনই দেখাইবে, কিন্তু আমরা নিতান্ত মূঢ় যে এখনো পর্য্যন্ত ইহাঁর যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারিতেছি না। দয়াল পিতা, আশীর্ব্বাদ কর যেন আমাদের দৈনিক ধর্ম্ম জীবনে তোমার এই প্রিয় সন্তান সুমধুর ব্রহ্মোপাসনা,—ব্রতনিষ্ঠা,—জনসেবা এবং গভীর ধ্যান ও ব্রহ্মানন্দের আকারে চির দিন জীবিত থাকেন। ভগ্নদেহবাসী আত্মার উপর তুমি নিয়ত শান্তি আনন্দ বর্ষণ কর। তিনি রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও তোমার প্রসন্ন মুখ দর্শনে নিত্যতৃপ্তি সম্ভোগ করুন! জীবন মরণে, ইহ পরকালে তোমারই জয়! জয়! জয়! তোমারই জয়।

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং।"

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী নিম্নোদ্ধৃত বিষয়টী পাঠ করিলেন।

"অদ্যকার অষ্টাশীতি সাম্বৎসরিক জন্মোৎসবে আমি আর কি বলিব। পূজ্যপাদ গুরুদেবের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্যম উৎসাহ ভগ্ন হইয়া আসিতেছে—জীবনের আদর্শ, ধর্ম্মপথের নেতা, শরীর মন ও জীবাত্মার একমাত্র কাণ্ডারী যিনি তাঁহার পুনর্জন্মোৎসব দিনে আর তাঁহাকে আমাদের মধ্যে সশরীরে পাইব কি না জানি না, কিন্তু তিনি এ আশ্বাস দিয়াছেন যে "আমি তোমাকে হস্তে ধারণ করিয়া পরলোকে উত্থান করিব।" যদি কর্ম্মের কোন ফল থাকে, যদি পুণ্যের কিছু পুরস্কার থাকে, অহেতুকী ভক্তির ও একান্ত অনুরাগের কোন বিনিময় থাকে তবে জীবনে সদ্গুরুর সঙ্গ ও তাঁহার করুণা-কণিকার প্রাপ্তিই তাহা। সকল গুরুই শিষ্য ও আশ্রিতবর্গকে এখানে পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যধামে চলিয়া যান। কিন্তু যে গুরু ইহলোকের পর পরলোকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার আশ্বাস দেন তাঁহার তুলনা কোথায়?

মৃত্যুর পর শরীর এখানে পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু গুরুর পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় আত্মার সঙ্গে সঙ্গে লোকলোকান্তর ভেদ করিয়া যদি শিষ্যাত্মাও সেই পরম ব্রহ্মানন্দ-পদে উপস্থিত হইয়া অমৃত ভোগ করিতে অবসর পায়, তবে সেই গুরুভক্তকে সৌভাগ্যবান মনে করি এবং সেই গুরুই এ জগতে ধন্য। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মসাধন উত্তম উপায় সন্দেহ নাই, কিন্তু গুরুভক্তি, গুরুর জ্ঞান-জ্যোতিতে হৃদয়কে জ্যোতিষ্মান্ রাখা, তাঁহার সকল বিধিনিষেধ অক্ষুণ্ণ ভাবে পালন করায় যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, জগতে তাহার তুলনা নাই। প্রাচীন কালের আরণ্যক ঋষির আশ্রম হইতে এখনকার মঠ চতুষ্পাঠী পর্য্যন্ত সকল স্থানেই গুরুভক্তির নিদর্শন দীপ্যমান রহিয়াছে। তবে আমরা কি গুরুভক্তি পরিত্যাগ করিব? যখন জড়বাদ, সাকার-বাদ এবং বহুবাদ ভারতের নির্ম্মল ব্রহ্ম-জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া বিষাদ আনয়ন করিয়াছিল, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অদ্যকার পুণ্য দিনে জন্ম পরি-গ্রহ করিয়া সেই অন্ধকার দূর করিবার মানসে ভারতকে ব্রহ্মনাম শুনাইলেন এবং সেই দিনের স্মৃতি হৃদয়ে হৃদয়ে জাগ্রৎ রাখিবার জন্য যখন আমরা অদ্য ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া ধন্য হইতেছি, তখন সেই গুরুভক্তিও হৃদয়ে জাগ্রৎ রাখিবার জন্য ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী সুন্দর দাসের ভক্ত্যুচ্ছ্বাসের সঙ্গে উচ্ছ্বাস মিশাইয়া আমরাও বলিব যে—

"তো চরণ তুমহারা, প্রাণ হামারা
তারণহারা, ভবপোতং।
জো গহে বিচারা, লগে না বারা
বিনশ্রমপারা, সো হোতং।
সব মিটে আঁধারা হোই উজারা,
নির্ম্মলসারা, সুখরাশী।
দেবেন্দ্র গুরু আয়া, শব্দ শুনায়া
ব্রহ্মবাতায়া, অবিনাশী।"

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অ-নেকে মহর্ষি দেবের জন্মোৎসবে স্ব স্ব বক্তব্য ব্যক্ত করিলে কএকটী সঙ্গীত হইয়া সভা-ভঙ্গ হয়।

সঙ্গীত।

ইমন ভূপালি।

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ,
ওরে দীন, তুই কর জোড় করি
কর তাহা দরশন!
মিলনের ধারা পড়িতেছে ঝরি
বহিয়া যেতেছে অমৃত লহরী,
ভূতলে মাথাটি রাখিয়া, লহরে
শুভাশীষ বরিষণ!
ওই যে আলোক পড়েছে তাঁহার
উদার ললাটদেশে—
সেথা হতে তারি একটি রশ্মি
পড়ুক্ মাথায় এসে!
চারিদিকে তাঁর শান্তিসাগর
স্থির হয়ে আছে ভরি চরাচর,
ক্ষণকালতরে দাঁড়াওরে তীরে,
শান্ত কররে মন।

মহর্ষি দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে উপাধ্যায় শ্রীগৌরগোবিন্দ রায় যে শ্লোক রচনা করিয়া বিতরণ করেন তাহা এই—

শ্রীমন্মহর্ষি-দেবেন্দ্রনাথ-ঠাকুর-
মহোদয়করকমলে—

ব্যাখ্যান্ধকারগ্রস্তানাং ধ্বান্তাপনয়নায় যৎ।
ভবাশীরীশ বিততা সিদ্ধিদাসীন্মনোহরা তে॥

ব্রহ্মাহমস্মীতি মুহুর্মতেৎ ং শ্রদ্ধা পুরাণীং মুহুরাপবাণীম্।
জুগুপ্সয়া শঙ্করতো বিতৃষ্ণো নিবৃত্তএতদ্যতনোদহো শম্॥
সর্ব্বাতীতং সর্ব্বগতং সর্ব্বান্তর্ভাবকং পুনঃ।
ব্রহ্মাধিগন্তকামানুগ্রহায় সংগ্রহস্তব॥
সর্ব্বেষাং বুদ্ধিবৃত্তীনাং ভগবৎ প্রেরণাগ্রহে।
মন্ত্রঃ কল্যাণকামস্য ধিনোতি হৃদয়ানি নঃ॥
'তজ্জলানিতি'বাক্যস্য সদর্থঃ প্রত্যভাদ্ধৃদি।
তস্মৈবেতি কৃতজ্ঞোঽহং জগদ্ব্রহ্মেতি বাদভিদ্।
'সর্ব্বাণুভূরয়মাত্মা ব্রহ্মে'তি ত্রিতয়স্য চ।
ব্রহ্মপ্রকৃতিজীবানাং যোগেনৈক্যং তনোতি হি॥
'রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চে'ত্যনয়া পুনঃ।
নিয়ম্যেন নিয়ন্তশ্চ সম্বন্ধোঽদর্শি সাম্প্রতম্॥
প্রেরণাপ্রেরণেঽস্মাকং হৃদয়ে কামনা তব।
যৈষা তস্যাঃ ফলপ্রাপ্তিরিত্যর্থগ্রহণং খলু॥
'যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।'
বৈদান্তিকগতের্ব্বোধ্যতাং যেয়ং হরত্যসৌ॥
কথং ত্বন্মতসাদৃশ্যং বিভর্ত্তি শ্বসিতং বিভোঃ।
প্রতিপাদয়িতুং তত্ত্ব যাচে জন্মদিনে তব॥
সর্ব্বেষামুপরি প্রকামশুভদামাশাস্মহে চাশিষং
ত্বত্তত্ত্ববুভুৎসুসৌখ্যজননং ত্বজ্জন্মবৃত্তং পুনঃ।
ঘোরধ্বান্তবৃতে বিচিন্তকরণে সংসারমার্গে ভৃশং
ভূয়াদ্দীপশিখালিরালয়মহো ধন্যা জনুস্তে ভুবি॥ ইতি—

ভক্ত্যুপহারঃ
চিরাশীর্ব্বাদভাজনস্য
শ্রীগৌরগোবিন্দরায়স্য।

ধর্ম্ম ও সংস্কার।

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর অতীত হইয়া গেল, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চ্চার অব্যবহিত ফলে এদেশে ধর্ম্ম লইয়া তুমুল আন্দোলনের সূচনা হইয়াছে। কালব্যাপী অসাড়তার উপরে যখনই সচলতার স্রোত বহিতে থাকে, প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বন সম্বন্ধে যখনই স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ হয়, তখন এক দুর্দ্ধর্ষ অধীরতা আসিয়া মনুষ্যকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করে, স্থিরচিন্তা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি তিরোহিত হইবার উপক্রম হয়।

তিনিই প্রকৃত সংস্কারক যিনি নিজে সময়ের অতীত হইয়াও দেশ কালের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ওজস্বিনী প্রতিভাবলে, জনসাধারণকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতে পারেন, অত্যুজ্জ্বল পরিণাম-দৃষ্টির প্রভাবে, লোকের কল্যাণ ভাবিয়া, গতি মুক্তির পথ সকলের সম্মুখে অনাবৃত করিয়া দিতে পারেন, আত্মার অন্ন পরমাত্মাকে দেখাইয়া দিয়া, সাধন ও তপস্যার পথে সকলকে পরিচালিত করিতে শিক্ষা দেন। কিন্তু এই সংস্কার-কার্য্য সকল দেশে একই ভাবে সাধিত হয় না। আরবের জ্বলন্ত মরুভূমির মধ্যে, দানবপ্রকৃতি দস্যুগণের অন্তরে শান্তির বীজ রোপণ করিবার জন্য মহম্মদকে তরবারির সাহায্য লইতে হইয়াছিল, কোথাও যুক্তি-তর্কে কোথাও বা প্রচুর শোণিতপাতরূপ মন্ত্রৌষধিবলে অসভ্য বর্ব্বর জাতির হৃদয়কে কোমল করিতে হইয়াছিল।

যখন আবার সমগ্র ইউরোপ অমানিশার অন্ধকারে নিমজ্জিত, প্রেতপূজা জড়পূজা বৃক্ষপূজা লইয়া সকলে ব্যতিব্যস্ত, অধ্যাত্মজীবনের চেতনা প্রায় বিলুপ্ত, এমন সময়ে এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তে যিশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার জীবনের সৌগন্ধে চারিদিক আমোদিত করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসরমাত্র প্রচার কার্য্যে বিব্রত থাকিয়া শ্রান্তদেহ চক্রীর কুচক্রে শত্রুর নির্ম্মম আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু তিনি যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহা হইতে সমুদয় ইউরোপ জীবন ও আলোক লাভ করিল।

মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্ম্ম বাহিরের অন্তরায়ে অনেক পরিমাণে অনাহত থাকিয়া ক্রমাগত প্রসার লাভ করিয়াছে, ভক্তগণ বাইবেল ও কোরাণের প্রতি ছত্রে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা পাইয়াছে। তত্তৎ ধর্ম্মের ভিতরে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে

মূলে বিশেষ মারাত্মক মতভেদ স্পর্শ করে নাই, লুথার প্রমুখ দুই চারিজনের যত্নচেষ্টায় মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে এবং আরব ও পারস্যে ধর্ম্মের প্রতি সাধারণের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আলোচনা নিবন্ধন শাস্ত্রলিখিত ধর্ম্ম বড় মলিন হইয়া যাইতে পারে নাই, ভক্তগণকে বড় দিশাহারা হইতে হয় নাই। কেমন করিয়াই বা হইবে। দুই বা সার্দ্ধ সহস্র বৎসরের অধিক কিছু এই দুই ধর্ম্মের পরমায়ু নহে। একে ত ধর্ম্মমত দুই এক খানি পুস্তকে নিবদ্ধ, তাহার উপরে প্রামাণ্য ধর্ম্মপুস্তকের সংখ্যাও বড় অধিক নহে। এরূপ অবস্থায় বিশ্বাস ও আচরণে, ধর্ম্মমতে ও লোকাচারে কতই বা পার্থক্য দাঁড়াইতে পারে। বিশেষতঃ গত অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া কেবলমাত্র ইউরোপে কেন, মুসলমান সাম্রাজ্যেও সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস অঙ্কশাস্ত্র ধর্ম্ম ও নীতি আগ্রহের সহিত অনুশীলিত হইয়া প্রহরীরূপে জন-সাধারণের জ্ঞানবুদ্ধিকে সঙ্কীর্ণতা হইতে যেরূপ রক্ষা করিয়াছে, তাহাতে অন্ধমত অন্ধবিশ্বাস শাস্ত্রের গণ্ডী ছাড়িয়া নিতান্ত অধিক দূর যাইতে পারে নাই। ঐ সকল স্থানে পরাধীনতার কঠোরতা, রাজবিপ্লব, বিধর্ম্মীদিগের পাশব বল কখনই স্বায় স্বায় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। এদেশের ন্যায় সৌর-গাণপত্য শাক্ত-বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়গত গৃহবিবাদের সূচনা না হওয়ায় পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার বড় আয়াস পাইতে হয় নাই।

কিন্তু একবার ঐ সকল দেশের সহিত এ দেশের তুলনা করিয়া দেখ, দেখিবে হিমালয়সমান প্রাচীন বেদ উপনিষদ ইতিহাসের অতীত যুগ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান উন্নতি ও নির্ব্বাসন তৎপরবর্ত্তী সহস্র বৎসরের অধিক কাল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। পুরাণ-তন্ত্রের অভ্যুদয় আরও প্রায় অর্দ্ধ সহস্র বৎসর ধরিয়া অতীতের সহিত বর্ত্তমানের যোগ রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইতেছে। বাইবেল ও কোরাণের কথা কি বলিতেছ, এ দেশের সুপ্রকাণ্ড প্রামাণ্য গ্রন্থ কয়েকখানি যৌবনকাল হইতে পাঠ করিতে আরম্ভ কর, বার্দ্ধক্যে আসিয়া পৌঁছিবে তথাপি পাঠসমাপনের বিলম্ব রহিবে। এদেশে কত সংস্কার কার্য্য হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বুদ্ধ শঙ্কর ও চৈতন্য প্রভৃতি দুই চারিজন ভিন্ন বড় আর অন্য সংস্কারকের নাম মিলিবে না। গ্রন্থ পাইবে কিন্তু গ্রন্থকারের নামের সন্ধান পাইবে না। কি আশ্চর্য্য তাঁহাদের ভাব! কি সমুন্নত তাঁহাদের হৃদয়! তাঁহারা ঈশ্বরের আদেশ বুঝিয়া কার্য্য করিতেন, যশোমানের প্রত্যাশা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারিত না।

যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে হিমালয় হইতে কুমারিকা আপ্লাবিত, তখন কে ভাবিয়াছিল যে একদিন সে ধর্ম্ম নির্ব্বাসিত হইবে। কিন্তু নিয়তি কে খণ্ডন করিবে! বেদবিদ্বেষী শূন্যবাদী বৌদ্ধধর্ম্ম জাপান তিব্বত ব্রহ্ম ও চীনে স্থান পাইল। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক তাহার সেবা আরম্ভ করিল। কিন্তু ভারতে বেদনিন্দা সহ্য হইল না। হিন্দুজাতির আস্তিক্য বুদ্ধি শূন্যবাদ গ্রহণ করিল না। বৌদ্ধধর্ম্মের সারাংশ ইতিপূর্ব্বেই হিন্দুধর্ম্মের সহিত মিলিয়া গিয়াছিল। ছায়া যাহা অবশিষ্ট ছিল, পরবর্ত্তী সময়ে শঙ্করের ক্ষমতাবলে তাহাও লোপ পাইল।

বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্ব হইতেই আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্তের সঙ্কীর্ণ পরিধি সমগ্র আর্য্যজাতিকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে নাই;

সে জাতি ক্রমশঃ সমগ্র ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। আর্য্যজাতির ভিতরে সকলে কিছু সমান ভাবে পরবর্ত্তী সময়ে ধর্ম্মচর্চ্চা ধর্ম্মানুষ্ঠান রক্ষা ও পালন করিতে পারে নাই। কালক্রমে অধিকার ভেদ দাঁড়াইল। অধিকারভেদে বিভিন্ন শাস্ত্ররচনার আবশ্যক অনিবার্য্য হইল। জনসমাজের ভিতরে ধর্ম্মকে কোন না কোন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য,বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া দিবার জন্য পুরাণতন্ত্রের সৃষ্টি আরম্ভ হইল। বেদ উপনিষদের উন্নত সত্য কল্পনার আবরণে আবৃত হইয়া কবিত্বের অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া পুরাণ-তন্ত্রে স্থান পাইল। জ্ঞান ও বুদ্ধি রাজবিপ্লব ও প্রকৃত শিক্ষার অভাবে অধিকন্তু নানা ধর্ম্মবিপ্লবের ভিতরে থাকিয়া পূর্ব্ব হইতে ম্লান হইয়া আসিতে ছিল। এই সময় হইতে পুরাণের কাহিনী তন্ত্রের ক্রিয়া-কাণ্ড জন-সাধারণের দুর্ব্বল মস্তিষ্কের পক্ষে উপযোগী হইয়া দাঁড়াইল।

এইরূপে যখন নানা বিপ্লবে নিপতিত হইয়া ভারতের ব্রহ্মজ্ঞান পুরাণতন্ত্রে আশ্রয় লইয়াছিল, জ্ঞানালোচনার পথ অনেকটা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তখন ঈশ্বরের প্রসাদে ভারতের সৌভাগ্যাকাশে আবার নূতন সূর্য্য সমুদিত হইল। ইংরাজের রাজত্ব এদেশে বদ্ধমূল হইয়া শান্তি স্থাপিত করিল। খ্রীষ্টধর্ম্মজাত প্রভাবে বাধ্য হইয়া স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার অবসর হইল। সূক্ষ্ম-দর্শী বঙ্গের দুই এক জন ধর্ম্মবীর প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্ম-পুস্তক উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন যে বেদ উপনিষদের সহিত প্রচলিত মতের পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে। বেদ উপনিষদের সমুজ্জ্বল সত্যের নিকষে পুরাণতন্ত্রের প্রচলিত অনুষ্ঠানে কলঙ্কের রেখা আপনা হইতে বাহির হইয়া পাড়িল।

সময়ের আহ্বানে নাস্তিকতার সম্ভাবনা ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে পৌরাণিক মত ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছিল, এই যুগান্তরে বসিয়া তাহাদের উপযোগিতা বা অনুপ-যোগিতা সম্বন্ধে সমালোচনা করা সহজ নহে। তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে বিভিন্ন সময়ের জন্য দেশকালপাত্র বুঝিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রয়োজন হইতে পারে; কিন্তু জ্ঞানোন্নত সময়ে জ্ঞান যুক্তি ও সত্যের সহিত ধর্ম্মের সর্ব্বতোভাবে সাম-ঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিলে অপ্রতি-বিধেয় সর্ব্বগ্রাসী নাস্তিকতা যে জাগিয়া উঠে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই কুলক্ষণের পূর্ব্বসূচনা দেখিয়াই ব্রাহ্মসমাজ বেদ উপনিষদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছেন, প্রচ্ছন্ন সত্যের উপরে যে আবর্জ্জনা রাশি নিপতিত হইয়াছে তাহা বিদূরিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। যেখান হইতে পুরাণ তন্ত্রের উৎপত্তি সেই মহাব্রহ্মের আশ্রয় লাভ করিবার জন্য সকলকে উপদেশ দিতেছেন। আমা-দিগকে একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে হইবে, ইহা কিছু পুরাণ তন্ত্রের নিকট নূতন কথা নহে। প্রচলিত ধর্ম্মের বৃথা নিন্দাবাদে সংস্কার কার্য্য সাধিত হয় না, তাহাতে সংস্কারকের ক্ষীণকণ্ঠ বাহিরের দারুণ কোলাহলে ডুবিয়া যায়। উত্তেজিত শ্রোতা দূরে পলায়ন করে। অপরকে শিক্ষা দিবার সময়ে, যদি শিষ্যের প্রতি গুরুর আচরণে,পিতার দৃঢ়তা ও মাতার মমতা অবতীর্ণ না হয়, তাহা হইলে তিনি যেমন কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না, তেমনি ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে যদি প্রচারকের জ্ঞানের প্রাচুর্য্যের সঙ্গে বিশ্বাসের দৃঢ়তা প্রাচীনত্ব ও দেশীয় ভাবের উপরে মমতা না প্রকাশ পায়, তবে তিনি কিছুতেই সিদ্ধি-লাভ করিতে পারেন না। এই সত্যটি স্মরণ রাখিয়া আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। শান্তস্বরূপ পরমেশ্বর আমাদিগের সকলকে অধীরতা ও শূন্য অভিমান হইতে রক্ষা করুন।

এপিক্‌টেটাসের উপদেশ।

আত্মোন্নতির তিনটি ধাপ।

১। তত্ত্বজ্ঞান তিনভাগে বিভক্ত। যিনি জ্ঞানী ও সাধু হইতে ইচ্ছা করেন, এই

তিন বিভাগেই তাঁর সাধনা ও অভ্যাস করা আবশ্যক।

বিষয়ের অনুসরণ ও বিষয়ের পরিবর্জ্জন এই প্রথম বিভাগের বিষয়। যাহা আমি চাই তাহা যেন পাই, যাহা চাহি না তাহার মধ্যে গিয়া না পড়ি,—ইহাই আমাদের চেষ্টা।

নিজ মনের বাসনা ও বিদ্বেষ—ইহাই দ্বিতীয় বিভাগের বিষয়। বাসনা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী না হইয়া, যাহা মনুষ্যোচিত—সেই কার্য্যে সতর্কতা, সুশৃঙ্খলা ও বিবেচনা সহকারে অগ্রসর হইতে হইবে। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া কোন কার্য্য করিবেক না। ইহাই চারিত্র্য।

তৃতীয় বিভাগটি এই:—যাহাতে বিভ্রম উপস্থিত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক হইবে। সকল বিষয় তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিবে। বাহ্য আকারে ভুলিবে না।—ইহাই বিবেক-বুদ্ধি।

প্রথম কথা:—কোন প্রিয় বস্তু অর্জ্জন কিম্বা কোন অপ্রিয় বস্তু বর্জ্জন করিতে না পারিলে তাহা হইতেই আমাদের সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়। বিষয়টি অতীব গুরুতর। ইহা হইতেই আমাদের যত কিছু উদ্বেগ অশান্তি, দুঃখ দুর্দ্দশা, শোক-সন্তাপ, বিরহ বিলাপ। এই স্থলে, রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া আমরা বিবেকের বাণী শুনিতে পাই না।

দ্বিতীয় কথা:—যাহা কিছু মনুষ্যোচিত, তাহাই আমাদের করিতে হইবে। তাই বলিয়া, পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় হৃদয়-শূন্য হইয়া থাকিতে হইবে না। ঈশ্বরাধীন জীবের যাহা কর্ত্তব্য, পুত্রের যাহা কর্ত্তব্য, পিতার যাহা কর্ত্তব্য, নাগরিকের যাহা কর্ত্তব্য,—এ সমস্তই আমাদের পালন করিতে হইবে। স্বাভাবিক অথবা অর্জ্জিত যে-কোন সম্বন্ধ-বন্ধনে আমরা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ হইয়া আছি, সেই সকল সম্বন্ধগুলি আমা-দিগকে সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে।

তত্ত্বজ্ঞানে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে তবে আমরা তৃতীয় বিভাগের অধিকারের মধ্যে আসিয়া পড়ি। অন্য দুই বিভাগের কাজ কিরূপে সুরক্ষিত হইতে পারে, কিরূপে অবাধে সম্পাদিত হইতে পারে, তাহারই উপদেশ এই তৃতীয় বিভাগের বিষয়। তাহার স্থূল মর্ম্মটি এই:—কোন বস্তু আমরা বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করিব না। বিনা-পরীক্ষায় কোন সুরাও গ্রহণ করিব না—কোন বাসনার প্ররোচনাকেও মনে স্থান দিব না। কেহ বলিতে পারেন, ইহা আমাদের সাধ্যা-তীত।

দেখিতে পাই, আজকালের তত্ত্বজ্ঞানীরা উপরোক্ত দুই বিভাগকে ছাড়িয়া এই তৃতীয় বিভাগটি লইয়াই ব্যাপৃত। ইহা লইয়াই তাঁহাদের যতকিছু তর্কবিতর্ক বাদবিতণ্ডা, সিদ্ধান্তস্থাপন, ও হেত্বাভাস-প্রদর্শন হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন, সিদ্ধান্ত-নির্ণয়ের সময়, সতর্কতার সহিত আপনাকে বিভ্রম হইতে রক্ষা করিবে। কিন্তু কে আপনাকে বিভ্রম হইতে রক্ষা করিবে? যে ব্যক্তি জ্ঞানী ও সাধু সেই আপনাকে বিভ্রম হইতে রক্ষা করিবে—না, আর কেহ?

২। তবে কি, বিভ্রম হইতে আপনাকে রক্ষা করা—এই কাজটুকুই তোমাদের এখন করিতে বাকি? আর সমস্ত কাজই তোমাদের হইয়া গিয়াছে? তোমরা অর্থে আর প্রলুব্ধ হও না? কোন সুন্দরী রমণীকে দেখিয়া তোমরা বিচলিত হও না? তোমার কোন প্রতিবেশী উত্তরাধিকার-সূত্রে কোন সম্পত্তিলাভ করিলে তোমার ঈর্ষা হয় না? সংক্ষেপে:—আর কিছু তোমাদের করিতে বাকি নাই, এখন কেবল, যাহা সাধনা করিয়া পাইয়াছ, তাহাই সুদৃঢ় করাই তোমাদের একমাত্র প্রয়োজন?

হতভাগ্য! এই কথাগুলি শুনিতে শুনিতেই যে তুমি ভীত ও উদ্বিগ্ন হইতেছ, পাছে কেহ তোমাকে অবজ্ঞা করে—সেইজন্য তুমি জা-নিতে উৎসুক হইয়াছ, তোমার সম্বন্ধে কে কি-কথা বলিতেছে। আজকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী কে?—এই কথা আলোচনার সময়, সেই সভায় উপস্থিত কোন ব্যক্তি যদি তোমার নাম করিয়া বলে "অমুক ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী"—অমনি তোমার মনের লেজটা দশহাত ফুলিয়া উঠিবে। কিন্তু উপস্থিত আর এক ব্যক্তি যদি বলে—"সে-

সব কিছুই নয়—তার কথা শুনিবার যোগ্যই নয়, সে কি-জানে? সে তত্ত্বজ্ঞানের শুধু আরম্ভ করিয়াছে মাত্র—তার অধিক কিছুই নয়।”—অমনি তুমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইবে, তোমার মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইবে, আর তুমি বলিয়া উঠিবে “আমি তাকে একবার দেখাতে চাই, আমি কিরূপ ব্যক্তি। আমি যে একজন মহাতত্ত্বজ্ঞানী, তা আমি তাহার নিকট সপ্রমাণ করিয়া দিব।”

যথেষ্ট হইয়াছে, আর প্রমাণের আবশ্যক নাই; তুমি কিরূপ তত্ত্বজ্ঞানী তোমার এই কথাতেই বিলক্ষণ জানা যাইতেছে।

Sermons of Maharshi Debendranath Tagore.

(Translated from Bengalee.)

Sermon XLIV.

The Bliss of Divine Protection.

O Supreme Spirit, sorely troubled by the sorrows, the infatuation and the confounding turmoil of the world, I look up to Thy lofty abode on high. Thou art kind to those that are humbled by affliction; thou art merciful, vouchsafe Thy mercy unto me. Thou bestowest Thy love even on those who would perceive Thee not nor want to know Thee. When the worldling is painfully agitated by the hopes and fears natural to a life devoted to the pursuits of the world, when he calculates only the profit and loss of pecuniary undertakings, and when, imagining that he will live for ever in this world, is entranced by it, even then, he, at times, becomes willing to come to Thee, influenced by the fear of death which Thou sendest to Him for his welfare. Even when he suffers from no worldly wants but is absorbed in the gratification of his sensual desires, he is momentarily awakened to a sense of his destiny by the fear of death, in the midst of all the affluence of his enjoyments. As the man afflicted by delirium regains momentary consciousness at intervals and then becomes congnizant of his sorroundings, so the world-infatuated man has now and then the sense of his destiny revived within him and then is able to behold Thee in the midst of the encircling darkness. There is none anywhere who has not need of Thee and who hopes not for good to come from Thy hands. Savage peoples, devoid of intelligence, seek but Thy protection, when trembling with dread at the sound of thunder and the sight of lightning, pray to be delivered from such fear. Civilized nations, though enjoying the light of knowledge, are led to remember Thee, affrighted by the terror of sin. None desires to be away from Thy throne. Who is there who does not bend his head before Thee? Thou art “সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা” “the Lord of all creation and the Monarch of all sentient beings.” Thou art the ruler of all, Thou keepest all under the domination of Thy laws. Thou maintenest all under Thy sway, as their monarch, as their governor, as their father and mother, as their comrade and as the loving friend of their hearts. All pray to Thee with folded hands. Some pray to Thee for material gifts; others warmed by the warmth of Thy love, pray to Thee for the gift of Thy own Self. Some pray to Thee for the enjoyments of paradise after death, while others pray for salvation. Men are inspired to prayer now by fear and then by hope. In some way or other all remember Thee. Even in the midst of the uproar of festivals and pleasure-parties, men do not forget Thee. O Supreme Spirit, how manifold are the forms in which Thy mercy is manifested! My voice tires of giving utterance to my gratitude when I realize that Thy mercy which I feel in my own insignificant life gratifies the longings of the countless beings of Thy illimitable kingdom. Thy mercy is to be seen in the day and in the night, in the heart of the mother and in the inner being of the saint. O Supreme Spirit, I pray to Thee and humbly do I fix my mind and heart on Thee; do Thou grant me all that is needed for Thy worship. Employ my hands in Thy work, speed my feet on to Thy errand, engage my tongue in singing Thy glory, immerse my mind in Thy contemplation, and unite my soul with Thee—let the soul find rest by resting in Thee, let it find gratification by beholding Thy full blown eyes of knowledge. How wonderful it is that Thou, the sole depository of mercy, shouldst instantly grant me what I have prayed for! I behold Thee at this very moment in my soul. I observe that thou art “অস্থূলমনণু হ্রস্বমদীর্ঘং” “neither thick nor thin, neither short nor long,” that thou art holy, true, and beautiful. It is through Thy governnace that the sun and the moon exist, held up in space. It is through Thy governance that this material world and the spirit-world exist, being held up in their proper places. It is through Thy governance that the

moments, the day and the night, the fortnight and the month, the seasons and the year come and go. It is through Thy governance that the rivers that wend their courses towards the east or the west flow ceaselessly from the mountains that look white with their mantle of snow. If a man spends his whole life in the performance of penances, and sacrifical and oblatory ceremonies, prescribed in the religious books, but knows Thee not, he will not obtain Thee. He who departs from the scene of this life without knowing Thee is a pitiable being, one who is the lowliest of the low, but he who quits this world after knowing Thee is the real Brahmin. Blessed art thou, O Lord of the universe, blessed art thou!

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৫, বৈশাখ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩০৯॥৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬৪৯।/৬
সমষ্টি	...	৯৫৮৸৶৬
ব্যয়	...	৩৩৫৸৵৯
স্থিত	...	৬২৩ ৩৯

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত

আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন

একেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

১২৩ ৩৯

৬২৩ ৩৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ১৬৬॥০

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩০৲

নববর্ষের দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয়ের বাটী হইতে প্রাপ্ত

২৯৲

শ্রীবিনোদবিহারী সরকার

২৲

দানাধারে প্রাপ্ত

৫॥০

১৬৬॥০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৫॥৵০
পুস্তকালয়	...	
যন্ত্রালয়	...	১০৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	১॥০
সমষ্টি	...	৩০৯॥৵০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	.	১৫৩৸৵৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	.	৩৯।৵৯
পুস্তকালয়	.	৶৯
যন্ত্রালয়	.	১০২।৶৬
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	.	৩৯৸৵০
সমষ্টি		৩৩৫৸৵৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধনরক্ষক। সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ আষাঢ় বৃহস্পতিবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের দ্বিপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। মহাশয়েরা যথা সময়ে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিবেন।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ }
১লা আষাঢ়। }

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ত্রয়োধর্ম্মস্কন্ধাঃ *

ব্রাহ্মধর্ম্মের তিনটি লক্ষণ—ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রীতি ও মুক্তি। সুতরাং ব্রাহ্মদিগের সাধনের বিষয়ও তিনটি—চিত্তের ধারণা এই তিন ভূমিকেই অবলম্বন করিয়া সিদ্ধি লাভ করে। প্রথমে আত্মানুসন্ধান চাই, পরে আপনার আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মজ্যোতিকে দর্শন করিয়া মনের একান্ত অনুরাগের সহিত সমাহিত চিত্তে প্রীতি-পুষ্পে ব্রহ্মের উপাসনা চাই। এই উপাসনার ফলই সাধকের শেষ ভূমি—মুক্তি।

আমরা আর্য্যসন্তান, আমাদের গুরু আর্য্য ঋষিগণ। তাঁহারা আমাদিগকে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা যদি সেই পথে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি, আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, আমরা সেই গম্যস্থানে উপস্থিত হইব। আমরা তাঁহাদেরই উপদেশে শুনিয়াছি যে, সত্যের পরমনিধান যিনি, তিনি "একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং।" যাঁহাতে সৃষ্টির মূলভূত পঞ্চতত্ত্ব উপশমিত হইয়াছে, যিনি শান্ত, যিনি মঙ্গল, যিনি অদ্বিতীয়, আত্মপ্রত্যয়েরই সার পদার্থ তিনি। যিনি আত্মপ্রত্যয়ের সার আত্মার অভ্যন্তরেই অনুসন্ধান করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়—কেবল পাওয়া যায় তাহা নহে, তাঁহাকে পাইলে হৃদয়াকাশ বিমুক্ত হয়, পাপ মোহের অন্ধকার বিনষ্ট হয়, চিত্ত শান্ত হয়, অভাব পূর্ণ হয়, কামনা তৃপ্ত হয়। হৃদয়জ্যোতির আলোকে দৃষ্ট হয় যে ইহসংসারে মানবজীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে তাঁহার সহিত গূঢ় সম্বন্ধ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সে সম্বন্ধ ইহ পরকালে যোগসূত্রে নিবদ্ধ—তাহা অমৃতবন্ধন—আনন্দ-প্রস্রবণ। আমরা এই যে, জানি তিনি আমাদের বন্ধু, জনয়িতা বিধাতা এবং বিশ্বসংসারের তাবৎ ঘটনার সাক্ষীরূপে তিনি সকলই জানিতেছেন, হৃদয়জ্যোতিতে তাহা প্রত্যক্ষ হয়। যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই বলিয়াছেন—

"স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্ অধ্যৈরয়ন্তঃ।"

যিনি অনন্ত অসীম জগতের রাজা এবং আমার হৃদয়রাজ্যের ঈশ্বর তাঁহাকে যদি অন্তরে জ্ঞানচক্ষে দেখিলাম এবং সমস্ত

---

* ভবানীপুর ত্রিপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসবে পঠিত।

চরাচর ত্রিভুবনের সঙ্গে তাঁহার যে কার্য্য-কারণসূত্রে নিগূঢ় যোগ রহিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলাম, তবে আমার সঙ্গে তাঁহার যে ঐকান্তিক যোগ, যে সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে, সমস্ত অভাব, নিরাশা, ভয়, সন্দেহ দূরীভূত করিয়া তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে অবশিষ্ট থাকে না। ঈশ্বরকে যদি পিতৃরূপে, মাতৃরূপে, বন্ধুরূপে এবং বিধাতৃরূপে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি, তবে কি আর তাঁহাকে পূজা না করিয়া থাকিতে পারি? একবার পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিলে স্নেহ উচ্ছ্বসিত না হইয়া থাকিতে পারে না, একবার জনক জননীর পূতপাদ দর্শন করিলে শ্রদ্ধা ভক্তি উচ্ছ্বসিত না হইয়া থাকিতে পারে না, একবার বন্ধুসমাগম লাভ করিলে সদ্ভাব উচ্ছ্বসিত না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু একাধারে যিনি আমাদের পিতা, মাতা, বন্ধু, বিধাতা এবং এই সকল মঙ্গলকর সম্বন্ধের যোজয়িতা, একবার তাঁহার সত্যং শিবং সুন্দরং সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিলে, আর কি ভক্ত তাঁহার চরণে প্রণত না হইয়া থাকিতে পারে? যিনি ইহকালের বন্ধু, পরকালের আশ্রয় এবং চরম কালের পরিপূর্ণ আনন্দময় গতি তাঁহাতে নিজের সমস্ত নির্ভর, সকল কৃতজ্ঞতা অর্পণ না করিয়া, তখন আর কি ভক্ত থাকিতে পারে? তাঁহাকে আপনার আত্মাতে দর্শন করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রীতি এবং মোক্ষজ্ঞান সাধিত হন। আমাদের শরীর ধর্ম্মের জন্যই উদ্ভূত হইয়াছে, ধর্ম্মও জ্ঞানের জন্য হইয়াছে এবং জ্ঞানও উপাসনার জন্য হইয়াছে, কারণ উপাসনা দ্বারা জ্ঞানী শীঘ্রই মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এই শরীর ধারণ করিয়া যে তাঁহার উপাসনা না করিল সে কি জীবিত? কখন না, সে মৃত।

"তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি।"

বৃক্ষাদিও জীবন ধারণ করে, মৃগপক্ষীরাও জীবন ধারণ করে, কিন্তু যে ব্যক্তির মন চিন্তাশীল অর্থাৎ ব্রহ্মমননের দ্বারা জীবিত, তিনিই যথার্থ জীবন ধারণ করেন। আমরা সংসারের মোহান্ধকারে পতিত হইয়া একে পথভ্রান্ত হইয়াছি, তাহাতে আবার আমাদের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আমাদিগকে সর্ব্বদাই বহির্মুখেই আকর্ষণ করিতেছে, ষড়রিপু অহর্নিশি অন্তরে থাকিয়াই শত্রুতাচরণ করিতেছে, এ অবস্থায় আত্মজ্ঞানের সুতীক্ষ্ণ খড়্গ ও ব্রহ্ম-প্রীতির উজ্জ্বল দীপশিখা হস্তে ধারণ না করিলে আমরা কোনমতেই সেই গম্যস্থানে—সেই পরম স্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারিব না।

মানবের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সাহায্যার্থে ঈশ্বর আমাদিগকে চারিপ্রকারের জ্যোতি প্রদান করিয়াছেন—আদিত্যজ্যোতি, চন্দ্রজ্যোতি, অগ্নিজ্যোতি এবং বাগ্‌জ্যোতি। ইহা ব্যতীত করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে আর এক প্রকার জ্যোতি দিয়াছেন, সে জ্যোতি দ্বারা বিশ্বতত্ত্বের অনন্ত রহস্য উদ্ভাসিত হয়। যখন সাধকের নিকটে জগতের প্রহেলিকা নির্ব্বাণ হয়, তখন সেই আত্মজ্যোতিই ধ্রুবতারার ন্যায় প্রস্ফুটিত থাকিয়া পরমাত্মজ্যোতি হইতে অমৃতানন্দ পান করিয়া জীবিত থাকে।

"অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তে২গ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতি।"

আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে,

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

আর বলিতেছেন,

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ংপ্রমায়ুকং ভবতি।"

আত্মার দর্শন, শ্রবণ ও মনন করিবে এবং তাঁহাকে প্রিয় করিয়া উপাসনা করিবে। তিনি অন্তরে আছেন, বাহিরে আছেন; অথচ তিনি "অনন্তরং অবাহ্যং" অন্তরেও নাই বাহিরেও নাই। তিনি অন্তরে আছেন, সেখানে তাঁহাকে জ্ঞানচক্ষে দর্শন করিতে হয় আর তিনি বাহিরে যে আছেন, সেখানে তাহার শ্রবণ ও মনন করিতে হয়। শ্রবণ মননে তাঁহাতে প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, দর্শনে তাঁহার প্রাপ্তি চরিতার্থতা লাভ করে। বিদেশগত পুত্র বা প্রিয়জনের কথা শ্রবণ মননে তাহার প্রতি স্নেহ প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কিন্তু যখন তাহাকে দেখিলাম, প্রাপ্ত হইলাম, তখন সেই বুকের সামগ্রীকে বুকে ধারণ করিলাম, আর স্নেহ প্রীতি শান্ত হইয়া গেল। তখন নিস্তরঙ্গ আনন্দ, নিস্তরঙ্গ সুখ, নিস্তরঙ্গ শান্তি! একে তিন, তিনে এক হইয়া গেল। ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে এই ভাব মানুষকে দেবতা করে।

সংসারের প্রতি, স্ত্রী পুত্র কন্যার প্রতি, হয় হস্তী হিরণ্যের প্রতি, আমাদের যে এত টান, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে যাইতে আদেশ করেন না, কিন্তু আদেশ করেন যে, অরণ্যকে সংসার এবং সংসারকে অরণ্য জানিয়া ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কর। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই কথাই উপদেশ দিয়াছিলেন যে,

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃসমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।"

হে ধনঞ্জয়, বিষয়ের প্রতি মনের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সিদ্ধি বা অসিদ্ধি কি হইল, তাহার ভাবনা দুর করিয়া, ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর। ব্রাহ্মধর্ম্মের ঐ কথাতেই মুক্তির আভাস, এবং গীতার এই কথাতেই মুক্তির আভাস। অতএব আমাদের সংসারগতি অতিক্রম করিতে হইলে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মোপাসনা ও তাহার ফলস্বরূপ মোক্ষসাধন আবশ্যক। এক আত্মজ্ঞানই এই তিনের উপাদান।

হে পরমাত্মন্! অদ্য আমাদের দ্বিপঞ্চাশত্তম ব্রহ্মোৎসব। অদ্য আমরা তোমার চরণে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি অদ্য পিতৃরূপে, মাতৃরূপে এবং বন্ধুরূপে আমাদের হৃদয়াকাশে আবির্ভূত হও। তোমার যে অশেষ মঙ্গলময় ভাব, নিগূঢ় সম্বন্ধ আমাদের আত্মাতে নিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা যেন আমরা জীবন্ত ভাবে উপলব্ধি করিয়া, তোমাকে প্রীতি ভক্তি করিয়া তোমার উৎসব সম্পন্ন করিতে পারি। পৃথিবীতে তোমার উৎসব পূর্ণ হউক, পরলোকে দেবগণসমাজে তোমার উৎসব পূর্ণ হউক এবং চরমকালে যেন তোমার পূর্ণ ব্রহ্মানন্দে—মহোৎসবে নিমগ্ন থাকিয়া আমাদের আত্মা শাশ্বতকাল অবস্থান করিতে সক্ষম হয়। তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

মহর্ষির জন্মোৎসব।*

পূজনীয় পিতৃদেবের আজ অষ্টাশীতিতম সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব। এই উৎসবদিনের পবিত্রতা আমরা বিশেষভাবে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিব।

বহুতর দেশকে সঞ্জীবনস্পর্শে উর্ব্বর করিয়া, পুণ্যধারায় বহুতর গ্রামনগরীর পিপাসা মিটাইয়া, অবশেষে জাহ্নবী যেখানে

* গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ মহর্ষিদেবের জন্মোৎসবে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত।

মহাসমুদ্রের প্রত্যক্ষ সম্মুখে আপন সুদীর্ঘ-পর্য্যটন, অতলস্পর্শ-শান্তির মধ্যে সমাপ্ত করিতে উদ্যত হয়, সেই সাগরসঙ্গমস্থল তীর্থস্থান। পিতৃদেবের পূতজীবন অদ্য আমাদের সম্মুখে সেই তীর্থস্থান অবারিত করিয়াছে। তাঁহার পুণ্যকর্ম্মরত দীর্ঘজীবনের একাগ্রধারা অদ্য যেখানে তটহীন, সীমাশূন্য, বিপুল বিরাম-সমুদ্রের সম্মুখীন হইয়াছে, সেইখানে আমরা ক্ষণকালের জন্য নতশিরে স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইব। আমরা চিন্তা করিয়া দেখিব, বহুকাল পূর্ব্বে একদিন স্বর্গ হইতে কোন্ শুভ সূর্য্য-কিরণের আঘাতে অকস্মাৎ সুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া কঠিন তুষারবেষ্টনকে অশ্রুধারায় বিগলিত করিয়া এই জীবন আপন কল্যাণযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল—তখন ইহার ক্ষীণ স্বচ্ছধারা কখনও আলোক, কখনও অন্ধকার, কখনও আশা, কখনও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া দুর্গম পথ কাটিয়া কাটিয়া চলিতেছিল। বাধা, প্রতিদিন বৃহদাকার হইয়া দেখা দিতে লাগিল—কঠিন প্রস্তরপিণ্ডসকল পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু সে সকল বাধায় স্রোতকে রুদ্ধ না করিতে পারিয়া দ্বিগুণ বেগে উদ্বেল করিয়া তুলিল—দুঃসাধ্য দুর্গমতা সেই দুর্ব্বার বলের নিকট মস্তক নত করিয়া দিল। এই জীবনধারা ক্রমশঃ বৃহৎ হইয়া বিস্তৃত হইয়া লোকালয়ের মধ্যে অবতরণ করিল, দুই কূলকে নবজীবনে অভিষিক্ত করিয়া চলিল, বাধা মানিল না, বিশ্রাম করিল না, কিছুতেই তাহাকে লক্ষ্য হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল না—অবশেষে আজ সেই একনিষ্ঠ অনন্যপরায়ণ জীবনস্রোত সংসারের দুই কূলকে আচ্ছন্ন করিয়া অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে—আজ সে তাহার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত চাঞ্চল্যকে পরমপরিণামের সম্মুখে প্রশান্ত করিয়া পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনের দিকে আপনাকে প্রসারিত করিয়াছে—অনন্ত জীবনসমুদ্রের সহিত সার্থক জীবনধারার এই সুগম্ভীর সম্মিলনদৃশ্য অদ্য আমাদের ধ্যাননেত্রের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া আমাদিগকে ধন্য করুক্।

অমৃতপিপাসা ও অমৃতসন্ধানের পথে ঐশ্বর্য্য একটী প্রধান অন্তরায়। সামান্য সোনার প্রাচীর উচ্চ হইয়া উঠিয়া আমাদের দৃষ্টি হইতে অনন্ত আকাশের অমৃত আলোককে রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতে পারে। ধনসম্পদের মধ্যেই দীনহৃদয় আপনার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে থাকে—সে বলে, এই ত আমি কৃতার্থ হইয়াছি, দশে আমার স্তব করিতেছে, দেশে আমার প্রতাপ বিকীর্ণ হইতেছে, বাহিরে আমার আড়ম্বর অভ্রভেদ করিতেছে, ঘরে আমার আরামশয়ন প্রতিদিন স্তরে স্তরে রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে,—আমার আর কি চাই! হায় রে দরিদ্র, নিখিল মানবের অন্তরাত্মা যখন ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছে, যাহাতে আমি অমর না হইব তাহা লইয়া আমি কি করিব—

"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্"—

সপ্তলোক যখন অন্তরীক্ষে ঊর্দ্ধকররাজি প্রসারিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছে, আমাকে সত্য দাও, আলোক দাও, অমৃত দাও, অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়—তখন তুমি বলিতেছ আমার ধন আছে, আমার মান আছে, আমার আরাম আছে, আমি প্রভু, আমি অধিপতি, আমার আর কি চাই! ঐশ্বর্য্যের ইহাই বিড়ম্বনা—দীনাত্মার কাছে ঐশ্বর্য্যই চরম সার্থকতার রূপ ধারণ করে। অদ্যকার উৎসবে আমরা যাঁহার মাহাত্ম্য স্মরণ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি—একদা

প্রথম যৌবনেই তাঁহার অধ্যাত্মদৃষ্টি এই কঠিন ঐশ্বর্য্যের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া অনন্তের দিকে উন্মীলিত হইয়াছিল—যখন তিনি ধনমানের দ্বারা নীরন্ধ্রভাবে আবৃত আচ্ছন্ন ছিলেন, তখনি ধনসম্পদের স্থূলতম আবরণ ভেদ করিয়া, স্তাবকগণের বন্দনাগানকে অধঃকৃত করিয়া, আরাম-আমোদ-আড়ম্বরের ঘন যবনিকা বিচ্ছিন্ন করিয়া, এই অমৃতবাণী তাঁহার কর্ণে কেমন করিয়া প্রবেশলাভ করিল যে, ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং—যাহা কিছু সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন দেখিবে, ধনের দ্বারা নহে, স্বার্থের দ্বারা নহে, আত্মাভিমানের দ্বারা নহে—যিনি ঈশানং ভূতভব্যস্য—যিনি আমাদের অনন্তকালের ঈশ্বর, আমাদের ভূতভবিষ্যতের প্রভু—তাঁহাকে এই ধনিসন্তান কেমন করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐশ্বর্য্যপ্রভাবের ঊর্দ্ধে সমস্ত প্রভুত্বের উচ্চে আপনার একমাত্র প্রভু বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন—সংসারের মধ্যে তাঁহার নিজের প্রভুত্ব, সমাজের মধ্যে তাঁহার ধনমর্য্যাদার সম্মান—তাঁহাকে অন্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না!

আবার যেদিন এই প্রভূত ঐশ্বর্য্য, অকস্মাৎ এক দুর্দ্দিনের বজ্রাঘাতে বিপুল আয়োজন-আড়ম্বর লইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল—ঋণ যখন উপন্যাসের দানবের ন্যায় মুহূর্ত্তের মধ্যেই বৃহদাকার ধারণ করিয়া তাঁহার গৃহদ্বার, তাঁহার সুখসমৃদ্ধি, তাঁহার অশনবসন সমস্তই গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিল—তখনও—পদ্ম যেমন আপন মৃণালবৃন্ত দীর্ঘতর করিয়া জলপ্লাবনের ঊর্দ্ধে আপনাকে সূর্য্যকিরণের দিকে নির্ম্মল সৌন্দর্য্যে উন্মেষিত করিয়া রাখে, তেমনি করিয়া তিনি সমস্ত বিপদ্‌বন্যার ঊর্দ্ধে আপনার অম্লানহৃদয়কে ধ্রুবজ্যোতির দিকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া রাখিলেন। সম্পদ্ যাঁহাকে অমৃতলাভ হইতে তিরস্কৃত করিতে পারে নাই, বিপদও তাঁহাকে অমৃতসঞ্চয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারিল না। সেই দুঃসময়কেই তিনি আত্মজ্যোতির দ্বারা সুসময় করিয়া তুলিয়াছিলেন—যখন তাঁহার ধনসম্পদ্ ধূলিশায়ী, তখনই তিনি তাঁহার দৈন্যের ঊর্দ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া পরমাত্মসম্পদ্‌বিতরণের উপলক্ষ্যে সমস্ত ভারতবর্ষকে মুহুর্মুহু আহ্বান করিতেছিলেন। সম্পদের দিনে তিনি ভুবনেশ্বরের দ্বারে রিক্তহস্তে ভিক্ষু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বিপদের দিনে তিনি আত্মৈশ্বর্য্যের গৌরবে ব্রহ্মসত্র খুলিয়া বিশ্বপতির প্রসাদসুধাবণ্টনের ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঐশ্বর্য্যের সুখশয্যা হইতে তুলিয়া লইয়া ধর্ম্ম ইহাঁকে তাহার পথের মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিল—ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া· দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—কবিরা বলেন, সেই পথ ক্ষুরধারনিশিত অতি দুর্গম পথ। লোকাচারপ্রচলিত চিরাভ্যস্ত ধর্ম্ম, আরামের ধর্ম্ম, তাহা অন্ধভাবে জড়ভাবেও পালন করিয়া যাওয়া চলে এবং তাহা পালন করিয়া লোকের নিকট সহজেই যশোলাভ করিতে পারা যায়। ধর্ম্মের সেই আরাম সেই সম্মানকেও পিতৃদেব পরিহার করিয়াছিলেন। ক্ষুরধারনিশিত দুরতিক্রম্য পথেই তিনি নির্ভয়ে পদনিক্ষেপ করিলেন। লোকসমাজের আনুগত্য করিতে গিয়া তিনি আত্মবিদ্রোহী আত্মঘাতী হইলেন না।

ধনিগৃহে যাঁহাদের জন্ম, পৈতৃক কাল হইতেই সমাজের নিকট সম্মানলাভে যাঁহারা অভ্যস্ত, সমাজপ্রচলিত সংস্কারের নিবিড় ব্যূহ ভেদ করিয়া নিজের অন্তর্লব্ধ সত্যের পতাকাকে শত্রুমিত্রের ধিক্কার, লাঞ্ছনা ও

প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অবিচলিত দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া রাখা তাঁহাদের পক্ষে কোনমতেই সহজ নহে—বিশেষতঃ বৈষয়িক সঙ্কটের সময় সকলের আনুকূল্য যখন অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে তখন তাহা যে কিরূপ কঠিন সে কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সেই তরুণ বয়সে, বৈষয়িক দুর্যোগের দিনে, সম্ভ্রান্তসমাজে তাঁহার যে বংশগত প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল, তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, পিতৃদেব ভারতবর্ষের ঋষিবন্দিত চিরন্তন ব্রহ্মের, সেই অপ্রতিম দেবাধিদেবের আধ্যাত্মিক পূজা, প্রতিকূল সমাজের নিকট মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন।

তাহার পরে তাঁহার জীবনে আর এক গুরুতর সংগ্রামের দিন উপস্থিত হইল। সকলেই জানেন, বৈচিত্র্যই জগতে ঐক্যকে প্রমাণ করে—বৈচিত্র্য যতই সুনির্দ্দিষ্ট হয়, ঐক্য ততই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ধর্ম্মও সেইরূপ নানাসমাজের ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া নানা বিভিন্নকণ্ঠে নানা বিচিত্র আকারে এক নিত্য সত্যকে চারিদিক্ হইতে সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষ বিশেষসাধনায় বিশেষভাবে যাহা লাভ করিয়াছে, তাহার ভারতবর্ষীয় আকার বিলুপ্ত করিয়া, তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে উৎপাটিত করিয়া, তাহাকে অন্যদেশীয় আকৃতি-প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে জগতের ঐক্যমূলক বৈচিত্র্যের ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করা হয়। প্রত্যেক লোক যখন আপনার প্রকৃতি অনুসারে পরিপূর্ণ উৎকর্ষলাভ করে তখনই সে মনুষ্যত্বলাভ করে—সাধারণ মনুষ্যত্ব ব্যক্তিগত বিশেষত্বের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। মনুষ্যত্ব হিন্দুর মধ্যে এবং খৃষ্টানের মধ্যে বস্তুতঃ একই, কিন্তু তথাপি হিন্দুবিশেষত্ব মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ সম্পদ্, এবং খৃষ্টানবিশেষত্বও মনুষ্যত্বের একটি বিশেষলাভ; তাহার কোনটা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিলে মনুষ্যত্ব দৈন্যপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষের যাহা শ্রেষ্ঠধন তাহাও সার্ব্বভৌমিক, য়ুরোপের যাহা শ্রেষ্ঠধন তাহাও সার্ব্বভৌমিক, কিন্তু তথাপিও ভারতবর্ষীয়তা এবং য়ুরোপীয়তা উভয়ের স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে বলিয়া উভয়কে একাকার করিয়া দেওয়া চলে না। মেঘ আকাশ হইতে জলবর্ষণ করে এবং সরোবর ভূতলে থাকিয়া জলদান করে—যদিও দানের সামগ্রী একই তথাপি এই পার্থক্য বশতই মেঘ আপন প্রকৃতি অনুসারে বিশেষভাবে ধন্য এবং সরোবরও আপন প্রকৃতি অনুসারে বিশেষভাবে কৃতার্থ। ইহারা উভয়ে এক হইয়া গেলে জলের পরিমাণ মোটের উপরে কমে না, কিন্তু জগতে ক্ষতির কারণ ঘটে।

তরুণ ব্রাহ্মসমাজ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এই কথা ভুলিয়াছিল, যখন ধর্ম্মের স্বদেশীয় রূপ রক্ষা করাকে সে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া জ্ঞান করিত—যখন সে মনে করিয়াছিল বিদেশীয় ইতিহাসের ফল ভারতবর্ষীয় শাখায় ফলাইয়া তোলা সম্ভবপর এবং সেই চেষ্টাতেই যথার্থভাবে ঔদার্য্যরক্ষা হয়, তখন পিতৃদেব সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের স্বদেশীয় প্রকৃতিকে একটা বিমিশ্রিত একাকারত্বের মধ্যে বিসর্জ্জন দিতে অস্বীকার করিলেন—ইহাতে তাঁহার অনুবর্ত্তী অসামান্য-প্রতিভাশালী ধর্ম্মোৎসাহী অনেক তেজস্বী যুবকের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল। এই বিচ্ছেদ স্বীকার করিতে যে দৃঢ়তা, যে সাহস, যে বলের প্রয়োজন হয়, সমস্ত মতামতের কথা বিস্মৃত হইয়া আজ তাহাই যেন আমরা স্মরণ করি।

আধুনিক হিন্দুসমাজের প্রচলিত লোকাচারের প্রবল প্রতিকূলতার মুখে আপন অনুবর্ত্তী সমাজের ক্ষমতাশালী সহায়গণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে সকল দিক হইতেই রিক্ত করিতে কে পারে—যাঁহার অন্তকরণ জগতের আদিশক্তির অক্ষয় নির্ঝরধারায় অহরহ পূর্ণ হইয়া না উঠিতেছে।

ইহাঁকে যেমন আমরা সম্পদে বিপদে অভয় আশ্রয়ে অবিচলিত দেখিয়াছি—তেমনি একবার বর্ত্তমান সমাজের প্রতিকূলে, আর একবার হিন্দুসমাজের অনুকূলে তাঁহাকে সত্যে-বিশ্বাসে দৃঢ় থাকিতে দেখিলাম—দেখিলাম উপস্থিত গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কা তাঁহাকে টলাইতে পারিল না—হিন্দুসমাজের মধ্যে তিনি পরম দুর্দ্দিনেও একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজে তিনি নব আশা, নব-উৎসাহের অভ্যুদয়ের মুখে পুনর্ব্বার সমস্ত ত্যাগ করিয়া একাকী দাঁড়াইলেন। তাঁহার কেবল এই প্রার্থনা রহিল, মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ—আমি ব্রহ্মকে ত্যাগ করিলাম না, ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ না করুন!

ধনসম্পদের স্বর্ণস্তূপরচিত ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া, নবযৌবনের অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তির পরিবেষ্টনের মধ্যে দিব্য জ্যোতি যাঁহার ললাটস্পর্শ করিয়াছিল, ঘনীভূত বিপদের ভ্রূকুটী-কুটিল রুদ্রচ্ছায়ায় আসন্ন দারিদ্র্যের উদ্যতবজ্রদণ্ডের সম্মুখেও ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখচ্ছবি যাঁহার অনিমেষ অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে অচঞ্চল ছিল, দুর্দ্দিনের সময়েও সমস্ত লোকভয় অতিক্রম করিয়া যাঁহার কর্ণে ধর্ম্মের মাভৈঃ বাণী সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, বলবৃদ্ধি-দলপুষ্টির মুখে যিনি বিশ্বাসের বলে সমস্ত সহায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিঃসঙ্কোচে পরমসহায়ের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, অদ্য তাঁহার পুণ্যচেষ্টাভূয়িষ্ঠ সুদীর্ঘ জীবনদিনের সায়াহ্নকাল সমাগত হইয়াছে। অদ্য তাঁহার ক্লান্তকণ্ঠের স্বর ক্ষীণ, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণপ্রায় জীবনের নিঃশব্দবাণী সুস্পষ্টতর, অদ্য তাঁহার ইহজীবনের কর্ম্ম সমাপ্ত, কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী কর্ম্মচেষ্টার মূলদেশ হইতে যে একাগ্রনিষ্ঠা উর্দ্ধলোকে উঠিয়াছে তাহা আজ নিস্তব্ধভাবে প্রকাশমান। অদ্য তিনি তাঁহার এই বৃহৎ সংসারের বহির্দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু সংসারের সমস্ত সুখদুঃখ-বিচ্ছেদমিলনের মধ্যে যে অচলা শান্তি জননীর আশীর্ব্বাদের ন্যায় চিরদিন তাঁহার অন্তরে ধ্রুব হইয়াছিল, তাহা দিনান্তকালের রমণীয় সূর্য্যাস্তচ্ছটার ন্যায় অদ্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উদ্ভাসিত। কর্ম্মশালায় তিনি তাঁহার জীবনেশ্বরের আদেশপালন করিয়া অদ্য বিরামশালায় তিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বরের সহিত নির্বাধমিলনের পথে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এই পুণ্যক্ষণে আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য, তাঁহার সার্থক জীবনের শান্তিসৌন্দর্য্যমণ্ডিত শেষ রশ্মিচ্ছটা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্য, এখানে সমাগত হইয়াছি।

বন্ধুগণ, যাঁহার জীবন আপনাদের জীবনশিখাকে ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল করিয়াছে, যাঁহার বাণী অবসাদের সময় আপনাদিগকে বল ও বিষাদের সময় আপনাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছে, তাঁহার জন্মদিনকে উৎসবের দিন করিয়া আপনারা ভক্তিকে চরিতার্থ করিতে আসিয়াছেন, এইখানে আমি আমার পুত্রসম্বন্ধ লইয়া এই উৎসবদিনে যদি ক্ষণকালের জন্য পিতার নিকট বিশেষভাবে উপস্থিত হই, তবে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। সন্নিকটবর্ত্তী মহাত্মাকে সমগ্রভাবে

সম্পূর্ণভাবে দেখিবার অবসর আত্মীয়দের প্রায় ঘটে না। সংসারের সম্বন্ধ বিচিত্র সম্বন্ধ, বিচিত্র স্বার্থ, বিচিত্র মত বিচিত্র প্রবৃত্তি—ইহার দ্বারা বিচারশক্তির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কঠিন হয়, ছোট জিনিষ বড় হইয়া উঠে, অনিত্য জিনিষ নিত্য-জিনিষকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সংসারের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে প্রকৃত পরিচয় প্রত্যহ খণ্ডিত হইয়া যায়—এই জন্যই পিতৃদেবের এই জন্মদিনের উৎসব তাঁহার আত্মীয়দের পক্ষে একটী বিশেষ শুভ অবসর—যে পরিমাণ দূরে দাঁড়াইলে মহত্ত্বকে আদ্যোপান্ত অখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, অদ্যকার এই উৎসবের সুযোগে বাহিরের ভক্তমণ্ডলীর সহিত একাসনে বসিয়া আমরা সেই পরিমাণ দূরে আসিব, তাঁহাকে ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত তুচ্ছ সম্বন্ধজাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিব, আমাদের সঙ্কীর্ণ জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহারোৎক্ষিপ্ত সমস্ত ধূলিরাশিকে অপসারিত করিয়া তাঁহাকে বৃহৎ আকাশের মধ্যে নির্ম্মল শান্তির মধ্যে, দেব-প্রসাদের অক্ষুণ্ণ আনন্দরশ্মির মধ্যে, তাঁহার যথার্থ মহিমায় তাঁহাকে তাঁহার জীবনের নিত্যপ্রতিষ্ঠার উপরে সমাসীন দেখিব। সংসারের আবর্ত্তে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যত বিদ্রোহ, যত চপলতা, যত অন্যায় করিয়াছি, অদ্য তাহার জন্য তাঁহার শ্রীচরণে একান্তচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিব—আজ তাঁহাকে আমাদের সংসারের, আমাদের সর্ব্বপ্রয়োজনের অতীত করিয়া তাঁহাকে বিশ্বভুবনের ও বিশ্বভুবনেশ্বরের সহিত বৃহৎ নিত্যসম্বন্ধে যুক্ত করিয়া দেখিব এবং তাঁহার নিকট এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিব, যে, যে চিরজীবনের ধনকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে সঞ্চিত করিয়াছেন, সেই সঞ্চয়কেই যেন আমরা সর্ব্বপ্রধান পৈতৃক সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করি, তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত যেন আমাদিগকে ধনসম্পদের অন্ধতা হইতে রক্ষা করে, বিপদের বিভীষিকা হইতে উদ্ধার করে, বিশ্বাসের দৃঢ়তার মধ্যে আমাদিগকে ধারণ করিয়া রাখে এবং তিনি ঋষিদের যে মন্ত্র আমাদের কর্ণে ধ্বনিত করিয়াছেন, তাহা যেন কোনও আরামের জড়ত্বে কোনও নৈরাশ্যের অবসাদে বিস্মৃত না হই—

> মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ
> অনিরাকরণমস্ত অনিরাকরণং মেঽস্ত।

বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, এই সপ্তাশীতিবর্ষীয় জীবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আনন্দিত হও, আশান্বিত হও। ইহা জান যে, সত্যমেব জয়তে নানৃতং—ইহা জান যে, ধর্ম্মই ধর্ম্মের সার্থকতা। ইহা জান যে আমরা যাহাকে সম্পদ্ বলিয়া উন্মত্ত হই তাহা সম্পদ্ নহে, যাহাকে বিপদ্ বলিয়া ভীত হই তাহা বিপদ নহে, আমাদের অন্তরাত্মা সম্পদ-বিপদের অতীত যে পরমা শান্তি তাহাকে আশ্রয় করিবার অধিকারী। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, সমস্ত জীবন দিয়া ভূমাকেই জানিতে ইচ্ছা কর, এবং সমস্ত জীবনের মধ্যে ভূমাকেই সপ্রমাণ কর। এই প্রার্থনা কর, আবিরাবীর্ম্মএধি, হে স্বপ্রকাশ আমার নিকটে প্রকাশিত হও—আমার নিকটে প্রকাশিত হইলে সেই প্রকাশ আমাকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত মানবের নিকট সহজে দীপ্যমান হইয়া উঠিবে—এইরূপে আমার জীবন সমস্ত মানবের নিত্যজীবনের মধ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকিবে; আমার এই কয়দিনের মানবজন্ম চিরদিনের জন্য সার্থক হইবে!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সার সত্যের আলোচনা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

বিগত প্রবন্ধের শেষভাগে একটি কথা বলা হইয়াছিল এই যে, আছি'র সহিত আছি'র ঐক্যই আমাদের স্বাধীনতা'র গোড়া'র কথা। ঐ সংক্ষিপ্ত বচনটির মর্ম্মের ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে উহার অন্ধি-সন্ধি'র জানালা-কপাট খুলিয়া দিয়া উহার ভিতরে রীতিমত আলোক নিক্ষেপ করা আবশ্যক; তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য।

কালিদাস প্রথম বয়সে মূর্খ ছিলেন, পশ্চাৎবয়সে অসামান্য কবি হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহা সকলেরই জানা কথা। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পণ্ডিতের এবং মূর্খের আছি'র মধ্যে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীরের ব্যবধান নাই। এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা বলিবার আছে; তাহা এইঃ—

কালিদাস যখন মূর্খ ছিলেন, তখন তিনি জানিতেন যে, তাঁহার নাম "কালি" এই এক কথায় পরিসমাপ্ত। তাহার পরে যখন তিনি আপনার নামাক্ষর বানান্ করিতে শিখিতেছেন, তখন তিনি এই এক কথার জায়গায় দুই কথা দেখিতেছেন;—দেখিতেছেন (১) কএ আকার কা, (২) লএ ইকার লি। আরো কিছুদিন পরে যখন তাঁহার প্রথম পাঠ সাঙ্গ হইল, তখন তিনি দুই কথার জায়গায় তিন কথা দেখিলেন;—দেখিলেন (১) কএ আকার কা × (২) লএ ইকার লি = (৩) কালি।

তৃতীয় বয়সের তিন কথা আর-কিছু না—দ্বিতীয় বয়সের দুই কথার সহিত প্রথম বয়সের এক কথার যোগ-বন্ধন;—কা এবং লি এই দুই কথার সহিত "কালি" এই এক কথার যোগ-বন্ধন। এই গেল উপমা—উপমেয় হ'চ্চে এই ঃ—

সহজ জ্ঞান "আছি" এই এক কথা বলিয়াই ক্ষান্ত। মনোবিজ্ঞান ঐ এক কথা'র পর্দ্দার আড়ালে দুই কথা দেখিতে পা'ন; দেখিতে পান—আছি এবং আছে এই দুই যমক সহোদর পিঠাপিঠি জোড়া লাগানো। তার সাক্ষী—আমাকে দেখিয়া কেহ যদি বলে "এ ব্যক্তি আছে", তবে সে ব্যক্তি যাহাকে বলিতেছে "আছে", তাহাকেই আমি বলিতেছি "আছি". তা ছাড়া—আমার আপনার নিকটেও আমার শরীর, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি আছে; আমি সেই আছে'র সহিত জড়িত-ভাবে আছি—এরূপ জড়িত-ভাবে যে, আমার শরীর-মন প্রভৃতি যত-কিছু পদার্থ আমার সাক্ষাতে আছে বলিয়া প্রতি-ভাত হইতেছে, সমস্তই যদি আমার জ্ঞান হইতে সরিয়া পালায়, তবে আছিও সেই সঙ্গে সরিয়া পালায়;—যেমন সুষুপ্তিকালে। এইজন্য বলিতেছি যে, সহজ জ্ঞান যেখানে দেখেন শুধুই কেবল আছি, মনোবিজ্ঞান সেখানে দেখেন আছে-আছি একসঙ্গে জড়ানো। তত্ত্বজ্ঞান আবার মনোবিজ্ঞানের অপেক্ষাও সূক্ষ্মদর্শী। মনোবিজ্ঞান আছে'র একপিটেই কেবল আছি দেখিতে পান; তত্ত্বজ্ঞান আছে'র এ-পিট ও-পিট দুই পিঠেই আছি দেখিতে পা'ন। তত্ত্বজ্ঞানের অন্তরের কথা কিরূপ—যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে নিম্নে প্রণিধান করা হোক্ঃ—

তত্ত্বজ্ঞানের একটি অন্তরের কথা।

তোমাকে লক্ষ্য করিয়া আমি বলি যে, "ইনি আছেন"—আমার ভাষায় আমি বলি "ইনি আছেন।" তোমার ভাষায় তুমি "ইনি আছেন" বলো না—তুমি বলো "আমি আছি।" একই বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া আমার ভাষায় আমি বলিতেছি "ইনি

আছেন”, তোমার ভাষায় তুমি বলিতেছ “আমি আছি”। দুই কথার ভাবার্থ একই। ভাবার্থ একই বটে—কিন্তু তত্রাচ তোমার ভাষায় তুমি যে বলিতেছ “আমি আছি”, এইটিই মূল কথা; আর, আমার ভাষায় আমি যে বলিতেছি “ইনি আছেন”, এটা সেই মূলের অনুবাদ। ওটাকেই বা মূল বলি কেন—এটাকেই বা অনুবাদ বলি কেন? কেন যে বলি, তাহার কারণ দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; কারণ আর-কিছু না—তুমি যে বলিতেছ “আমি আছি”, এটা তোমার হওয়া-কথা; আর, আমি যে বলিতেছি “ইনি আছেন”, এটা শুধু আমার দেখা কথা। তত্ত্বজ্ঞান বলেন যে, দেখা-কথার মূলে যদি হওয়া-কথা না থাকে, তবে দেখা-কথা শুধুকেবল একটা কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই বলিতে হয় যে, তুমি যে বলিতেছ “আমি আছি”, সেইটিই মূল কথা; আর, আমি যে বলিতেছি “ইনি আছেন”, এটা তাহারই অনুবাদ। তুমি হয় তো বলিবে যে, দেয়াল তো বলে না “আমি আছি”—তুমিই বলিতেছ “দেয়াল আছে”,—“দেয়াল আছে” ইহার ভিতরে দেখা-কথা ছাড়া হওয়া-কথা কোন্‌খান্‌টায়? ইহার উত্তর এই যে, তুমি যখন বলিতেছ যে, দেয়াল আছে, তখন তাহার অর্থই এই যে, তোমার দেখা-কথার ও-পিটে দেয়ালের নিজের একটি হওয়া-কথা আছে—যদিচ দেয়াল তাহা মনুষ্যের ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারে না। দেয়াল যদি মনুষ্যের ভাষায় কথা কহিতে জানিত—তাহা হইলে দেয়াল নিশ্চয়ই বলিত “আমি আছি”। দেয়াল নিতান্তই পর-দেশের লোক;—দেয়াল তোমার দেশের ভাষায় কথা কহিতে জানে না; তাই সে মুখে বলিতে পারে না যে, “আমি আছি”। তুমি দেয়ালের উকিল। দেয়াল আপনার অন্তরের কথা আপনি প্রকাশ করিয়া বলিতে অক্ষম—তাই তুমি দেয়ালের হইয়া এইরূপ ওকালতি করিতেছ যে, দেয়াল আছে; ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, “আমি আছি” এটা দেয়ালের অন্তরের কথা; যদিচ দেয়াল সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে জানেও না—বলিতে চাহেও না। দেয়ালকে মারো-ধরো—দেয়ালের তাহা গায়ে লাগে না; কাজেই “আমি আছি” এ কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার জন্য তাহার মাথাব্যথা হয় না; প্রকাশ করিয়া না বলুক্‌—ঠারেঠোরে বলিতে ছাড়ে না; এমন কি—দেয়াল তোমার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছে “আমি আছি”; দেয়ালের অঙ্গুলি হ’চ্চে শ্বেতাংশু-প্রতিক্ষেপণী শক্তি; সেই তাহার অব্যর্থ শক্তি তোমার চক্ষের ভিতরে চালাইয়া দেয়াল মুখে না বলুক্‌—কাজে বলিতেছে “আমি আছি”।

তত্ত্বজ্ঞানের কথা এই যে, তুমি দেয়ালই হও আর মনুষ্যই হও—তাহাতে আইসে যায় না;—যাহাই তুমি হও না কেন—তোমাকে লক্ষ্য করিয়া আমি যদি বলি যে, “ইনি আছেন”, তবে সেই “ইনি আছেন” কথাটির দুই পারেই “আমি আছি” বিরাজমান। এপারের “আমি আছি” আমার অন্তরের কথা—ওপারের “আমি আছি” তোমার অন্তরের কথা; আর তোমার সেই অন্তরের কথাটিকে আমি আমার ভাষায় অনুবাদ করিয়া বলিতেছি যে, “ইনি আছেন” অথবা “এটা আছে”।

আছি’র সহিত আছি’র ঐক্য যে কাহাকে বলে, তাহা এতক্ষণে বুঝিতে পারা গেল। দেখিতে পাওয়া গেল যে,

প্রথমত, দেখা-কথা'র দুই পারেই হওয়া-কথা থাকা চাই। এপারে দ্রষ্টার, অর্থাৎ আমার "আমি-আছি" থাকা চাই—ওপারে লক্ষ্য বস্তুর, অর্থাৎ তোমার, আমি আছি থাকা চাই।

দ্বিতীয়ত, দেখা কথা'র এপারের হওয়া-কথা'র সহিত ওপারের হওয়া-কথা'র ঐক্য থাকা চাই।

তৃতীয়ত, এপারের হওয়া-কথার সহিত ওপারের হওয়া-কথার সেই যে ঐক্য, তাহারই নাম আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য।

আছি'র সহিত আছি'র ঐক্যের
স্থূল দৃষ্টান্ত।

"আমি তোমাকে দেখিতেছি" এই যে একটি দেখিতেছি-ব্যাপার, এই দেখিতেছি'র এপারে আমি বলিতেছি "আমি আছি", ওপারে তুমি বলিতেছ "আমি আছি"। "আমি তোমাকে দেখিতেছি" এ কথাটি একটি বই কথা নহে, অথচ সেই একটিমাত্র কথা'র দুই পারে দুই আছি বিরাজমান।

দুইটি কথা দ্রষ্টব্য।

প্রথম কথা এই যে, দেখিতেছি'র এপারে দাঁড়াইয়া আমি যে বলিতেছি "আমি আছি", তাহার অর্থ এই যে, দেখিতেছি=দেখিতে+আছি অর্থাৎ দেখিতেছি রকমে আছি। তবেই হইতেছে যে, দেখিতেছি আছি'রই রকমভেদ বা প্রকারভেদ। রূপকের ভাষায়—দেখিতেছি—আছি'রই তরঙ্গ-ভঙ্গ। দার্শনিক ভাষায়—দেখিতেছি একপ্রকার পরিবর্ত্তনশীল গুণ; সেই পরিবর্ত্তনশীল গুণের অপরিবর্ত্তনীয় আধার-বস্তু থাকা চাই; সে আধার-বস্তু কে? না, আছি। কেন না, গোড়ায় আছি না থাকিলে, ব্যবহারক্ষেত্রে দেখিতেছি থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, "আমি তোমাকে দেখিতেছি" বলিলেই বুঝায় যে, তুমি আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উপরে কার্য্য করিতেছ, তাই আমি তোমাকে দেখিতেছি। সে কার্য্যের কারণ আমি নহি—সে কার্য্যের কারণ তুমি। ফলে, দেখিতেছি-ব্যাপারটি এপারের আছি'র একপ্রকার গুণপরিবর্ত্তন;—"পূর্ব্বে দেখিতেছিলাম না—এক্ষণে দেখিতেছি" এইরূপ একটা গুণপরিবর্ত্তন; এই গুণ-পরিবর্ত্তনের উপরে ওপারের আছি'র কার্য্য-কারিতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে স্পষ্ট।

এই দুইটি কথা পরস্পরের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া আমরা পাইতেছি এই যে, "আমি তোমাকে দেখিতেছি" এই কথাটির সঙ্গে দুই পারের দুই আছি'র সম্বন্ধ রহিয়াছে। এপারের আছি'র সম্বন্ধ যাহা রহিয়াছে, তাহা বস্তুগুণের সম্বন্ধ; ওপারের আছি'র সম্বন্ধ যাহা রহিয়াছে, তাহা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ। বস্তু-গুণ-সম্বন্ধের সোপান দিয়া আমি দেখিতেছি-হইতে এপারের আছিতে অবতরণ করি; কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের সোপান দিয়া আমি দেখিতেছি-হইতে ওপারের আছিতে আরোহণ করি। দুই পারের দুই আছি'র ঐক্যের নামই আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য।

প্রকৃত কথা এই যে, সম্বন্ধমাত্রেরই মূলে ঐক্য অবশ্যম্ভাবী। আমি যদি বলি যে, "তোমার সহিত আমার কোনো সম্বন্ধ নাই", তবে তাহার অর্থ ই এই যে, তোমাতে আমাতে ঐক্য নাই। পুত্র এক-সময়ে মাতার শরীরেরই অঙ্গের সামিল ছিল—তাই মাতার সহিত পুত্রের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মনুষ্যমাত্রই জগতের শ্রেষ্ঠ উপাদান হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই-জন্য মনুষ্যে মনুষ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সম্বন্ধের মুলে ঐক্যই যদি নাই—তবে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া থাকিবে কিসের উপরে? শূন্যের উপরে? না, বালির বাঁধের উপরে?

অতএব এটা স্থির যে, সম্বন্ধমাত্রেরই মূলে ঐক্য রহিয়াছে। এমন কি, তেলে-জলের সম্বন্ধের মধ্যেও ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। একটা কাচ-পাত্রে যদি তেল আর জল একাধারে বিন্যস্ত হয়, তাহা হইলে দুয়ের সন্ধিস্থানে উভয়ের ঐক্য এরূপ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে যে, সে স্থানের চক্রাকৃতি রেখাটিকে তৈল-রেখা বলিব কি জল-রেখা বলিব, তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে, আ'ছি'র সহিত দেখিতেছি'রও ঐক্য রহিয়াছে; আছি'র সহিত আছি'রও ঐক্য রহিয়াছে। আছি'র সহিত দেখিতেছি'র ঐক্য প্রকাশ পায় বস্তুগুণের সম্বন্ধ-সূত্রে; আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য প্রকাশ পায় কার্য্যকারণসম্বন্ধ-সূত্রে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, দুই পারের দুই আছি'র ঐক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই পূর্ব্বপ্রবন্ধের উপসংহার-ভাগে সাঁটে-সোঁটে বলা হইয়াছিল—"আছি'র সহিত আছি'র ঐক্যই স্বাধীনতা'র ভিত্তিমূল।"

অতঃপর, আছি'র সহিত আছি'র ঐক্যের সঙ্গে স্বাধীনতার কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যা'ক্।

মনে কর, দেবদত্ত-নামক একজন বলবান্ যুবা পুরুষ কয়েক ভরি সোনার গহনা বোঁচ্‌কায় বাঁধিয়া লইয়া একাকী পদব্রজে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছেন। দুই গ্রামের মধ্যে ১৫ ক্রোশের ব্যবধান। প্রত্যুষে যখন তিনি রওনা হইলেন, তখন তাঁহার মনে হইল যে, তিনি গন্তব্যপথ একনিশ্বাসে গ্রাস করিয়া ফেলিবেন। তিনি ভাবিলেন "একঘণ্টার মধ্যেই আমি ১৫ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া পার হইব—কাহার সাধ্য আমার গতিরোধ করে—আমি স্বাধীন!" এরূপ যে তাঁহার মনে হইল, তাহা হইবারই কথা; কেন না, একটি-আধটি নহে—তিন চারিটি—মাথালো গোচের কারণ একযোট্ হইয়া তাঁহার মনোমধ্যে ঐরূপ একটা মহোদ্যমশালি-স্বাধীনতা-বোধের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছে।

প্রথম কারণ হ'চ্চে সুস্থ শরীরের বল-স্ফূর্ত্তি।

দ্বিতীয় কারণ হ'চ্চে নিঃশঙ্ক মনের আনন্দ-স্ফূর্ত্তি।

তৃতীয় কারণ হ'চ্চে গম্যস্থানে যাইবার জন্য আগ্রহের আতিশয্য।

চতুর্থ কারণ হ'চ্চে—কর্ত্তব্য-কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া-গতিকে অন্তরাত্মার (conscience এর) প্রসন্নতা।

দেবদত্ত স্বাধীনতায় ভর করিয়া দশ-ক্রোশ পথ অকাতরে অতিবাহন করিলেন। তাহার পরে ক্রমে তাঁহার স্বাধীনতা মন্দা পড়িয়া আসিতে লাগিল। কায়-ক্লেশে তিনি আর দুই-ক্রোশ পথ কথঞ্চিৎ প্রকারে অতিবাহন করিলেন; কিন্তু এখনো তিন-ক্রোশ গন্তব্যপথ তাঁহার সম্মুখে দিগন্তর-হইতে দিগন্তরে প্রসারিত রহিয়াছে। তাঁহার পদদ্বয় বেঘোরে পড়িয়া—নিতান্ত না চলিলে নয় তাই চলিতেছে। যে স্বাধীনতা-বোধের নূতন স্ফূর্ত্তির সময় ১৫ ক্রোশ পথ দেবদত্তের চক্ষে এক-ক্রোশের বেশ ধারণ করিয়াছিল, সেই স্বাধীনতা-বোধের এখন অস্তগমনের কাল উপস্থিত; এখন তাই এক-ক্রোশ পথ তাঁহার নিকটে শত-ক্রোশ বা ততোধিক। দেবদত্ত এখন মনে করিতেছেন যে, "আমার স্বাধীনতায় কাজ নাই—মাঠের মধ্যে কোথাও যদি একটা বটগাছের আড়াল পাই, তবে তাহার সুস্নিগ্ধ ছায়ায় মুহূর্ত্তেকের জন্য হাত পা ছড়াইয়া বাঁচি।" পূর্ব্বে দেবদত্তকে দেবদত্তের মন তিন-সত্য

করিয়া বলিয়াছিল "তুমি স্বাধীন"; এখন অম্লান-বদনে বলিতেছে "তুমি পরাধীন।" মনের দুই কথাই কিছু আর সত্য হইতে পারে না; হয় এটা সত্য—নয় ওটা সত্য। তবেই হইতেছে যে, দেবদত্তের তখনকার সেই যে স্বাধীনতা-বোধ এবং এখনকার এই যে পরাধীনতা-বোধ—দুইই তাঁহার দুই বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী দুইপ্রকার মনের ভাব, তা বই আর কিছুই নহে। তাহার পরে মনে কর, অস্ত দিবাকরের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁহার স্বাধীনতাবোধ অস্তমিত হইল, তখন তিনি সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ দেখিয়া তাহার তলে বোচ্‌কা হেলান্‌ দিয়া বসিলেন—বসিয়া শ্রমাপনোদন করিতেছেন, ইতিমধ্যে জনৈক অপরিচিত পথিক তাঁহার দুই-হাত অন্তরে সেই বটবৃক্ষের আর-এক পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিল।

দেবদত্তের মনোমধ্যে দুইটি কথা কাঁধ ধরাধরি করিয়া উপস্থিত হইল। একটি কথা এই যে, বোঁচ্‌কার ভিতরে চারি-পাঁচ-ভরি স্বর্ণালঙ্কার রহিয়াছে; আর-একটি কথা এই যে, পার্শ্বের লোকটির মুখের আকার-প্রকার ভাল নহে; তা ছাড়া, তাহার হাতের লাঠির আয়তনের পরিমাণ কিছু যেন মাত্রাতীত। দেবদত্ত যে, স্থানান্তরে উঠিয়া যাইবেন—সে শক্তি তাঁহার নাই; তাহাতে আবার, নিদ্রার আকর্ষণে তাঁহার চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে। কিন্তু "নিদ্রাকে কোনোমতেই আসিতে দেওয়া হইবে না" এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। তাঁহার মনের ভাব এই যে, "কি জানি! হাতের যষ্টির সহিত মুখের চেহারার অমন যখন মিল, তখন "বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ!" কিন্তু নিদ্রাকুহকিনীকে তিনি কত ঠেকাইয়া রাখিবেন! যেই একটু ফাঁক পাইতেছে—অমনি নিদ্রা চুপি চুপি আসিয়া চক্ষুর কপাটে কুলুপ আঁটিয়া মস্তকের ভার বোচ্‌কার দিকে ঢুলাইয়া দিতেছে; মস্তক বটবৃক্ষের গায়ে ঠোকর খাইয়া সচকিতভাবে স্বস্থানে উঠিয়া দাঁড়াইতেছে; আর তৎক্ষণাৎ দেবদত্তের তন্দ্রা ভাঙিয়া যাওয়াতে দেবদত্ত বোচ্‌কাটিকে আপনার আয়ত্তের মধ্যে সরাইয়া আনিয়া সাবধান করিয়া রাখিতেছেন। নিদ্রা কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহে—নিদ্রা অপ্রতিহত উদ্যমের সহিত আক্রমণের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিতেছে। এমন-সময় দেবদত্তের একজন পুরাতন বন্ধু সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন—তিনি দেবদত্তকে দেখিয়া মহা-আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। দেবদত্ত সেখানে গিয়া চির-পরিচিত বন্ধুবর্গের মাঝখানে স্বাধীনতার স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন—মনের সুখে ঘুমাইয়া বাঁচিলেন। দেবদত্তের যাত্রারম্ভ হইতে বন্ধুভবনে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার স্বাধীনতা-বোধের পথের সমাচার যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহা এই:—

যাত্রাকালে দেবদত্ত আপন শরীরে বলের স্ফূর্ত্তি এবং মনে আনন্দের স্ফূর্ত্তি প্রচুর-পরিমাণে অনুভব করিয়াছিলেন। স্ফূর্ত্তিই অনুভব করিয়াছিলেন—স্ফূর্ত্তির বাধা অনুভব করেন নাই। তিনি তখন মনে করিয়াছিলেন যে, আমার এ স্ফূর্ত্তি বাহিরের কোনো-কিছুর বশতাপন্ন নহে—ইহারই নাম স্বাধীনতা-বোধ। দেবদত্তের এই প্রথম উদ্যমের স্বাধীনতা-বোধের প্রধান কারণ—শরীরের স্বাস্থ্য। শরীর যদি কোনো অংশে অসুস্থ হয়, তবে যে অংশে তাহা অসুস্থ, সেই অংশে তাহা দেহী ব্যক্তির পর। পক্ষান্তরে, সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর দেহী ব্যক্তির আপনার তো বটেই—তা ছাড়া তাহা একপ্রকার দ্বিতীয় আপনি। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ

হইলে, শরীর আছে এবং আমি আছি, এ দুয়ের ভিন্নতা বোধ থাকে না। সুস্থ শরীর দেহী ব্যক্তির দ্বিতীয় আপনি বলিয়া—সুস্থ শরীরের পরিধির মধ্যে দেহী ব্যক্তি এক-প্রকার সহজ স্বাধীনতা অনুভব করে। এই যে সহজ স্বাধীনতা, ইহার মধ্যে আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য কোন্‌খানটায়, তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারে এইরূপেঃ—

দেহী ব্যক্তি দেহ-বোধের এপারে থাকিয়া বলিতেছে যে, আমি আছি এবং আমার দেহ আছে। দেহী ব্যক্তি যে বলি-তেছে "আমি আছি", এইটিই দেহী ব্যক্তির হওয়া-কথা; পক্ষান্তরে—"দেহ আছে", এটা দেহী ব্যক্তির দেখা-কথা; দেহী ব্যক্তির এই দেখা-কথা ব্যতীত—দেহের নিজের একটি হওয়া-কথা আছে। কেন না, দেহ একপ্রকার অশাব্দিক ভাষায় বলিতেছে যে, আমি আছি; আর দেহী শাব্দিক ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া বলিতেছে যে, দেহ আছে। এখন বক্তব্য এই যে, একদিকে অশাব্দিক ভাষায় দেহ বলিতেছে আমি আছি, এবং আর-একদিকে শাব্দিক ভাষায় দেহী বলিতেছে আমি আছি; এই যে দুই দিকের দুই আছি—সুস্থ-শরীরে এই দুই আছি এক আছি'রই সামিল হইয়া দাঁড়ায়; কাজেই—এ-আছি ও-আছি-কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয় না; আর, বাধাপ্রাপ্ত হয় না বলিয়া দেহী ব্যক্তি স্বাধীনতা অনুভব করে। এইরূপে দেহী-আত্মা (যাহার শাস্ত্রীয় নাম বিজ্ঞানাত্মা) আর, দেহ-আত্মা (যাহার শাস্ত্রীয় নাম ভূতাত্মা,) এই দুই আত্মা যখন একাত্মা হইয়া যায়, তখন সেই একাত্মভাব হইতে একপ্রকার অবাধিত স্ফূর্তি জন্মগ্রহণ করে; আর, দেহ-দেহীর সেই যে একাত্ম-ভাব, তাহাই এখানে দেহের এ-পিটের আছি'র সহিত ও-পিটের আছি'র ঐক্য বলিয়া নির্দ্দেশিত হইতেছে।

প্রথম উদ্যমে দেবদত্ত শরীরকে যতটা আপনার মনে করিয়াছিলেন, ক্রমে দেখি-লেন—শরীর ততটা আপনার নহে। পরি-শেষে যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পদ-দ্বয় তাঁহার কথার অবাধ্য হইয়া—তিনি যত বলিতেছেন "চলো", সে দুই ভ্রাতা ততই বলিতেছে "চলিতে পারি না", তখন তাঁহার স্বাধীনতা-বোধের বক্ষ একেবারেই দমিয়া গেল। তাহার পরে যখন তিনি বটবৃক্ষ-তলে নিষণ্ণ হইয়া বাহিরের লাঠিয়াল এবং অন্তরের নিদ্রা দুয়ের কাহাকে সাম্‌লাইবেন, তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না, তখন কত যে তিনি পরাধীন, সে বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ শিক্ষালাভ হইল। তাহার পরে তিনি যখন বন্ধু-ভবনে সুবিশ্বস্ত-চিত্তে মনের কপাট খুলিয়া সুখে শয়ন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, তাঁহার চারিদিকের লোকেরা সকলেই তাঁহার আপনার লোক—কেহই তাঁহার পর নহে। তা ছাড়া—ধনঞ্জয় নামক গৃহকর্ত্তা তাঁহার পরম বন্ধু—একপ্রকার দ্বিতীয় আ-পনি। এই সকল কারণে—পথের মাঝখানে তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন সেই যে তাঁহার আদরের ধন স্বাধীনতা, এক্ষণে তাহা তিনি শুধসুদ্ধ ফিরিয়া পাইলেন। এক্ষণে আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য অতীব সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল। বন্ধুপ্রাপ্তির এ-পারে দেবদত্তের আমি আছি এবং ওপারে ধন-ঞ্জয়ের আমি আছি, এই দুই আছি একীভূত হইয়া দেবদত্তের অন্তঃকরণে স্বাধীনতার কপাট উন্মুক্ত করিয়া দিল। দেবদত্ত যাত্রা-কালে যেরূপ স্বাধীনতা অনুভব করিয়া-ছিলেন, তাহার গোড়া'র কথা দেহের আছি'র সহিত দেহীর আছি'র ঐক্য; এক্ষণে বন্ধুভবনে তিনি যেরূপ স্বাধীনতা অনুভব

করিতেছেন, তাহার গোড়া'র কথা বন্ধুবর্গের আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য। কিন্তু এ দুইপ্রকার প্রাচীরের ঘের-দেওয়া স্বাধীনতা ব্যতীত আর এক প্রকার স্বাধীনতা আছে—যাহার পদবী অতীব উচ্চ; এত উচ্চ যে বর্ত্তমান কালের সভ্যতার অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে তাহাকে নাগাল পাওয়া সুদুষ্কর। সেটি হ'চ্চে পারমার্থিক স্বাধীনতা—যাহার আর-এক নাম মুক্তি। দেহ যেমন দেহীর আপনার, গেহ যেমন গেহী'র আপনার, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তেমনি ভগবদ্‌ভক্ত সাধু পুরুষের আপনার। পরিবারস্থ আত্মীয় স্বজনেরা যেমন গৃহী ব্যক্তির দ্বিতীয় আপনি, পরমাত্মা তেমনি ভক্ত জীবাত্মার দ্বিতীয় আপনি। জীবাত্মা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের আছি, পরমাত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আছি—এই দুই আছি'র ঐক্যের ভিতরে সমস্ত আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য সম্ভুক্ত রহিয়াছে; আর, প্রত্যেক মনুষ্যের স্বাধীনতা বোধ সেই ঐক্যেরই অস্ফুট আভাস। এই অস্ফুট স্বাধীনতার ভাব, যাহা প্রত্যেক মনুষ্যের ভিতরে ভিতরে কার্য্য করিতেছে, তাহাই লৌকিক ধর্ম্মের ভিত্তিমূল; আর, তাহা যখন ভগবদ্‌ভক্ত সাধু ব্যক্তির মনোমধ্যে সুপরিস্ফুট আকার ধারণ করে, তখন তাহাই পারমার্থিক ধর্ম্মের ভিত্তিমূল এবং মুক্তির সোপান। লৌকিক ধর্ম্ম বলিতেছি কাহাকে? যে-ধর্ম্মের দৃষ্টি ফলাফলের রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার ঊর্দ্ধে ওঠে না, তাহারই নাম লৌকিক ধর্ম্ম। পারমার্থিক ধর্ম্ম বলিতেছি কাহাকে? যে-ধর্ম্মের দৃষ্টি ফলাফলের রাজ্য ছাড়াইয়া উঠিয়া নিষ্কাম-ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরের প্রতি নিবদ্ধ হয়, তাহারই নাম পারমার্থিক ধর্ম্ম। লৌকিক ধর্ম্মের গোড়া'র কথা হ'চ্চে মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ঈশ্বরেতে বিশ্বাস; এক কথায়—ঈশ্বরবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান। পারমার্থিক ধর্ম্মের গোড়া'র কথা হ'চ্চে—ঈশ্বরকে আপনার হইতেও আপনার বলিয়া জানা; এক কথায়—পরম-প্রীতিভক্তি-সহকৃত অপরোক্ষ জ্ঞান।

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রায়শই ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্ররূপে আলোচিত হইয়া থাকে, আর, সেই গতিকে ধর্ম্মতত্ত্ব এরূপ একটা গোড়া-নাই-আগা-রকমের ধরিতে-ছুঁতে-পাওয়া না-যাইবার কথা হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহা 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়' অর্থাৎ কাহারো কোনো উপকারে আসে না। আমাদের দেশে ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা-পদ্ধতি স্বতন্ত্র। আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে ভগবদ্‌ভক্তি এবং ধর্ম্মনীতির (piety এবং morality'র) হরগৌরীর ন্যায় যুগলাঙ্গভাবে অনুশীলিত হওনের প্রথা চির-প্রচলিত। বারান্তরে আমি দেখাইব যে, আমাদের দেশে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—

(১) সকাম ধর্ম্মতত্ত্ব এবং (২) নিষ্কাম ধর্ম্মতত্ত্ব; আর সেই সঙ্গে দেখাইব যে, সকাম ধর্ম্মের মূল স্বভাবসিদ্ধ ঈশ্বরেতে বিশ্বাস বা পরোক্ষ জ্ঞান; নিষ্কাম ধর্ম্মের মূল বিশিষ্টরূপ ঈশ্বর-ভক্তি এবং অপরোক্ষ জ্ঞান।

——

সংবাদ।

গত ২৩ বৈশাখ শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যার শুভ বিবাহ আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতি অনুসারে সমারোহে কাশীতে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কন্যার নাম শ্রীমতী শান্তা দেবী, পাত্রের নাম শ্রীমান্ প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিবাহে কয়েকটী বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা বিবাহসভায় বাদানুবাদের পর একবাক্যে স্থির করেন, আদি

ব্রাহ্মসমাজের বিবাহপদ্ধতি সম্পূর্ণ শাস্ত্রানুগত *। প্রজাপতি ঈশ্বর এই নব দম্পতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ বিধান করুন।

গত ১৫ই আষাঢ় জমিদারি বিরহামপুরের পুণ্যাহ সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব ব্রহ্মোপাসনা করেন। তিনি উপাসনার পর যে বক্তৃতা করেন, তাহার সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সম্বৎসরের শত সম্পদ্ বিপদ্ সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের ভিতর দিয়া আমরা অদ্য আবার নব পুণ্যাহে মিলিত হইয়াছি। পুণ্যাহ অর্থ পুণ্যদিন, যাঁহারা এই নামকরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাস্তবিকই দূরদর্শী; কেন না পুণ্যাহ-প্রথা রাজা প্রজার সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিবার উদ্দেশেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সে সম্পর্ক কল্যাণের সম্পর্ক—পবিত্র সম্পর্ক; রাজা প্রজার সেই সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্যাদি নূতনরূপে যে দিন উজ্জ্বল করিয়া দেয়—জাগাইয়া তোলে, সেই দিন বাস্তবিকই পুণ্যদিন।

প্রজার কল্যাণসাধন, অধীন দেশের সর্ব্বপ্রকার সাধ্যায়ত্ত অকল্যাণ ও অভাবমোচন, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন ইহা সংক্ষেপত রাজধর্ম্ম। রাজা স্বয়ং অধিকৃত বিস্তৃত ভূভাগের সমস্ত অংশ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারেন না; সুতরাং কর্ম্মনির্ব্বাহের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন, সেই প্রতিনিধির উপরেই অধিকাংশ কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত থাকে। অধিকারমদে মত্ত না হইয়া রাজার ইঙ্গিত ও অভিপ্রায় অনুসারে ধর্ম্মপথে থাকিয়া রাজ্যশাসন করাই প্রতিনিধিগণের কর্ত্তব্য। রাজভক্তি, সরলতা, সাধুভাব প্রজামণ্ডলীর হৃদয়ের সম্পত্তি; রাজকার্য্যের যথাসম্ভব সহায়তা প্রজাবর্গের অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা রাজ-প্রতিনিধি ও প্রজাবর্গের এই মঙ্গলভাব পাছে মলিন হইয়া যায়, সংসারের কুটিল গতিতে রাজাপ্রজার মধ্যে পাছে কোন প্রেমহীন কঠোর দুর্ভেদ্য যবনিকা পতিত হয়, এই আশঙ্কাতেই প্রতিবৎসর পুণ্যাহের অনুষ্ঠান।

রাজা এই দিনে সমবেত পুত্রস্থানীয় প্রজামণ্ডলীর ভক্তিপূর্ণ আবেগময় ভাব দেখিয়া সম্বৎসরের জন্য নূতন করিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত স্নেহময় কর্ত্তব্যজ্ঞানকে উজ্জ্বল করিয়া তোলেন, রাজপ্রতিনিধিগণ সমবেত শরণাগত প্রজার ক্ষমার যোগ্য অপরাধ বিস্মৃত হইয়া তাহাদের কল্যাণসাধনে মনোযোগী হন, প্রজাগণ অন্তরের দুর্ব্বুদ্ধি—কূট ষড়যন্ত্র—রাজার অনিষ্টচিন্তায় নিজেদের সর্ব্বনাশের চেষ্টাপ্রভৃতি সমস্ত অকল্যাণভাবের চিহ্নমাত্র বিলুপ্ত করিয়া এই শুভ দিনে বিনয়ে সুজনতায় রাজভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ করিয়া তোলে।

সাম্রাজ্য রাজ্য, জমিদারী একই শ্রেণীর বিষয়। জমিদারীও একটী বৃহৎ সংসার মাত্র। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংসার চালাইতে আমাদের কত শ্রম কত ক্লেশ কত কঠোর চেষ্টা করিতে হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে শান্তি সদ্ভাব ও সুশৃঙ্খলা রাখা কত সময় আমাদের অসাধ্য হইয়া

---

* কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোবিন্দপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অগ্রজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গদাধর শাস্ত্রী C. I. E. (অগ্নিহোত্রী) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন শাস্ত্রী পণ্ডিত শ্রীদীননাথ বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি ৮।৯ জন সুপণ্ডিত বিবাহস্থলে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের উপাচার্য্য পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয়ের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে কথোপকথনানন্তর তাঁহারা যজুর্ব্বেদের অংশবিশেষ আবৃত্তি করিয়া ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতা পরিদর্শনপূর্ব্বক সাহ্লাদে ও সসম্মানে বিবাহক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন।

চ, আর এই দিগন্তব্যাপী বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের শত শত গ্রামের সহস্র সহস্র গৃহের লক্ষ লক্ষ প্রজার প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিয়া এই সুবৃহৎ সংসার পরিচালন করা কত বড় শক্ত—কত বড় কঠোর কর্ম্ম! ক্ষুদ্র গৃহের তিন জনের মধ্যে মতের অনৈক্য হইলেই বিষম হইয়া দাঁড়ায়; কত গৃহে চিরকালের জন্য সুখ শান্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়; আর এই বৃহৎ সংসারের মধ্যে স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাতে যদি বিবাদের বহ্নি জ্বলিয়া উঠে, তবে তাহার দিগন্তব্যাপিশিখাস্পর্শে কত শত গৃহ ভস্ম হইয়া যায়, তাহার সংখ্যা কে করিতে পারে? কিন্তু যদি প্রজাগণের রাজভক্তি উজ্জ্বল থাকে, রাজার স্নেহ, রাজকরুণা যদি তাহাদের একান্ত লভ্য সামগ্রী হয়, তবে শত শত বিচ্ছেদ বিবাদ অনায়াসে বিদূরিত হইয়া যায়। এক অন্তর্নিহিত অকপট রাজভক্তি সমস্ত বিবাদানলের শান্তিজল, শত বিরোধের সমাধান, অনন্ত বিচ্ছেদের—শত খণ্ডতার ঐক্যসূত্র, বিচিত্র রকমের অমঙ্গল ও উপদ্রবের বিনাশমন্ত্র!

রাজভক্তি ও স্বদেশপ্রিয়তা একই কর্ম্মে প্রজাকে প্রণোদিত করে। সাধু রাজা রাজ্যের কল্যাণ কামনা করেন, সুতরাং স্বগৃহের স্বদেশের কল্যাণ চেষ্টা করিলে রাজারই প্রিয়কার্য্য করা হয়। রাজা যদি প্রজারঞ্জক হন, আর প্রজা যদি মিথ্যা বিদ্রোহপরায়ণ দুষ্টবুদ্ধি-চালিত না হয়, তবে সেই রাজ্যে—সেই দেশে—সেই দেশের প্রতি গৃহে নিত্যশান্তি—অচঞ্চল সম্পদ্-স্থির সৌভাগ্য বিরাজ করে। আজ জাপানের মঙ্গলভাবপূর্ণ অজেয় রাজশক্তি জাপানসাম্রাজ্যের অগণ্য প্রজার প্রাণপূর্ণ রাজভক্তি ও অসাধারণ স্বদেশপ্রিয়তার সহিত সম্মিলিত হইয়া বিশ্ববাসী সভ্য নর নারীকে স্তম্ভিত—মুগ্ধ—বিস্মিত করিয়া একতার সত্যতার সাক্ষ্য দান করিতেছে। রাজার স্নেহ প্রজার ভক্তি আকর্ষণ করে এবং প্রজার ভক্তি রাজার অন্তরে স্নেহরস সঞ্চারিত করিয়া দেয়। এই উভয়ের সম্মিলনে বাস্তবিকই অসাধ্য সাধন হয়।

সংসার অতি বিচিত্র স্থান, এখানে এমনও দেখা যায় অনেক রাজা দীন প্রজার শোণিতসম অর্থরাশি বিচিত্র ব্যসনে বিলাসে রাজসূয়ে মিথ্যা দম্ভপ্রচারে দিনে দিনে নূতন নূতন উপায়ে ছলে বলে শোষণ করিয়া অভাবগ্রস্ত লাঞ্ছিত দুঃখী প্রজার কাতরক্রন্দনে বিদ্রূপ এবং উপেক্ষা প্রদর্শন করেন; আজ সেই শোণিতশোষক সাম্রাজ্যাধিপতি বা জমিদারের জঘন্যকাহিনীর আলোচনা করিয়া আমরা পুণ্যশ্লোক পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষিদেবের জমিদারীর পুণ্যাহকে কলঙ্কিত করিব না। প্রায় দশ বৎসর হইল আমি মহর্ষি-পরিবারের মহত্ত্ব অনুভব করিবার সুযোগ বিশেষভাবে পাইয়াছি। আমার এই দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণরূপে ইহা বুঝিয়াছি ও প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে প্রজাগণ এমন ভূস্বামী লাভ করিয়াছে তাহারা ধন্য এবং যে কর্ম্মচারিগণ এমন মহদাশয়গণের পুণ্য আশ্রয় লাভ করিয়াছেন তাঁহারাও ধন্য। আমি আসা করি এই বিস্তৃত জমিদারীর প্রজামণ্ডলী আপনাকে আদর্শ ভূস্বামিলাভের সৌভাগ্য অনুভব করিবার অধিকারে বঞ্চিত নহে।

উপসংহারে আমি যে এই শুভ পুণ্যাহ উপলক্ষে সেই অষ্টাশীতিবর্ষীয় কর্ম্মযোগী ব্রহ্মপ্রাণ বিশ্বপ্রেমিক মহর্ষির পুণ্য আশীর্ব্বাদের মন্দাকিনী প্রজা এবং কর্ম্মচারীদের উদ্দেশে মস্তকে বহন করিয়া এখানে আনিয়াছি, তাহা এক্ষণে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে প্রবাহিত করিয়া দিয়া ধন্য হইতেছি।

সকলে ধর্ম্মে কর্ম্মে সাধুতায় সদ্ভাবে সত্যের পথে—কল্যাণের পথে অগ্রসর হউক, এই তাঁহার শুভ আশীর্ব্বাদ।

হে সর্ব্বমঙ্গলালয় করুণাময় প্রভো! এই পুণ্যাহ-উৎসবে তোমার প্রসাদবারি রাজা প্রজা ও রাজকর্ম্মচারী সকলেরই মস্তকে বর্ষিত হউক। হে বিশ্বনাথ! হে সংসার-মহাসাগরের ধ্রুবতারা! তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এখানকার সকলে যেন কল্যাণের পথে দিন দিন অগ্রসর হইতে পারে। তুমি যে মহাদৃষ্টান্ত—প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত এই ভূখণ্ডের উত্তরাধিকারী চালক ও প্রজাবর্গের সম্মুখে রাখিয়াছ তাহা যেন ব্যর্থ না হয়—তাহা যেন নিষ্ফল না হয়। তুমি সকলকে ব্যর্থতা হইতে, বিপদ্ হইতে, পাপ-বুদ্ধি হইতে, আলস্য হইতে, অমঙ্গল হইতে রক্ষা কর—তুমিই সকলকে রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

এই পুণ্যাহ উপলক্ষে উক্ত পরগণার প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসুর রচিত যে কএকটী গীত হইয়াছিল স্থানাভাবে তাহারএকটীমাত্র প্রকাশিত হইল।

বিঘ্ন বিপদ সম্পদ মাঝে।
থেকো সদা হরি আমার নিকটে॥
আমি অতি দীন ভক্তি জ্ঞানহীন।
হাতে ধরে মোরে নিও সাথে সাথে॥
পাপ প্রলোভন ফাঁদ পেতে আছে।
গ্রাসিবে আমারে একা পেলে॥
তাই বলি তোমারে যেওনা অন্তরে।
থেকো হে অন্তরে (দীন) হরিদাসের॥
ভবভয়ে শঙ্কিত তরঙ্গে কম্পিত।
ত্রিতাপে তাপিত আর্ত্তজনে॥
ভবভয় ভঞ্জন নিত্য নিরঞ্জন।
সত্য সনাতন রক্ষ দীনে॥

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের আদেশানুসারে কর্ম্মচারী নিয়োগ।

১৮২৬ শকের ১লা শ্রাবণ হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কার্য্য নির্ব্বাহার্থে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন।

আচার্য্য ও সভাপতি
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপাচার্য্য
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন
" " প্রিয়নাথ শাস্ত্রী
" " শিবধন বিদ্যার্ণব
" শম্ভুনাথ গড়গড়ি
" চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
" সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
" সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কর্ম্মাধ্যক্ষ ও ধনরক্ষক
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সহকারী সম্পাদক
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন
" শিবধন বিদ্যার্ণব

ট্রষ্টিগণ
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীজানকীনাথ ঘোষাল
শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর

Sermons of Maharshi Debendranath Tagore.

(Translated from Bengalee.)

SERMON XLV.

Righteousness and the Destiny of the Human Soul.

We can not form an adequate conception of the power of even this little finite human soul, how can we then gain knowledge of the infinite might of the Lord who is all-powerful ? How can we comprehend the glorious, birthless Spirit to accomplish whose purpose this vast universe ever traveleth in its path and to fulfill whose divine aim the earth and heavens are unitedly ever at work in harmony ? We can not fully grasp the nature of this little soul of ours—the finite soul that pervades my physical frame and which I know to be my self. If we can not fully comprehend it, how can we comprehend the infinite Brahma in His undivided self ? Reflect on the potency of this little soul of ours ; when it is in the womb it finds there the necessary materials and with these it begins to build up its form—the body. In its existence in that dark airless region, the soul needs not the sense of hearing, but unconsciusly does it there develop its auditory nerves, in accordance with the will of Him who knows that it will, in its career through earth, require the capacity of hearing. In the womb the soul needs not the aid of the nose but there by a slow process it is furnished with the nose; in the womb the soul wants not light, but there its material frame is adorned with eyes wherewith to behold things that light makes visible in this world. Whose is the law by which the soul, though remaining unconscious in the womb, builds up its body with all its limbs and organs ? It is by the command of the Supreme Spirit that the unformed, immature soul becomes in the womb the builder of its own handsome body. It seems as though the Infinite Ordainer of all that exists, sitting in the solitude of the womb, teaches the infant soul how to construct its material tenement. His wisdom, His art, His love and His will are all manifest even in the womb. Once every man was enveloped in the darkness of the womb, and was devoid of all knowledge ; then he was as a part of his mother's body and knew nothing of the glory of the Lord. Now when we reflect how the Lord's gracious hand protected us in the mother's womb, how marvellous does His goodness appear to us ? Not one or two persons, not even a hundred or thousand individuals but innumerable souls have been preserved and reared in the womb, and then coming into the world they have seen the sun, smelled the flower and heard the mother's words of affection and love. How wonderful ! Our physical senses, each of which is an avenue to pleasure, were created in the mother's womb. Now coming into the world, and nursed in your mother's milk, and having developed your teeth wherewith to eat your food for sustenance, and adorned with youth, ye are marching on the path of life, performing deeds of worth and beneficence, but as ye advance on the path of duty and good work, beware that ye may

not forget God. If ye are to perform the work of the Lord, how can ye forget Him who has sent you into this world? Ye will lose your right to the accomplishment of the work which God loveth if ye forget Him. Enshrine the Master in your heart and obey His commandments, love Him and do the works He loveth; He has given you youth, make your youth worthy of the duties of His world and thus glorify Him. Adorn yourselves with wisdom and righteousness, and earning money by righteous means maintain your parents, wife and children and render such services to your country as may prove beneficial to it. Youth is the most favorable period of life for doing good to your country; do not, therefore, yield to the temptation of indolence and fritter away this precious time of your sublunary existence. In your youth perform the works which God loveth and thus grow in righteousness. Invigorated in your youth with the vigour of righteousness, ye will be able in your old age to rise to God and to establish abiding union with Him and thus can ye easily make yourselves prepared for the moment of death. As when the child is about to born into the world, the fleshy bonds that bind it to the womb are slackened and get separated from it, so when the time for the separation of the soul from the body approaches, the knots of the body are loosened and the soul becomes fit to soar up to Heaven. Then there is weeping and lamentation here below, but there is rejoicing in the world of angels, in the kingdom of the loving Lord. How greatly does man, who is selfish by nature, rejoice when a son is born unto him! Then what a joyful festival must it be to the angels when they have to welcome a righteous soul to the kingdom they dwell in! With joyous congratutations some among them would then address others thus;—"Behold there comes to our hearts from earth an ennobled spirit that hath done righteousness; he will be one of us and worship with us the Holy of holies and there will be one more spirit added to us who have been glorifying the Lord." Lovingly do these angels welcome the newcomer from the earth and teach him to love God and do the works He loveth. When we ascend to the spirit world, we behold the doors of eternal salvation wide open for us; the innumerable proofs of the Divine Art visible in the universe proclaim to us the glory of God; the loving embrace of the holy angels in that kingdom of love generates a ceaseless flow of love; there it becomes possible for us to do righteousness with ease; and God's illimitable kingdom of goodness is rendered more brightly manifested by reason of the fact that knowledge and wisdom and love and righteousness are fully gratified there. We now obtain fore-glimpses of this state in our very soul. Resting on this hope, perform ye the works which God loveth. Be calm and serene, subjugate your passions, liberate yourselves from the infatuation of the world, acquire perfect patience, be rapt in divine meditation, and perceive as the fruit of all this the Supreme Spirit in your soul, and rousing up all the holy emotions of your heart, be ye all the companions and followers of the Lord. This is the vocation of our soul through eternity.

ষোড়শ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
১৭৩ সংখ্যা ভাদ্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৫। ১৮২৬ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২৬ শক, ২৬এ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার।

স্বাধীনতা।

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।

চিরদিনই এই কথা মনুষ্য বলিয়া আসিতেছে, স্বাধীনতা অমূল্য রত্ন। ইহাতেই প্রকৃত সুখ ও শান্তি এবং মনুষ্যের মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব। কিন্তু আমরা এখানে কত দূর স্বাধীন হইতে পারি, এবং কি প্রকার স্বাধীনতা আমাদের মঙ্গলকর, তাহা ধীর ভাবে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কোনরূপ দেশাচারসম্ভূত কৃত্রিম বা ক্লেশকর বাধা হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্যের স্বাভাবিক শক্তির পরিচালনার নাম স্বাধীনতা। ইহাই তাহার পক্ষে প্রকৃত শ্রেয়স্কর। কিন্তু ইহাকেই মঙ্গলের পরাকাষ্ঠা বলা যায় না। ইহাতে কেবল ক্লেশজনক বাধার অভাব মাত্র বুঝায়। ইহাকে জীবনের মুখ্য কার্য্য বলা যাইতে পারে না। কিন্তু কার্য্যসোপানের আরম্ভ স্থান বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ ইহা দ্বারা আমরা প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারি। ইহা মনুষ্যকে কার্য্য করিবার রঙ্গভূমিতে লইয়া যায়, কিন্তু কার্য্যের কোন্ অংশ তাহাকে অভিনয় করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দেয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে স্বাধীনতা কার্য্যসোপানের আরম্ভ স্থান, এই অত্যাবশ্যক স্থানের পরেই দেখা যায়, যে, মানবজীবনের কার্য্যনিচয় কেবল অগণ্য প্রতিবন্ধকের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আইন মাত্রেই স্বাধীনতার প্রতিকূল। যে আইন অবশ্যই মানিয়া চলিতে হইবে, তাহা প্রতিজনের নিজকৃত নহে। সমাজের মঙ্গলের জন্য তাহা অন্য লোকের সৃষ্ট। সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীকে বাধ্যতা শিক্ষা করিতেই হইবে। আমাদের সকল কার্য্যেরই একটা সীমা আছে; সকল কার্য্যের মূলেই বাধ্যতা নিহিত আছে। বাধ্যতা শিক্ষাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হ্যানিবলের চরিত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে তিনি হুকুম মানিতে ও হুকুম করিতে সমান রূপে নিপুণ ছিলেন। কারণ যে ব্যক্তি কেবল হুকুম করিতে অভ্যাস করিয়াছে, হুকুম দিবার যে একটা সীমা আছে তাঁহা সে কখন বুঝিতে পারে না। হ্যানিবল বাল্যকাল হইতে তাঁহার পিতা ও গুরুজনের

হুকুম নির্ব্বিচার চিত্তে বহন করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই, পরজীবনে উচ্চদরের হুকুমদাতা হইয়াছিলেন। অতএব অপরিপক্ব বয়সে সকলেরই বহুদর্শী গুরুজনের অধীন হইয়া তাঁহাদের ইঙ্গিত ধরিয়া চলা উচিত।

লর্ড বলিংব্রোককে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মহৎলোক হইবার উপায় কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, "বাধ্যতা শিক্ষা করা," দ্বিতীয় উপায়; "বাধ্যতা শিক্ষা করা," তৃতীয় উপায়; "বাধ্যতা শিক্ষা করা।" যে ব্যক্তি প্রকৃত বাধ্যতা শিক্ষা করিয়াছে, সে যথা কালে, যথা স্থানে, উপস্থিত হইয়া প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করে। প্রয়োজন হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। তাহাতে তাঁহার আনন্দ ভিন্ন নিরানন্দ নাই। যে ব্যক্তি প্রভুর বাধ্য নহে, সে বিশ্বাসঘাতক। এক অবাধ্যতার জন্য প্রভুর, গুরুজনের ও আপনার ঘোর অনিষ্ট হইয়া থাকে। ওয়াটারলুর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে নেপোলিয়ন সেনাপতি নেকে হুকুম দিলেন, তুমি আমার অগ্রে যাইয়া কোয়াটারব্রাস্ নামক স্থানটি সৈন্যসহ অধিকার করিয়া থাক; আমি শীঘ্র যাইতেছি। ঐ স্থান যে ব্যক্তি যুদ্ধের পূর্ব্বে অধিকার করিয়া থাকিবে, সেই জয়ী হইবে। সেনাপতি নে ঝড়বৃষ্টির মধ্য দিয়া ঐ স্থানের অনতিদূরে পঁহুছিয়া একজন চর পাঠাইয়া জানিলেন কোয়াটারব্রাসে শত্রুপক্ষ উপস্থিত হয় নাই; ইত্যবসরে নেপোলিয়নকে লিখিলেন আমি আপনার আদেশমত কার্য্য করিয়াছি। এদিকে ওয়েলিংটন চরমুখে সংবাদ পাইলেন নেপোলিয়ন্ নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। সেই মুহূর্ত্তেই তিনি ঘোর উৎসাহে সৈন্য সঙ্গে লইয়া ঐ কোয়ার্টারব্রাস্ দখল করিয়া লইলেন। ইহাতেই নেপোলিয়নের পরাজয় হইয়াছিল। এক অবাধ্যতাই এই পরাজয়ের মূল কারণ। রোমকেরা এই অবাধ্যতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। তাহারা তাহাদের সন্তান ও প্রজাদিগকে প্রাণপণে বাধ্যতা শিক্ষা দিত। রামচন্দ্র অরণ্য মধ্যে সীতাদেবীকে গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে বলিয়া কনক-মৃগ ধরিতে গিয়াছিলেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, এই রেখার বাহিরে কদাচ যাইও না। সীতা তাহার অন্যথা করাতেই রাবণের হস্তগত হইলেন, দুর্দ্দশার পরিসীমা রহিল না। আপনা অপেক্ষা জ্ঞানীগণের উপদেশ উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে গেলেই এই দশাই ঘটিয়া থাকে। আপনা অপেক্ষা জ্ঞানীগণের অধীনতাকে, অধীনতা মনে করা উচিত নহে। যাঁহারা বহুদর্শী লোকের অধীন হইয়া, সংসারে চলেন, মঙ্গল ভিন্ন, তাঁহাদের অমঙ্গল হয় না। ভীম অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবেরা আপনাদের অপেক্ষা জ্ঞানী যুধিষ্ঠিরের অধীন হইয়া চলিতেন বলিয়া তাঁহারা অলৌকিক কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পুত্র যদি পিতার অধীন না হয়, বাল্য ও যৌবনে তাঁহার উপদেশ না মানিয়া চলে, ছাত্র যদি সৎগুরুর অধীন না হয়, স্ত্রী যদি জ্ঞানী স্বামীর অধীন না হয়, মনুষ্য মাত্রেই যদি ঈশ্বরের অধীন না হয়, তাঁহার ধর্ম্মনিয়ম না মানিয়া চলে, তাঁহার দত্ত হিতাহিত জ্ঞানের বিপরীত পথে চলে, তবে সংসার এক ভয়াবহ শ্মশান হইয়া উঠে। কদাচ স্বেচ্ছাচারী হইবে না। স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচার যে স্বতন্ত্র জিনিস তাহা অবধারণ করিবে।

স্বাধীনতার বিরোধী হওয়া উচিত নহে। আপনাকে সর্ব্বতোভাবে পরপীড়ন হইতে রক্ষা করিবে। কে কখন প্রভুর কর্ণে কি কথা তুলিবে—কখন্ প্রভু বিতাড়িত করি-

বেন—অন্যায় কার্য্য করিতে আদেশ দিয়া তাড়না করিবেন, এই ভয়ে যে সর্ব্বক্ষণ ভীত তাহার জীবনে কি সুখ! যে খনন-কারীকে চিরজীবন খনির নিম্নে থাকিতে হয়, তাহার জীবন কি দুঃখের জীবন! কি ভারবহ জীবন! যে ভৃত্যকে সমুদ্রে ডুবিয়া প্রভুর জন্য মুক্তা তুলিতে হয় তাহার কি যন্ত্রণা! যে ভৃত্যকে প্রভুর ধর্ম্মবিরুদ্ধ আদেশে পরের মাথা কাটিতে হয়, তাহার কি আত্মগ্লানি।

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়
বল, কে বাঁচিতে চায়
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায়॥"

এই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভারতের মহাবীর পুরুরাজ এলেকজ্যাণ্ডারের সহিত প্রাণ-পণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যখন পরাজিত হইয়া এলেকজ্যাণ্ডারের নিকট আনীত হই-লেন, তখন এলেকজ্যাণ্ডার তাঁহাকে জি-জ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমার নিকট কি প্রকার ব্যবহার চান্। উত্তরে পুরুরাজ বলিলেন, রাজার ন্যায় ব্যবহৃত হইতে চাই; অর্থাৎ আমি স্বাধীন ভাবেই থা-কিতে চাই। স্বাধীনতার জন্য তাঁহার হৃদয়ের তেজ তখনও সমান ভাবে প্রজ্জ্ব-লিত রহিয়াছে। স্কটলণ্ডের মহাবীর ওয়া-লেস, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিয়া, বহুবার যুদ্ধ করিয়া, বহুবার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পরিশেষে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। রর্বাট ব্রুস প্রাণ-পণে যুদ্ধ করিয়া নিজ বলে ও ঈশ্বরের প্রসাদে ইংলণ্ডের অধীনতা হইতে স্কট-লণ্ডকে উদ্ধার করিলেন। ওয়াসিংটন ঘোর উৎসাহে নিজ সৈন্যগণকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিয়া ইংরাজের হস্ত হইতে এমেরিকাকে মুক্ত করিলেন। নিজ স্বাধী-নতা রক্ষার জন্য ইংলণ্ড জগতে অতুলনীয় ও পূজনীয়। কি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, কি জাতিগত স্বাধীনতা উভয়ই সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়।

সাংসারিক ভাবে স্বাধীনতা যদি আদর-ণীয় হয়, তবে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা কত না প্রার্থনীয়।

পাপ প্রবৃত্তির অধীন হওয়া কি অসীম যন্ত্রণা! মহাবীর এ্যাণ্টনী যে মুহূর্ত্তে ক্লিও-প্যাটরার রূপে মোহিত হইলেন, সেই ক্ষণ হইতেই তিনি বল বুদ্ধি ভরসা ও পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। পরিশেষে অমূল্য রত্ন স্বীয় প্রাণ অকালে হারাইলেন। হায়! তাঁহার আত্মহত্যা করিতে হইল! এলেকজ্যাণ্ডার সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া পানদোষের অধীন হইয়া স্বীয় ধাত্রী-পুত্রকে উন্মত্ত অবস্থায় হত্যা করিয়া পাপের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। কাম ক্রোধ লোভ দ্বেষ হিংসা পরশ্রীকাতরতার অধীন হইয়া, কত লোকে আত্মঘাতী হই-য়াছে। অতএব সকল প্রকার অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত মনুষ্যের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শৃঙ্খলবদ্ধ কারাবাসীর সহিত একবার মুক্ত পুরুষের তুলনা কর। পিঞ্জর-রুদ্ধ পক্ষীর সহিত গগনবিহারী বিহঙ্গের অবস্থার পর্য্যালোচনা কর। তাহা হইলেই স্বাধীনতা ও অধীনতার প্রভেদ বুঝিতে পারিবে।

হে দেব! তুমি আমাদিগকে ধর্ম্মা-নুমোদিত বাধ্যতা শিক্ষা দাও। দুষ্ট লোক ও দুষ্প্রবৃত্তির অধীনতা হইতে মুক্ত কর। স্বেচ্ছাচার ও স্বাধীনতার প্রভেদ বুঝিতে শক্তি দাও। আমাদিগকে তোমার প্রেমের অধীন কর। তোমার ধর্ম্ম নিয়মের অধীন কর। প্রকৃত সংযম শিক্ষা দাও। আমা-দের আত্মাকে তোমার অনন্ত ভালবাসার আকাশে সঞ্চরণ. করিতে শিক্ষা দাও।

আমাদের শোকাশ্রু তোমার কোমল হস্তে মার্জ্জনা কর। ব্রহ্মানন্দের মুক্ত বায়ুতে আমাদিগকে রক্ষা কর। এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সার সত্যের আলোচনা।

শক্তি-ঘটিত এবং জ্ঞান-ঘটিত ঐক্য।

গতবারের আলোচনায় আছি'র সহিত আছি'র ঐক্যের কথা যাহা বলা হইয়াছিল, তাহা সত্তা-ঘটিত ঐক্য। এখন দেখিতে হইবে এই যে, সেই সত্তা-ঘটিত ঐক্যের ভিতরে আর-দুইপ্রকার ঐক্য সম্ভুক্ত রহিয়াছে;—একটি হ'চ্চে শক্তি-ঘটিত ঐক্য; আর-একটি হ'চ্চে জ্ঞান-ঘটিত ঐক্য।

শক্তি-ঘটিত ঐক্য কি?—না কর্ত্তা-কর্ম্মের ঐক্য। জ্ঞান-ঘটিত ঐক্য কি?—না, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের ঐক্য। আমি এবং তুমি উভয়ে যখন সম্মুখাসম্মুখি দণ্ডায়মান থাকিয়া পরস্পরের চক্ষুর উপরে কার্য্য করিতেছি, তখন আমার কার্য্যের তুমি কর্ম্মক্ষেত্র, এবং তোমার কার্য্যের তুমি কর্ত্তা; তথৈব তোমার কার্য্যের আমি কর্ম্মক্ষেত্র, এবং আমার কার্য্যের আমি কর্ত্তা। এরূপ অবস্থায় তুমিও যেমন, আমিও তেমনি, উভয়েই কর্ত্তা এবং কর্ম্ম দুইই একাধারে। ইহারই নাম কর্ত্তাকর্ম্মের ঐক্য। তেমনি আবার, তোমার জ্ঞানের তুমি জ্ঞাতা, আমি জ্ঞেয়; আমার জ্ঞানের আমি জ্ঞাতা, তুমি জ্ঞেয়। উভয়েই আমরা জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় দুইই একাধারে। ইহারই নাম জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের ঐক্য।

উভয়াত্মক ঐক্যের সুস্পষ্টরূপে ঠিকানা নির্দ্দেশ করিবার জন্য দুই আমিকে দুই দিক্ হইতে যোটপাট করিয়া আনিয়া মুখামুখি দাঁড় করানো হইল। কিন্তু দুই আমিকে দুই দিক্ হইতে ডাকিয়া আনা বাড়া'র ভাগ;—এক আমি'র ভিতরেই আমি এবং তুমি, এই দুই আমি মুখামুখি দণ্ডায়মান, আর, সেই সঙ্গে দোঁহার মধ্যে শক্তি-ঘটিত এবং জ্ঞান-ঘটিত ঐক্য সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। তার সাক্ষী—রামপ্রসাদের এই একটি গীত:—

> "মন তুমি কৃষি-কাজ জান না।
> এমন মানব-জমিন্ রৈল প'ড়ে,
> আবাদ ক'ল্লে ফ'লতো সোণা।"

এখানে এক আমি'র ভিতরে দুই আমি'র অর্থাৎ আমি এবং তুমি'র দোঁহার সহিত দোঁহার বোঝাপড়া চলিতেছে।

কর্ত্তাকর্ম্মের ঐক্য।

মনে কর, একজন গায়ক গান করিতেছে। গাওনা হ'চ্চে একটি ক্রিয়া, তাহার মূল হ'চ্চে গায়ক স্বয়ং এবং তাহার ফল হ'চ্চে গীতধ্বনি। এইরূপ যে মূল এবং ফল, কর্ত্তা এবং কর্ম্ম, দুয়ের ঐক্য ব্যতিরেকে গাওনা-ক্রিয়া চলিতে পারে না। গাওনা-ক্রিয়ার বীজ গায়কের কণ্ঠনলীর পথ দিয়া অঙ্কুরিত হয়, এবং গাওনা-ক্রিয়ার ফল গায়কের শ্রবণেন্দ্রিয়ের পথ দিয়া ফলিত হয়। দুই পথই উন্মুক্ত থাকা চাই, তবেই গাওনা-ক্রিয়া চলিতে পারে। যদি গায়কের শ্রবণদ্বারে কপাট পড়িয়া যায়, তাহা হইলেও যেমন; আর যদি কণ্ঠনলীতে কপাট পড়িয়া যায়, তাহা হইলেও তেমনি; দুয়ের একটিতে কপাট পড়িলেই গাওনা ক্রিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়। এখন জিজ্ঞাস্য এই—কোন্‌খানেই বা গাওনা-ক্রিয়ার বীজাধান হইয়াছে, আর, কোন্‌খানেই বা গাওনা-ক্রিয়ার ফলাধান হইতেছে? স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, গায়কের অন্তঃকরণেই গাওনা-ক্রিয়ার বীজ রোপিত

হইয়াছে, গায়কের অন্তঃকরণ হইতেই গাওনা-ক্রিয়ার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, গায়কের অন্তঃকরণেই গাওনা-ক্রিয়ার ফল ফলিত হইতেছে। একই অন্তঃকরণ ক্ষেত্রে কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ম্মের ফল একযোগে অভিব্যক্ত হইয়া একীভূত হইয়া যাইতেছে; আর, সেই কারণে গায়কের মনে দুইভাবের আনন্দ গঙ্গাযমুনার ন্যায় দুই দিক্ হইতে আসিয়া দুয়ে মিলিয়া এক আনন্দে পরিণত হইতেছে; এক ভাবের আনন্দ হ'চ্চে কর্ম্মানন্দ, আর-এক ভাবের আনন্দ হ'চ্চে ভোগানন্দ। কর্ম্মানন্দের সাক্ষাৎ কারণ হ'চ্চে কর্ত্তার কর্ত্তৃত্বস্ফূর্ত্তি, ভোগানন্দের সাক্ষাৎ কারণ হ'চ্চে কর্ম্মের ফলাস্বাদন। গীতধ্বনির উৎসারণে কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, গীতধ্বনির রসাস্বাদনে কর্ম্মের ফল ফলিত হইতেছে। গায়কের অন্তঃকরণে গাওনা ক্রিয়ার বীজ এবং ফল (কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ম্মের ফল) একীভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মানন্দ এবং ভোগানন্দ একীভূত হইয়া যোগানন্দে পরিণত হইতেছে। বলিলাম "যোগানন্দ"! তাহার অর্থ আর-কিছু না—কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব-স্ফূর্ত্তি এবং কর্ম্মের ফলভোগ, এই দুয়ের যোগজনিত আনন্দ। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, গায়ক যখন মশ্‌গুল্ হইয়া গান করে, তখন গাওনা-ক্রিয়ার কর্ত্তা যিনি গায়ক, এবং গাওনা-ক্রিয়ার কর্ম্ম যে গীতধ্বনি, দুয়ের মধ্যে ব্যবধান বিলুপ্ত হইয়া গিয়া দুয়ে মিলিয়া এক হইয়া যায়। এমন কি, তেমন একজন প্রতিভাশালী গায়ক যখন চতুর্দ্দিকের শ্রোতৃমণ্ডলীর সহিত একাত্মা হইয়া গান করেন, তখন শ্রোতৃমণ্ডলী মনে মনে তাঁহার সহিত গানকার্য্যে যোগ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না; আর, তাহাতে রঙ্গশালা দেখিতে ঢাখায় এইরূপ—যেন সমস্ত মণ্ডলী একই গায়ক এবং একই শ্রোতা, এবং প্রত্যেক শ্রোতা যেন সমস্ত মণ্ডলী একাধারে। এরূপ মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায় এক গায়ক একশত শ্রোতার সঙ্গে মিলিয়া একা একশত হইয়া আপনার গানের আপনি রসাস্বাদন করে, এবং একশত শ্রোতা এক গায়কের সঙ্গে মনে মনে গানে যোগ দিয়া এক গায়ক হইয়া উঠে; কাচপোকার প্রভাবে আর্সলা যেমন কাচপোকা হইয়া উঠে, একের প্রভাবে অনেকে তেমনি এক হইয়া উঠে। কর্ত্তা-কর্ম্মের মধ্যে এ যেমন দেখিতে পাওয়া গেল—জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের মধ্যেও উভয়াত্মক ঐক্যের স্ফূর্ত্তি ঠিক্ সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়।

জ্ঞাতা-জ্ঞানের ঐক্য।

গায়ক যখন গান করিতেছে, প্রবৃত্ত গায়ক জানিতেছে যে, আমিই গান করিতেছি। এরূপ স্থলে গায়ক কাহাকে গায়ক বলিয়া জানিতেছে? জ্ঞেয় কে? গায়ক আপনাকেই গায়ক বলিয়া জানিতেছে—গায়ক আপনিই জ্ঞেয়। কে আপনাকে গায়ক বলিয়া জানিতেছে—জ্ঞাতা কে? গায়ক আপনিই জ্ঞাতা। তা ছাড়া গায়ক যখন গীতরসের বিদ্যুৎপ্রবাহে শ্রোতৃমণ্ডলীর মনকে গলাইয়া আপনার মনের সহিত একীভূত করিয়া ফ্যালে, তখন গায়কের জ্ঞানে আপনি এবং আপনার শ্রোতৃমণ্ডলী এ দুয়ের মধ্যস্থিত প্রভেদের প্রাচীর ভগ্ন হইয়া গিয়া জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের উভয়াত্মক ঐক্য সমস্ত ঘরময় ব্যাপিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এইরূপ যখন উভয়াত্মক ঐক্য স্ফূর্ত্তি পায়—কর্ত্তা-কর্ম্মের মধ্যে স্ফূর্ত্তি পায়—জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের মধ্যে স্ফূর্ত্তি পায়, তখন সে ঐক্য কি অকস্মাৎ আকাশ হইতে নিপতিত হয়, অথবা যাহা ইতিপূর্ব্বে প্রসুপ্ত ছিল, তাহাই জাগ্রত হইয়া উঠে?

বারান্তরে এ প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

এপিক্‌টেটসের উপদেশ।

ভয় ও অভয়।

১। "কোন ব্যক্তি ভীরু ও নির্ভীক একসঙ্গে উভয়ই হইতে পারে"—তত্ত্বজ্ঞানীদের এই কথাটি কাহারও-কাহারও নিকট পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্তি বলিয়া মনে হয়। ভাল, একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক্, ইহা আমাদের পক্ষে সম্ভব কি না। ইহা সহজেই মনে হয় বটে, যেহেতু ভয় নির্ভীকতার বিপরীত, অতএব এই দুইটি পরস্পর বিরোধী ভাব কখনই এক সঙ্গে থাকিতে পারে না। কিন্তু অনেকেরই নিকট যাহা পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, আমি তাহা এইরূপ ভাবে দেখি :—

ইতিপূর্ব্বে অনেকবার প্রতিপাদিত হইয়াছে—যে সকল বিষয় আমাদের ইচ্ছাধীন ও সাধ্যায়ত্ত তাহারই উপযুক্ত প্রয়োগের উপর আমাদের ভাল-মন্দ, নির্ভর করে, যাহা আমাদের ইচ্ছাধীন ও সাধ্যায়ত্ত নহে—যাহা অনিবার্য্য—যাহা দুরতিক্রম্য, তাহা আমাদের পক্ষে ভালও নহে, মন্দও নহে"। উক্ত কথাটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে যদি কোন তত্ত্বজ্ঞানী আরও এই কথা বলেন ;—"যে সকল বিষয় আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, সেই সকল বিষয়ে নির্ভীক হইবে এবং যে সকল বিষয় আমাদের ইচ্ছাধীন, সেই সকল বিষয়েই ভয় করিবে"—এই কথায় অসঙ্গতি কি-আছে ? যদি মন্দ ইচ্ছার উপরেই আমাদের মন্দ নির্ভর করে, তাহা হইলে শুধু সেই বিষয়েই আমাদের ভীত হওয়া উচিত ; এবং যাহা আমাদিগের ইচ্ছাধীন ও সাধ্যায়ত্ত নহে, সেই বিষয়েই আমাদিগের নির্ভীক হওয়া কর্ত্তব্য। শুধু তাহা নহে, এই স্থলে আমরা ভয়ের ভাব হইতেই সাহস অর্জ্জন করিয়া থাকি ; যাহা বাস্তবিক মন্দ তাহা করিতে আমরা ভয় পাই বলিয়াই, যাহা মন্দ নহে তাহাতে আমরা নির্ভয় হই।

২। আমরা কিন্তু ইহার বিপরীতে, হরিণের ন্যায় অনর্থক ত্রস্ত হইয়া বিপদগ্রাসে পতিত হই। হরিণেরা যখন ভয় পায় এবং ভয় পাইয়া পলাইবার চেষ্টা করে, তখন তাহারা নিরাপদ স্থান মনে করিয়া কোথায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে ?—ব্যাধ যে-জাল পাতিয়া রাখিয়াছে সেই জালের মধ্যে। এইরূপেই তাহারা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। কারণ, তাহারা জানে না,—কোন্ স্থলে ভয় করিতে হয়, কোন স্থলে নির্ভয় হইতে হয়। আমরা না বুঝিয়া সচরাচর কোন্ বিষয়ে ভয় পাইয়া থাকি ?—না, যে বিষয়টি আমাদের ইচ্ছা-শক্তির অতীত। আর বিপদের সম্ভাবনা নাই মনে করিয়া কোন্ বিষয়ে আমরা নির্ভয় হই ?—না, যে বিষয় আমাদের ইচ্ছার অধীন। কোন প্রলোভনে মুগ্ধ ও বিড়ম্বিত হওয়া, কোন অবিবেচনার কাজ কিম্বা লজ্জাজনক গর্হিত কাজ করা, অথবা নীচ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কোন বস্তুর অনুসরণ করা—এ সমস্ত প্রকৃত ভয়ের বিষয় কি না সে-পক্ষে আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না। যাহা আমাদের ইচ্ছা-শক্তির অতীত, সেই বিষয়েই আমাদের যত কিছু ভয়।

যে মৃত্যু অপরিহার্য্য, যে সকল দুঃখ দুরতিক্রমণীয়, তাহা হইতেই আমরা ভয় পাই, ভয় পাইয়া পলায়নের চেষ্টা করি। আমাদের স্বাভাবিক সাহসকে আমরা

অস্থানে নিয়োগ করিয়া, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শূন্য হইয়া, অতি নির্লজ্জভাবে সম্পূর্ণরূপে পাপের হস্তে আত্মসমর্পণ করি এবং আমাদের স্বাভাবিক লজ্জাভয়কে অস্থানে নিয়োগ করিয়া, উহাকে ভীরুতা, নীচতা, অন্ধ-আতঙ্ক, ও দুঃখ কাতরতায় পরিণত করি। যদি আমাদের ভয়ের ভাবকে ইচ্ছা রাজ্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের ভয়ের বিষয়কে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিহারও করিতে পারি। কিন্তু যে বিষয় আমাদের ইচ্ছায়ত্ত নহে, তাহাতে ভয় পাইলে, আমরা ইচ্ছা করিলেও পরিহার করিতে পারি না। সুতরাং বৃথা ভয়ে বিচলিত হইয়া অনর্থক কষ্ট পাই।

কেন না, মৃত্যুও ভয়ঙ্কর নহে, দুঃখও ভয়ঙ্কর নহে, পরন্তু দুঃখ ও মৃত্যুর ভয়ই ভয়ঙ্কর। এই নিমিত্ত আমরা সেই কবিকে প্রশংসা করি যিনি বলিয়াছিলেন :—

"মরিতে কোরো না ভয়, কেবল করিও ভয় ভীরুর মরণে"।

৩। অতএব মৃত্যুকে ভয় না করিয়া মৃত্যুভয়কেই ভয় করা উচিত। কিন্তু আমরা ইহার ঠিক্ বিপরীত আচরণ করি। মৃত্যু হইতে আমরা পলায়ন করি, কিন্তু মৃত্যুটা যে কি জিনিস সে বিষয় একটুও বিবেচনা করিয়া দেখি না ;—সে বিষয়ে আমরা একেবারেই উদাসীন। সক্রেটিস্ এই জিনিস্‌গুলাকে "জুজু" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তিনি ঠিক্ কথাই বলিয়াছেন। কেননা, কদাকার মুখস্‌গুলা, অবোধ শিশুদিগের নিকটেই ভীষণ ও ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হয় ; এই "জুজু" দেখিয়া শিশুরা যেরূপ ভয় পায়, আমরাও ঠিক্ সেইরূপ সংসারের কোন কোন ঘটনায় ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়ি।

শিশু কি ?—শিশু মূর্ত্তিমান অজ্ঞানেরই নামান্তর মাত্র। যে কিছুই শিক্ষা করে নাই, সেই শিশু। কেন না, শিশু যদি শিক্ষিত হয় অভিজ্ঞ হয়, তাহা হইলে সে আর শিশু থাকে না, তখন সে আমাদেরই সমকক্ষ। মৃত্যু কি ?—মৃত্যু একটা "জুজু"। উহাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখ—পরীক্ষা করিয়া দেখ, উহা তোমাকে কামড়ায় কি না দেখ। শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক, এক সময়ে এই শরীর আত্মা হইতে বিযুক্ত হইবে ;—পূর্ব্বেও হইয়াছিল। এখনই যদি বিযুক্ত হয়, তাহাতে তোমার এত রাগ কেন? কেন না, এখন যদিও না হয়, কিছুকাল পরে তো হইবেই। আচ্ছা এইরূপ বিযুক্ত হইবার কারণটা কি ?—উদ্দেশ্য কি ?—কাল-চক্রের ভ্রমণকাল যাহাতে সম্পূর্ণ হয়, —এই উদ্দেশ্য। কেননা,—বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, অতীত এই তিনই জগতের পক্ষে আবশ্যক।

দুঃখ কি ?—দুঃখও একটা "জুজু"! উহাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখ, পরীক্ষা করিয়া দেখ। এই শরীর-বেচারাকে কখন মৃদুভাবে, কখন কঠোরভাবে প্রকৃতি এক-একবার নাড়াইয়া ঝাঁকাইয়া দেন। যদি ইহাতে কোন ফল না পাও, দ্বার তো খোলাই আছে। যদি ফল আছে বোধ কর, তবে সহ্য করিয়া থাক। সব সময়েই দরজাটা খোলা রাখাই ভাল, তাহা হইলে আর কোন কষ্ট পাইতে হয় না।

৪। তবে কি, আমার অস্তিত্ব থাকিবে না ?—অবশ্যই থাকিবে, কিন্তু বিশ্বের প্রয়োজন অনুসারে রূপান্তরে থাকিবে। তুমি নিজে আপনার সময়-অনুসারে এই পৃথিবীতে আইসো নাই ; বিশ্বের যখন প্রয়োজন হইল তখনই তুমি আসিয়াছ।

৫। এই মতটি অনুসরণ করিলে কি ফল লাভ হইবে? যাঁহারা প্রকৃত শিক্ষা

লাভ করিয়াছেন—তাঁহাদের নিকট যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও উপাদেয়—সেই শান্তি সেই অভয়, সেই স্বাধীনতারূপ ফললাভ হইবে। সাধারণ লোকের ধারণা,—যাহারা দাস-শ্রেণীর অন্তর্গত নহে,—যাহারা স্বাধীন, কেবল তাহাদিগকেই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, যাহারা সুশিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহারাই কেবল স্বাধীন। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই ঃ— নিজের ইচ্ছা-অনুসারে থাকিতে পারা; কাজ করিতে পারা—ইহা-ভিন্ন স্বাধীনতার কি আর কোন অর্থ আছে? না, আর কোন অর্থই নাই। আচ্ছা তবে পাপ কার্য্যে রত থাকাই কি তোমাদের ইচ্ছা? না, আমাদের সে ইচ্ছা নয়।

তাই বলিতেছি, তাহারা কখনই স্বাধীন নহে যাহারা ভয়-বিহ্বল, শোক-কাতর, অথবা উদ্বিগ্ন-চিত্ত। তাহারাই প্রকৃত স্বাধীন যাহারা দুঃখ শোক, ভয় উদ্বেগ পাপ-তাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে।

চিন্তার প্রভাব।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

আমাদের জীবনের প্রত্যেক বিভাগে প্রত্যেক অন্তরেতে এবং সংসারের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এই চিন্তাশক্তির প্রাদুর্ভাব ও কার্য্য দেখিতে পাই। চিন্তাই আমাদিগকে সকল মূল্যবান সামগ্রীর উত্তরাধিকারী করিয়াছে। গৃহসামগ্রী সকল ভাষা সাহিত্য বিজ্ঞান কাব্য ধর্ম্মনীতি সকলই চিন্তাপ্রসূত। এই সকল হইতে আমরা সুখ ও সচ্ছন্দতা লাভ করি। মানচিত্র ও দিকদর্শন যন্ত্রবিহীন কোনো পোত রজনীর ঘোর অন্ধকারের মধ্যে প্রবল বাত্যা ঝঞ্ঝাবাত ও সাগরের উত্তাল তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে তাহার দশা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। কোন্ দিকে সে যায় তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। কিন্তু এই দিকদর্শন যন্ত্র তাহাকে উত্তর দিক সর্ব্বদাই দেখাইয়া দিতেছে। অতি সামান্য সূক্ষ্ম লৌহ শলাকা এই ঘোর অন্ধকারে তাহার পথ প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছে। চিন্তাই ইহার জন্ম দিয়াছে। মুশার যাদুদণ্ড পর্ব্বত হইতে অরণ্যে জলস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। বরতন্তুর শিষ্য কৌৎস্য যখন চতুর্দ্দশ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা গুরুদক্ষিণার্থে রঘুর নিকট যাচ্ঞা করিয়া ছিলেন, রঘু তখন সর্ব্বস্ব দান করিয়া রিক্ত-হস্ত হইয়া বসিয়াছেন কিন্তু প্রার্থী ব্রাহ্মণ ফিরিষা যাইলে অযশ ঘোষণা হইবে এই ভাবিয়া দুই দিবস তাঁহাকে তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করিতে বলিলেন। পরে কুবেরের ধনাগার হইতে ধন সঞ্চয় করিবার উদ্দেশে সৈন্য সামন্ত লইয়া প্রাতে যুদ্ধযাত্রায় উদ্যত হইলেন। কোষাধ্যক্ষ সংবাদ দিলেন যে আকাশ হইতে ধন আসিয়া তাঁহার ধনাগার পরিপূর্ণ করিয়াছে। যিশু পাঁচটি মৎস্য এবং কয়েক খানি রুটির দ্বারা কয়েক সহস্র লোককে পরিতৃপ্ত রূপে ভোজন করাইয়া ছিলেন কিন্তু এই সকল অলৌকিক ক্রিয়া অপেক্ষা চিন্তাশক্তি আরও অধিকতর আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছে ও করিতে পারে।

অমর ফ্রাঙ্কলিন বোষ্টননগরের একটি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। সক্রেটিস্ সামান্য পদাতিক সৈন্য ছিলেন। ইহাঁরা প্রত্যেকেই শিক্ষালাভের উপযুক্ত সুযোগ পান নাই। কিন্তু মৌলিক স্বাধীন চিন্তার বলেই ইহাঁরা অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। চিন্তাই লোককে চিরস্থায়ী শক্তি দিতে পারে ও যশোভাগী করিতে পারে।

চিন্তাই ইচ্ছাকে শক্তি প্রদান করে। কোন বিষয়ে প্রগাঢ় ঘনীভূত একাগ্র চিন্তা ইচ্ছাকে অজেয় স্থায়ী শক্তি দিয়া থাকে। স্কটের ৫৬ বৎসরে পদার্পণ কালে এক সহস্র পাউণ্ডেরও অধিক ঋণ ছিল, তিনি চিন্তাশক্তির চালনা করিয়াই এই ঋণ জীবদ্দশাতেই পরিশোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিন বৎসরের মধ্যে তিনি ৩০টী উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার চিকিৎসক এবারকৃম্বি তাঁহাকে এই কঠোর পরিশ্রম হইতে বিরত হইতে বলিয়াছিলেন তিনি উত্তরে তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন—পাচিকা জ্বলন্ত উননের উপর জলের হাঁড়ি বসাইলে যদি আপনি জলকে বলেন তুমি ফুটিও না, সে কি আপনার কথা শুনে? আমার সমগ্র মানসিক শক্তি কার্য্যে প্রয়োগ করিয়াছি, এখন ইহা আমার শরীর ও আত্মা ধ্বংশ প্রাপ্ত হইলেও উহাদের উপর প্রভুত্ব করিবেই। চিন্তাশক্তি মনের একাগ্রতা আনয়ন করে। আমরা শতরঞ্চি ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত লোকের অবস্থা অবগত আছি, একজনের পুত্রকে সর্প দংশন করিয়াছে সংবাদ দেওয়ায় উত্তরে সে বলিল কাহার সর্প। সেইরূপ আর্কিমিডিস একদা গণিতশাস্ত্রের কোন বিষয়ে এমনি চিন্তায় মগ্ন ছিলেন যে তাঁহার দেশ শত্রুরা আসিয়া আক্রমণ করিলেও তিনি জানিতে পারেন নাই। তাঁহার নাম পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করাতে কোন উত্তর দিতে পারেন নাই, সেই অপরাধে তাঁহাকে ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল।

পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম, এক কাল অপর কালের ধ্বংশের উপরই বৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করিতেছে। চিন্তাই জগতের ঘোর বিপ্লব আনয়ন করিতেছে। মনুষ্যের কার্য্যোপযোগী কত যন্ত্রের কত পরিবর্ত্তন হইয়া ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। চিন্তাই এক রাজ্য জয় করিয়া অপরকে আক্রমণ করিতেছে। কোন একটী মহৎ প্রজ্জ্বলিত চিন্তা একটী নির্জ্জনবাসী অজ্ঞাত ব্যক্তির মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইলেও উহা সমগ্র দেশকে প্রখর সূর্য্যের ন্যায় আলোকিত করে অথবা প্রবল ভূমিকম্পের ন্যায় উহার মধ্যস্থল আলোড়িত করিয়া দেয়। এই চিন্তা মনুষ্যকে বংশপরম্পরা উন্নত-চরিত্র দিয়া যায়। কত অজাত কোটি কোটি লোকের ভাগ্য পূর্ব্বহইতেই স্থির করিয়া থাকে। ইহারা কত ধর্ম্মমত কত নিয়মতন্ত্র প্রণালীকে নষ্ট করে এবং অতীত কালের প্রোথিত স্তম্ভ সকলকে আলোড়িত করিয়া তোলে। ষোড়শ শতাব্দীতে লুথারের মত খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে কি না বিপর্য্যয় ও সংস্কার আনয়ন করিয়াছে। কোন লেখক বলিয়াছেন;—ঈশ্বর কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিকে কোন গ্রহ কিম্বা নক্ষত্রে ছাড়িয়া দিলে আর নিস্তার থাকে না। প্রতিভাশালী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি অনেক সৈনিক দল ও সৈন্যাধ্যক্ষকে ও জয়শালী ব্যক্তিদিগকে জয় করিতে সক্ষম হয়। চিন্তা যে কেবল বিদ্বান ও বিখ্যাত ব্যক্তিগণের একাধিপত্যে থাকে তাহা নহে। যে সকল ব্যক্তি উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারা অতি হীন ও অজ্ঞাত অবস্থা হইতে অবিশ্রাম চিন্তার দ্বারাই সিদ্ধকাম হইয়াছেন। মহাকবি সেক্সপিয়র যিনি দুই শতাব্দী ধরিয়া মানব-মনকে মোহিত করিয়া আসিতেছেন তাঁহার জীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস সকলেই বিদিত আছেন। যৌবন কালে তিনি গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া লণ্ডন মহানগরীর নাট্যশালার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া ভদ্রলোকদিগের

ঘোটক ধরিয়া থাকিতেন। উহাই তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায় ছিল।

ক্রমশঃ।

ব্রহ্মসংস্থ পরিব্রাট্।

প্রাচীনকালে ব্রহ্মসংস্থ পরিব্রাট্ হওয়া কি কঠিন ব্যাপার ছিল সেইটী প্রদর্শন করিবার জন্য নিম্নোক্ত মন্ত্র ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বলা বাহুল্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য আমাদের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু ভাষ্যকার ব্যাখ্যাস্থলে অদ্বৈত মতকেই মূল ভূমি করিয়াছেন। পূর্ব্বে পরিব্রাট্ কে হইতে পারিতেন সেইটুকু দেখানই এস্থলে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুতরাং মতবাদে অনৈক্য থাকিলেও শাঙ্করভাষ্যই অবলম্বন করিলাম। আরও একটু হেতু আছে। শঙ্কর কর্ম্মবিরোধী। তাঁহার মত এই যে, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মসাপেক্ষ নহে। জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের চিরবিরোধ। তিনি কিরূপে এই কর্ম্মনিরাসে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা দেখানও আমাদের অন্যতর উদ্দেশ্য। পাঠকেরা দেখিবেন কর্ম্মত্যাগ না করিলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিতে পারে না ইহা প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত ও বেদপ্রমাণসিদ্ধ। সেই জন্যই নিম্নোক্ত মন্ত্রব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ত্রয়োধর্ম্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি। প্রথমস্তপএব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলে অবসাদন্ সর্ব্ব এবৈতে পুণ্যলোকা ভবন্তি ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি। ছান্দোগ্য।

ধর্ম্মের তিনটী বিভাগ—যজ্ঞ, নিয়মের সহিত বেদাভ্যাস ও দান। এই হইল এক বিভাগ। এই বিভাগের গৃহস্থই অধিকারী। দ্বিতীয় বিভাগ,তপ। ইহার অধিকারী তাপস অথবা আশ্রমধর্ম্মমাত্রে অবস্থিত পরিব্রাট্ কিন্তু ব্রহ্মসংস্থ নহেন। আর তৃতীয় বিভাগের অধিকারী ব্রহ্মচারী। তিনি আচার্য্যকুলবাসী হইয়া নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক যাবজ্জীবন আচার্য্যকুলেই অবস্থান করিবেন তাঁহার পক্ষে ইহাই বিধি। এস্থলে ব্রহ্মচারী বলিতে নৈষ্ঠিকেরই গ্রহণ হইয়াছে। এই তিন আশ্রমী যথোক্ত ধর্ম্মাচরণ দ্বারা পুণ্যলোক লাভ করিয়া থাকেন। বলিতে পার, আশ্রমীদিগেরই যখন কথা হইতেছে তখন তন্মধ্যে মুখ্য পরিব্রাট্ গৃহীত হইলেন না কেন? ইহার উত্তর এই, মন্ত্রে বিশেষ না থাকায় মুখ্যের গ্রহণ হয় নাই। তিনি ব্রহ্মসংস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মে সম্যক্ অবস্থিত সুতরাং তিনি পুণ্যলোক হইতে স্বতন্ত্র অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন। এই অমৃতত্ব দেবাদির লভ্য আপেক্ষিক অমৃতত্ব নহে। কারণ, মন্ত্রে পুণ্যলোক হইতে স্বতন্ত্র অমৃতত্বের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। যদি পুণ্যলোকের আতিশয্য মাত্র এই অমৃতত্ব হইত তাহা হইলে পুণ্যলোক হইতে পৃথক্ ভাবে ইহার নির্দ্দেশ থাকিত না। এই পৃথক্ ভাবে নির্দ্দেশ হেতু বুঝিতে হইবে ইহা আত্যন্তিক অমৃতত্ব বা মোক্ষ।

পূর্ব্বপক্ষ। মন্ত্রে জ্ঞানবর্জ্জিত চার আশ্রমীর স্বধর্ম্মানুষ্ঠান হেতু অবিশেষে পুণ্যলোক প্রাপ্তি হয় এই কথাই বলা হইয়াছে, সুতরাং মন্ত্রমধ্যে পরিব্রাট্ অনুক্ত হইয়া অবশেষ রহিয়াছেন এ কথ. তুমি বলিতে পার না। যদি বল, মন্ত্রে পরিব্রাজকের বাচক পদ নাই সুতরাংই তিনি অনুক্ত। তাহাও বলিতে পার না। কারণ, তপ দ্বিতীয় ধর্ম্মবিভাগ। এস্থলে তপঃশব্দে পরিব্রাট্ ও তাপস উভয়েরই গ্রহণ হইয়াছে। পরিব্রাজকের পক্ষে তপ বলিতে জ্ঞান এবং তাহার উপায়ভূত যম ও নিয়ম বুঝিতে হইবে। অতএব ঐ চার আশ্রমীদিগের মধ্যে যিনি ব্রহ্মসংস্থ ও প্রণবসেবক তিনিই অমৃতত্ব বা মোক্ষ লাভ করেন। ইহাঁরা সকলেই

অমৃতলাভের অধিকারী এবং ব্রহ্মসংস্থ হই-বার পক্ষে ইহাঁদের কোনও প্রতিবেধ নাই।

উত্তর। যজ্ঞাদি কর্ম্মের জন্যই গার্হস্থ্যাদি আশ্রম। এই সকল আশ্রম কর্ম্মেই ব্যাপৃত থাকে, স্বতরাং ব্রহ্মসংস্থ হইবার পক্ষে ইহা-দের সামর্থ্য নাই। কিন্তু মুখ্য পরিব্রাজক নির্ব্যাপার অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগী স্বতরাং ব্রহ্ম-সংস্থতা তাঁহারই পক্ষে সুকর। ব্রহ্মে সংস্থিতি কল্পে তাঁহারই সামর্থ্য আছে। যদি বল ব্রহ্মসংস্থ শব্দটী পরিব্রাজকে গবাদি শব্দের ন্যায় রূঢ় অর্থাৎ প্রসিদ্ধ। ইহাও বলিতে পার না, কারণ, ব্রহ্মে সংস্থিতি বা সংস্থান তন্নি-মিত্তই ব্রহ্মসংস্থ বিশেষণ। কিন্তু রূঢ়ি শব্দে কোনও নিমিত্তের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। আর একমাত্র পরিব্রাজকই যে ব্রহ্ম-সংস্থ তাহাও বলিতে পার না। সকল আশ্রমীর পক্ষে ব্রহ্মে সংস্থিতি সম্ভব। স্বতরাং যেখানে ব্রহ্মে সংস্থিতিরূপ নিমিত্ত আছে সেই নিমিত্তবৎ পুরুষের ব্রহ্মসংস্থ শব্দ বাচক হইবে। সঙ্কোচের কারণ অভাবে একমাত্র পরিব্রাজকেই এই ব্রহ্মসংস্থ শব্দ নিরোধ করিবার কোন যুক্তি নাই।

রূঢ়ি পক্ষে আরও দোষান্তর আছে। পারিব্রাজ্য আশ্রম-ধর্ম্ম মাত্রেই যে অমৃতত্ব লাভ হয় একথা বলিতে পার না। ইহা হইলে জ্ঞানটা নিরর্থক হইয়া পড়ে। যদি বল পারিব্রাজ্য ধর্ম্ম সহিত জ্ঞান অমৃতত্বের সাধন হউক্। না, ইহাও বলিতে পার না; কারণ, গৃহস্থাদিধর্ম্মও আশ্রমধর্ম্ম, তদ্বিশিষ্ট জ্ঞানও অমৃতত্বের হেতু এ কথা বলাও তো তোমার পক্ষে সহজ। কারণ, পারিব্রাজ্য ধর্ম্মও আশ্রম-ধর্ম্ম, গার্হস্থ্যাদিও আশ্রম-ধর্ম্ম। এস্থলে আশ্রমধর্ম্মত্বে কোনই বিশেষ নাই। যদি বল জ্ঞানসহকৃত পরিব্রাজক-ধর্ম্ম মুক্তির হেতু হইবে, তবে আমি বলিব, জ্ঞানের সহিত অন্যান্য আশ্রমধর্ম্ম কি দোষ করে। এ স্থলেও আশ্রমধর্ম্মত্বে ঐ তুল্যরূপতা। আরও এমনও কোন কথা নাই যে ব্রহ্মসংস্থ পরি-ব্রাজকেরই মুক্তি হয় অন্যের হয় না। সমস্ত উপনিষদের সিদ্ধান্ত এই যে কেবল মাত্র জ্ঞান হইতেই মুক্তি। স্বতরাং যাঁহারা স্ব স্ব আশ্রমবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁ-হাদের মধ্যে যিনিই ব্রহ্মসংস্থ তাঁহার মুক্তি হয় এ কথা টেঁকিল না। কারণ যজ্ঞাদি কর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান এই উভয়ের চিরবিরোধ। এই দুইটী একযোগে কখন মুক্তিসাধক হইতে পারে না।

আমি কর্ত্তা এবং কর্ম্মজন্য বিভিন্ন ফল আমার ইত্যাকার জ্ঞান হইতে কর্ম্মের প্রবৃত্তি। কিন্তু এই জ্ঞান শাস্ত্রকৃত নহে, কারণ, ইহা সর্ব্বপ্রাণিসাধারণ। "সমস্তই আত্মা, সমস্তই ব্রহ্ম" এইরূপ প্রতীতি শাস্ত্রজন্য, ইহাই বিদ্যা বা জ্ঞান। এই বিদ্যা বা জ্ঞান কর্ম্মবিধির হেতু কর্ত্তা ক্রিয়া ও ফল ইত্যাকার ভেদ-প্রতীতিকে বিনষ্ট না করিয়া কদাচ জন্মে না। ইহার হেতু ভেদ ও অভেদ জ্ঞানের চিরবিরোধ। তিমিরোপহত ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন চন্দ্রাদির প্রতীতি হইয়া থাকে, তিমিরাপগমে এই চন্দ্রাদির ভেদপ্রতীতি বিনষ্ট না করিয়া চন্দ্রাদির একত্বপ্রতীতি জন্মে না। এখন আইস, কথিত রীতিক্রমে সমুচ্চয়ের অযোগ হইলে অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয়ের সমবায় মুক্তিসাধক হইতে পারে না ইহা দাঁড়াইলে, শাস্ত্রপ্রমাণজনিত অদ্বৈত জ্ঞান দ্বারা, যে ভেদ জ্ঞান লইয়া কর্ম্মের প্রবৃত্তি হইয়াছে তাহা যাহার নষ্ট হয় সেই ব্যক্তি সকল কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত, কারণ নিমিত্তের অভাবে তাহার সম্পূর্ণ কর্ম্মনিবৃত্তি হইয়াছে, সেই নিবৃত্তকর্ম্মাই ব্রহ্মসংস্থ, তিনিই পরিব্রাট্, গৃহস্থাদির পক্ষে ইহা সম্ভব-পর নহে। তাহাদের দ্বৈত বুদ্ধি থাকে।

যজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রবৃত্তি থাকে, এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠায়ীর ব্রহ্মসংস্থতা ঘটিতে পারে না, কারণ, দ্বৈত বা মিথ্যা জ্ঞানের উপরেই কর্ম্মবিধি। তাহার এই মিথ্যা শরীরাদিতে আমি ব্রাহ্মণ ইত্যাকার এক মিথ্যা অভিমান আছে। সুতরাং সে ব্রহ্মসংস্থ হইতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষ। ব্রহ্মজ্ঞেরও তো সংস্কারবশাৎ কখনও দ্বৈত বুদ্ধির সত্যতা বোধ হইতে পারে। সেই দ্বৈত বুদ্ধি প্রভাবে তাঁহার কর্ম্মপ্রবৃত্তি সম্ভব, তবে তোমার ব্রহ্মসংস্থতা কোথায় দাঁড়ায়।

উত্তর। না এরূপ বুঝিও না। এইটী অসত্য এইরূপ বিবেক দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া জানিতে তাহার বাধ হইলে আবার তাহাকেই সত্য বুঝিয়া কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, তৎকালের এই যে ভেদবুদ্ধি ইহা আভাসরূপ ভেদবুদ্ধি, ইহা কোনও রূপ কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু হয় না। ফলত যাঁহার দ্বৈত জ্ঞান দূর হইয়াছে, কারণের অভাবে তাঁহার কর্ম্মনিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবিনী। বলিতে পার বিবেকবলে ভেদ জ্ঞান নষ্ট হইলেও যদি কর্ম্মনিবৃত্তি না হয় তাহা হইলে প্রমাণ পূর্ব্বক প্রবৃত্ত দ্বৈত জ্ঞানের সহিত বিরোধ হেতু অদ্বৈতবোধক শাস্ত্র অপ্রমাণ। কিন্তু তা বলিও না। মনে কর, "কলঞ্জ ভক্ষণ করিবে না" এই নিষেধক শাস্ত্র পূর্ব্বপ্রবৃত্ত কলঞ্জাদি ভক্ষণজ্ঞানের বিরোধেও প্রমাণ, কারণ ঐ পূর্ব্বপ্রবৃত্ত জ্ঞানটী লোভাদি দোষ বশত সম্পূর্ণ অপ্রমাণ; সেইরূপই দ্বৈত বুদ্ধি অজ্ঞানবিজৃম্ভিত সুতরাং অপ্রমাণ, তদ্বিরোধেও অদ্বৈত শাস্ত্রের প্রামাণ্য অবশ্যই যুক্তিযুক্ত।

যদি বল, উপনিষদমাত্রই যদি জ্ঞানপর শাস্ত্র হয় তাহা হইলে যজ্ঞাদি কর্ম্মপর শাস্ত্রের প্রামাণ্য রহিল কৈ। না, ইহা বলিতে পার না, কারণ, যাহার ভেদ জ্ঞান অপনীত হয় নাই এরূপ অজ্ঞান পুরুষে জাগরণের পূর্ব্বে স্বপ্নাদি জ্ঞানের ন্যায় ইহার প্রামাণ্য থাকিবে। যদি বল, বিবেকী শ্রেষ্ঠ লোক যাহা করেন আপামর সাধারণ তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে, সুতরাং বিবেকী জ্ঞানী যদি কর্ম্ম না করেন তাহা হইলে অন্যে কেন কর্ম্ম করিবে, কাজেই প্রকারান্তরেও আবার কর্ম্মবিধির সেই অপ্রামাণ্য। না, এ কথাও বলিতে পার না। দেখ, লোক সকল প্রকৃতিপরবশ, সুতরাং তাহারা বিবেকীর অনুবৃত্তি না করিয়া স্বস্বপ্রকৃতিরই অনুসরণ করিবে। তাহারা যখন প্রকৃতিবলে কামনার বশবর্ত্তী তখন কাম্য কর্ম্মবিধির উচ্ছেদ হইতে পারে না, কর্ম্মফলের কামনাই তাহাদিগকে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবে। কামিতা বা কামনার বশ্যতা প্রশস্ত নহে এইরূপ জ্ঞান যাঁহাদের জন্মিয়াছে তাঁহারা কর্ম্ম করেন না বলিয়া কি কর্ম্মবিধির উচ্ছেদ হয়? অজ্ঞানেরাও কর্ম্ম করিয়া থাকে।

পূর্ব্বপক্ষ। পরিব্রাজকের ভিক্ষাটনাদি কর্ম্ম তো থাকে সেইরূপ গৃহস্থাদিরও একত্ব জ্ঞান জন্মিলে যজ্ঞাদি কর্ম্ম থাকু।

উত্তর। না, তোমার দৃষ্টান্তই ঠিক হইল না। তুমি চাও সমুচ্চয় রক্ষা করিতে অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম সমবেত হইয়া মুক্তিসাধন হউক এই কথা বলিতে। কিন্তু তুমি সেই সমুচ্চয়ের প্রামাণ্য স্থাপন করিতে গিয়া একটা প্রবৃত্তির আভাসমাত্রকে দৃষ্টান্ত ধরিতেছ। কিন্তু তাহা কোনও ক্রমে টেঁকিতে পারে না। দেখ, অজ্ঞানবিজৃম্ভিত দ্বৈতবুদ্ধিতে কর্ম্মপ্রবৃত্তি হয়। কিন্তু বিবেকবলে যাঁহার অদ্বৈত জ্ঞান জন্মিয়াছে তাঁহার প্রবৃত্তি একটা আভাসমাত্র বুঝিবে। প্রবৃত্তির এই আভাস কদাচ কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু হইতে পারে না। প্রবৃত্তির

আভাস মাত্রকে যজ্ঞাদি কর্ম্মের হেতু বলিলে তোমার সমুচ্চয় সিদ্ধান্তেরই ব্যাঘাত ঘটে। কারণ, সমুচ্চয়ে প্রবৃত্তিরই বলবত্তা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভেদবুদ্ধি কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু। সেই ভেদজ্ঞান দূর হইলে আর কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হেতু থাকে না। যদি বল যেমন পরিব্রাজকের ক্ষুধা ভিক্ষাচরণের প্রবর্ত্তক সেইরূপ এস্থলেও কর্ম্মের অকরণ-জনিত প্রত্যবায় ভয়ই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইবে। না, একথাও বলিতে পার না। যাহার ভেদজ্ঞান আছে সেইই কর্ম্মের অধিকারী। জ্ঞান বা বিদ্যাবলে যাহার ভেদবুদ্ধি অপনীত হয় নাই কর্ম্মের সেইই অধিকারী। সুতরাং যে কর্ম্মে অধিকারী তাহারই কর্ম্ম না করায় প্রত্যবায়-ভয় আর যাহার অধিকার নিবৃত্তি হইয়াছে তাহার কিসের প্রত্যবায়।

এখন তুমি বলিবে, কর্ম্মের নিবৃত্তিমাত্রেই তবে পারিব্রাজ্য হউক, কিন্তু তাহা হইলে স্বস্ব আশ্রমস্থ সকলেই তো কর্ম্মনিবৃত্তি মাত্রেই পরিব্রাট্ হইয়া দাঁড়ায়। ফলত ইহা একটী অতিপ্রসঙ্গ দোষ। আচ্ছা বল দেখি, তুমি কর্ম্মসাধন যজ্ঞোপবীতাদি ত্যাগ করিবে কি না। যদি ত্যাগ কর তাহা হইলে তোমার আশ্রম-ধর্ম্ম হইল না। কারণ যজ্ঞোপবীতাদি ব্যতিরেকে গার্হস্থ্যাদি ভাব সম্পূর্ণ অসম্ভব। আর যদি ত্যাগ না কর তাহা হইলে তোমার পারিব্রাজ্য থাকে কোথায়। অতএব বুঝ একটা কর্ম্মনিবৃত্তি মাত্রেই আশ্রমাদিগের মধ্যে পরিব্রাট্ হওয়া যায় না। আরও কর্ম্মের জন্যই গার্হস্থ্যাদি আশ্রম। শ্রুতিতেও আছে আশ্রমবিহিত কর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয়। কিন্তু ভিক্ষুর স্বস্বামিত্ব বোধ থাকে না, জাত্যাদির অভিমানও ত্যাগ হয়। সুতরাং তিনিই একমাত্র পরিব্রাট্। গৃহস্থাদি পরিব্রাট্ হইতে পারেন না।

পূর্ব্বপক্ষ। তুমি বলিয়াছ কর্ম্মের অধিকার নিবৃত্ত হইলে কর্ম্মের অকরণ-জনিত প্রত্যবায় আর ঘটে না। এই সিদ্ধান্তই যদি ঠিক্ হয় তাহা হইলে তো পরিব্রাজকের পক্ষে ইহা ঘোর অনিষ্টকর। কারণ, এরূপ স্থলে জ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ অভেদ-বুদ্ধি দ্বারা অজ্ঞান অর্থাৎ ভেদজ্ঞান নিরাকৃত হওয়ায় পরিব্রাজকের যম নিয়মাদি কর্ম্ম আর থাকে না, কারণ অজ্ঞানের অর্থাৎ ভেদবুদ্ধির উপরই যম নিয়মাদি কর্ম্ম ব্যবস্থিত। যম নিয়মাদি না থাকিলে তাঁহার যথেচ্ছ-চেষ্টা-প্রসক্তি ঘটে অর্থাৎ যা ইচ্ছা তাই করিতে পারেন। ইহা তো তাঁহার পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর।

উত্তর। না, তোমার আপত্তি ঠিক্ নহে। জ্ঞানীর পক্ষে বিধিবিহিত যম নিয়মাদি কর্ম্ম নাই। কখন কখন তত্তৎবিষয়ে যে প্রবৃত্তি হয় তাহা কেবল সংস্কারবশাৎ। যেমন অদ্বৈত জ্ঞান হইলেও বুভুক্ষাদি হয় ইহাও সেইরূপ। যিনি দৃষ্টদোষবশত তত্ত্বজ্ঞান হইতে কথঞ্চিৎ প্রচ্যুত হইয়াছেন সংস্কারবশাৎ যম নিয়মাদি তাঁহারই পক্ষে ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। কারণ তখন দোষকৃত যে তত্ত্বজ্ঞান-চ্যুতি হইয়াছে তন্নিবন্ধন তাঁহার যথেচ্ছ-চেষ্টা-প্রসক্তি হইতে পারে। তাহার নিরাকরণের নিমিত্তই যম নিয়মাদি তাঁহার পক্ষে অনুষ্ঠেয়, কিন্তু দোষবশত যাঁহার তত্ত্ববুদ্ধি হইতে প্রচ্যুতি ঘটে নাই তাঁহার আর যথেচ্ছ-চেষ্টা-প্রসক্তি কিরূপে ঘটিবে! আর এই যে যথেচ্ছ-চেষ্টা-প্রসক্তির কথা তুমি বলিতেছ ইহা তো অদ্বৈত জ্ঞান লাভের পূর্ব্বেই এককালে নিবৃত্ত হইয়াছে। আবার কি। যে রাত্রিকালে কূপে বা কণ্টকবনে পতিত হয় সূর্য্যোদয় হইলে আর কি সেই ব্যক্তি কূপ বা কণ্টকবনে পড়ে। অতএব নিবৃত্তকর্ম্মা ভিক্ষুই যে ব্রহ্মসংস্থ ইহা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইল।

অন্তরতম।

নয়নজলের অতি অতলের
সুগোপনতম কথা
শুধু সেইটিরে রহিয়াছে ঘিরে
অনন্ত নীরবতা!

তুচ্ছ যা কিছু অল্পমূল্য
তারে নিয়ে শুধু যত বাহুল্য
অতি উপরেরি ফেনের তুল্য
যেটুকু তাহারি ব্যথা—
তারি সুখ তারি সান্ত্বনা নিয়ে
অশ্রান্ত এ কথা!

কে চির দীনের মর্ম্ম মনের
চিরজীবনের সাথি,
কাহারি নয়নে স্বপনে শয়নে
নাহি আসে কভু রাতি,

কে অন্তরেরি অন্তরতম
অতি সে সুদূর সুনিকট মম
কে সারা বিশ্বে নিঃশ্বাসসম:
শ্রদ্ধা আসন পাতি
কোনো কথা তাঁরে শুনাই না কভু
যদিও নিত্য সাথি!

তাঁরি কথা কারে কভু শুনাবারে
কে জানে চেয়েছি কি না
তিনি মরমেরি স্বর্ণতন্ত্রী
তবু বাজে মোর বীণা

শুধু আপনারি তুচ্ছ কথায়
শুধু আমারি ব্যর্থ ব্যথায়
মিছা ঝঙ্কারে সদা সে বৃথায়
গুঞ্জরে হৃদ্‌-হীনা
আসল কথাটা কভু কহিবারে
কে জানে চেয়েছি কি না?

সত্য ও সার যা শুধু আমার
যা আমার আপনার
সে মরম ধনে কে জানে কেমনে
এতটা ভুলিতে পারি?

যে আমার নিশি যে আমার দিন
হৃদি বসন্ত যে চির নবীন
হায় হত শ্রী সুচেতনাহীন
এ কি অবহেলা তারি!
সত্য ও সার যা শুধু আমার
যা আমার আপনারি!

নয়নজলের অতি অতলের
সুগোপনতম কথা
শুধু সেইটিরে রয়েছে সে ঘিরে
সুশান্ত নীরবতা!

তুচ্ছ ত্যাজ্য শূন্য মূল্য
তারি পরে ঝরে আঁখি বাহুল্য
জীবনেরো যাহা জীবনতুল্য
একটুকুখানি ব্যথা
তা নিয়ে জাগে না, কর্ম্মে লাগে না
এতটুকু তাঁরি কথা!

পত্র।

মহামান্য লর্ড বিশপ মহর্ষিদেবের আত্ম-জীবনী পাঠ করিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে যে পত্র লিখেন নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল। একদা শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ঐ সময় লড বিশপ শাস্ত্রী মহাশয়কে আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। আচার্য্য এবং গায়কগণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া অবশেষে বলেন যে মহর্ষিদেব এক সময়ে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয় উত্তর করেন যে, মহর্ষিদেব কখন কোন ধর্ম্মে বাধা দেন নাই, কিন্তু পূর্ব্বে খৃষ্টীয় মিশনরিগণ অনেক হিন্দুসন্তানকে খৃষ্টান করিয়া তাহাদের পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনগণের মনে যে ব্যথা দিয়া সমাজবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন সেই সমাজবিপ্লব যাহাতে উপস্থিত না হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বর্ত্তমান লর্ড বিশপ মহাশয় অতি উচ্চ ও উদার প্রকৃতির লোক। তিনি ধর্ম্মবিশ্বাসে অতি ধীর ও গম্ভীর। মহর্ষিদেবের আদেশক্রমে শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্যাখ্যানাদি গ্রন্থ তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। তিনি পুস্তকের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করেন নিম্নে তাহাও দেওয়া হইল।

The Palace
Calcutta
Aug. 2. 1904.

MY DEAR SIR

I have read the autobiography of Moharshi Debendro Nath Tagore, edited by yau, with great admiration. Though my knowledge of Bengali is still small, yet since what I know of sanscrit lies chiefly in the regions of philosophy and of religion, I have not been altogether unable to apriciate the nobility of thought, the deep piety and the grasp of religious truth by which every part of the book is inspired, I have seldom read a book more Calculated to raise men's minds to high and heavenly things; though the position of the writer is that of a Thiest only, not of a christian. That the Moharshi has been so wonderfuly drawn on to adore and love our Heavenly Father, is due to the unseen guidence of Him Who said; "No man cometh unto the Father but by Me;" and I pray that the Moharshi may recognize fully, even in this life, what he owes to that Eternal Word of God. May he realize in the closing hours of this life, the full meaning of those noble words as the end of your 24th chapter:

হে জগদীশ্বর, তোমার সমান আর কে আছে। এই সময়ে আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে, জগৎ লুপ্ত হইতেছে, যখন তোমাকে দেখিতেছি, যিনি আমার জীবনের ঈশ্বর এবং আমার চিরকালের উপজীব্য।

Believe me, Dear Sir
Yours very faithfully
Sd R. S. Calcutta,

The Venerable
Preo Nath Shastry,

The Palace
Calcutta,

The Bishop of Calcutta desires to present his respectful compliments to the Venerable Moharshi Debendro Nath Tagore, and to thank him very sincerely for the valuable present of books, and still more for the pleasure and benefit which the Bishop has derived from reading the Moharshi's writings and the history of his life. The bishop prays to almighty God, by the mediation of the Lord Jesus Christ, that what remaines of this life to the venerable Moharshi may be a time of holy meditation and of continually increasing Light, until he may enter, by Gods grace upon the Light of everlasting life.

Calcutta.
aug, 2. 1904

Sermons of Maharshi Debendranath Tagore.

(Translated from Bengalee.)

SERMON XLVI.

Perception of God—I

God is manifested in the din and noise of the world ; in the solitude of the soul is He also present. In all places, in society and solitude, is to be seen His revelation. When our knowledge is refined, we behold God everywhere as Truth itself, and when our heart is purified He reveals Himself unto us as holiness itself. Through righteousness, through knowledge, through love, we can acquire truth, we can get nearer unto God. To be able to approach God we must ceaselessly refine our knowledge, purify our heart, and make patience the very armour of our soul. If we always live for God wherever we may dwell, if we make God our goal wherever we may go, then we are ever safe from all dangers and difficulties. If we desire to advance towards God, He will purify our hearts ; if we desire to know His truth, He will reveal Himself unto us ; if we unite our will with His, He will deliver us from sinful thought ; if we place ourselves under the protection of God, we shall be free from the fear of man and the world. Keeping yourselves away from sinful thoughts, feel the presence of Him whom sin can not pierce, and renouncing your worldly aim, fulfill the aim of God, and ye will then obtain Him. If with a sincere heart and with a mind steadfastly fixed upon Him, we will to behold God, He will surely reveal Himself to our vision. We shall then perceive Him more clearly than all things that we now see clearly ; we shall then wonder how in the midst of the encircling darkness we can behold that Light and how in the midst of things whose destiny is death we can see the Deathless. The first state of development above the animal is the human soul and although we are only in this first state of development we are privileged to behold the supremely Great Soul. The eye can only see the dust of the world, but the soul beholds God. In this wonderful world, we behold the wondrous Lord of the universe. In this infinite sky we observe that Infinite Being. In all time, in all forces, in all art, we see the great God who is the Time of all time, the Force of all forces and the Cause of all causes. In the midst of these multifarious objects which bear on them the stamp of imperfection, we behold the Being who is perfection itself. Ye Brahmos, refine your knowledge and purify your hearts to see that God who is One without a second, and ye will then have the exceeding joy of entering the Abode of immortality.

O Supreme Spirit, we can not obtain Thee without thy grace, we can not raise ourselves up to Thee without thy help ; so we pray, do Thou draw us towards Thee.

SERMON XLVII.

Perception of God—II.

He who is in the moon and the stars—He who being immanent in the moon and the stars ruleth them, is the Being who is

in our souls, and dwelling in the innermost recesses of the soul nourishes and elevates it with knowledge and righteousness. He is without us and He is within us. He is the universal Witness, and He is the Supreme Head of universal work. He is our only adorable God. To behold Him one has not to travel to distant places ; He has not to be sought after in one country or another—the pure soul is his dear habitation. He who purifies his soul, sees Him within himself. Space has no form, space is not visible to the eye, I can not catch hold of space by the hand, yet I realize the existence of this extensive, infinite space with the greatest possible clearness. We clearly perceive the infinite space that is emptiness, but we do not as unmistakeably perceive the infinite God who is fullness ! What an infatuation is this ? The infinite space is a void, a vast emptiness. God is non-space, He is not space, He is not a void nor an emptiness, but He is fullness-the Being who comprises or encompasses every thing, He is truth itself. The sky is full of His presence—the presence of Him who is the Truth. Yet we realize not the full God just as we realize the empty space. God who exists in space also exists there where there is no space. What is that where there is no space ? It is the soul. In the soul there is no space. Perceive within your body the bodiless soul and you will realize that in the soul there is no space. The soul is above space—there is no space in the soul. The soul is neither thick nor thin, neither long nor short ; within the soul is the non-space-istic and self-manifest Supreme Soul. He pervades this vast space that is without us and He also exists there where there is no space. If we attempt to see Him through these eyes of flesh and blood, He will appear to us to be more distant than the most distant object ; He can be realized by the internal eyes alone in our own soul. Through the governance of the Lord who can be brought within our perception by this one means alone are the sun and the moon in the heavens and love and conscience in the soul made to follow their law. It is through the governance of that Being that man shrinks from, and is afraid and ashamed of violating His law of righteousness, and if he does violate that law his heart is shattered into a hundred fragments by remorse and grief, and his body from top to toe is burnt in hell fire. It is by His law that the sinner is punished and the righteous soul is sanctified. It is through His mercy that the beasts dwindle into earth after enjoying the pleasures of the earth on this earth, and it is through His grace that the human soul rises with its righteousness and its God, who is none but the Supreme Soul, on another sky in another world. It is by His ruling power that the kingdom of matter and the kingdom of righteousness are governed. He who is the soul of this sky, He who is the Soul of this soul of ours, is the God who alone is to be worshipped by us. Purifying your hearts, realize the holy presence of God here in this Hall and be locked in His embrace at this very moment. He is present in this temple of worship ; He stands here extending His arms to receive the worship of His devotees whose minds are steadfastly fixed on Him. He is giving utterance to His truths at this very moment. Mark, the tongue ceases not from praising Him. As long as every one of those present here will not realize His holiness, so long will He keep this tongue engaged in His service. As long as every one of you will not perceive that He is holiness itself, as long as every one of you will not be prepared to offer Him the worship of your heart, so long will He continue to send His truths, so long will His truths gush out from this tongue. He is present here at this moment to accept our worship, His holy breath is wafted through this hall ; thrilled by this joy-instilling breath which blows like the gentle breeze of spring, devote your hearts to His worship. Humble yourselves before Him. He is the Infinite God, all-good and supremely great ; He covets our love and worship, for He is both our father and mother ; are we so hard-hearted and so unworthy that we shall fail to offer Him that much ? Cast off lassitude and procrastination and prostrate yourselves at the feet of God. What a wonder is it that no sooner do I give expression to this wish than I observe that all present here have become rapt in silent and joyous perception of the honied sweetness of the Divine nature. What a wonderful, charming spectacle is this ! O Lord of our hearts, do Thou accept our loving worship. In reverence do we bend our heads before Thee again and again.

একমেবাদ্বিতীয়ং

ষোড়শ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

১৩৪ সংখ্যা আশ্বিন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৫। ১৮২৬ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

প্রেম।*

আমরা স্ত্রী পুরুষ মনুষ্যমাত্রেই নিজ নিজ অহঙ্কার মান ও কল্পিত সামাজিক স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া, ক্ষণকালের জন্য যদি গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে প্রেম কাহাকে বলে বিচার করিয়া দেখি ও তাহার সার ভাব গ্রহণ করি তাহা হইলে জগতের একটী মহা অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গলবিধান হয় ও জীবসমূহ শান্তি পায়।

শাস্ত্রে লেখা আছে এবং লোকের মুখেও শুনা যায় যে ভগবানের প্রেমিক, সমদর্শী, হিংসা-দ্বেষ-শূন্য, অকপট, নিশ্ছল, নির্ম্মল, সরল-অন্তঃকরণ ও মিষ্টভাষী। তিনি জীবসমূহকে আপন আত্মা বা ভগবানের স্বরূপ জানিয়া সমভাবে প্রীতি করেন ও সমভাবে প্রতিপালন করেন। যথার্থতঃ ভগবানের প্রেমিক ভক্ত যদি এই আকাশ-মন্দিরে কেহ থাকেন তাঁহাকে পূর্ণরূপে নমস্কার।

প্রেমের এই আদর্শ গ্রহণ করিয়া সাধারণতঃ জগতের মধ্যে প্রেম খুঁজিলে কি পাওয়া যায়? গরীব ধনীর সহিত প্রেম করিতে চাহে ধনী চাহেন না, দুর্ব্বল বলবানের সহিত প্রেম করিতে চাহে বলবান চাহেন না, মানহীন মাননীয়ের সহিত প্রেম করিতে চাহে মাননীয় চাহেন না। এইরূপ যাহার যেখানে স্বার্থ তাহার সেখানে প্রেম, যেখানে স্বার্থ নাই সেখানে প্রেমও নাই। আমাদের এইরূপ প্রেম কি না? ভগবান বা পরমাত্মা যে বস্তু, সেই বস্তুতে যদি প্রেম থাকিত তাহা হইলে সেই বস্তুই যখন এই বৈচিত্র্যময় জগতের তাবৎ পদার্থের অন্তরে বাহিরে বিরাজমান তখন কাহাকেও ছাড়িয়া কাহাকেও প্রেম করিতে পারিতাম না, তাহা হইলে দেখিতাম, কোন্ পদার্থকে কোন্ অবস্থায় প্রেম করিব, কোন্ অবস্থায় করিব না। কোন্ গুণে প্রেম করিব কোন্ গুণে করিব না। অথচ অনেক সময় দেখা যায় যে উচ্চপদস্থ ঋষি মুনি সাধু সন্ন্যাসীর মধ্যেও পরস্পর প্রেম নাই, বিরোধ রহিয়াছে। দুই জনের মধ্যে একমত নাই। ইঁহারা একমত হইয়া কেবল সাধারণ মনুষ্যকে গৃহস্থ ও অজ্ঞান বলিয়া হেয়জ্ঞান

* শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে মহিলা-সমাজে তাঁহারই অন্তঃপুরস্থ কোন মহিলা কর্ত্তৃক পঠিত।

করিতেছেন, প্রেম করিতেছেন না। কিন্তু অন্য দিকে ধর্ম্ম বা ঈশ্বর পরমেশ্বর গড আল্লা খোদা ব্রহ্ম পরব্রহ্ম দেব দেবী প্রভৃতি বস্তুশূন্য নাম কল্পনা করিয়া আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে প্রেম করিতে চাহেন। এ কিরূপ প্রেম? এক ধর্ম্মের নেতা আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও অপর ধর্ম্মের নেতাকে নিকৃষ্ট অজ্ঞান বোধে প্রেম করিতে চাহেন না। দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদী শূন্যবাদী স্বভাববাদী সাকারবাদী নিরাকারবাদী প্রভৃতির একের সহিত অন্যের প্রেম নাই। এ কিরূপ প্রেম?

স্ত্রী পুরুষ মনুষ্যমাত্রেই বুঝিয়া দেখ যে যিনি প্রেম করিবেন তিনি নিজে সত্য বা মিথ্যা, তাঁহার কি রূপ, এবং যাঁহাকে প্রেম করিবেন তিনি সত্য বা মিথ্যা, এক বা বহু, নিরাকার বা সাকার, তাঁহারই বা কি রূপ? নিজে কোন্ রূপ হইয়া কোন্ রূপের সহিত প্রেম করিবেন? মিথ্যা হইয়া সত্যের সহিত বা সত্য হইয়া মিথ্যার সহিত অথবা মিথ্যা হইয়া মিথ্যার সহিত বা সত্য হইয়া সত্যের সহিত প্রেম করিবেন? মিথ্যা তো মিথ্যাই, মিথ্যা, যাহা কিছুই নয়, তাহার সহিত প্রেম হইতেই পারে না, অসম্ভব। এবং সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। সত্য স্বতঃপ্রকাশ। যাহা আছে বা যিনি সত্য তিনি নিরাকার সাকার সমষ্টিকে লইয়া পূর্ণরূপে প্রকাশমান, তবে কে কাহাকে মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিবে ও কাহাকে সত্য বলিয়া প্রেম করিবে? সাকার ব্রহ্ম নিরাকার ব্রহ্মের সহিত প্রেম করিবেন, না নিরাকার ব্রহ্ম সাকার ব্রহ্মের সহিত প্রেম করিবেন, অথবা নিরাকার ব্রহ্ম নিরাকার ব্রহ্মের সহিত প্রেম করিরেন কি সাকার ব্রহ্ম সাকার ব্রহ্মের সহিত প্রেম করিবেন? আমরা নিজে কি বস্তু হইয়া ব্রহ্মকে কি বস্তু বুঝিয়া প্রেম করিতে চাহি। যদি বলি নিরাকার মহৎ উৎকৃষ্ট তাঁহাকে প্রেম করিব, সাকার নিকৃষ্ট হীন তাঁহাকে প্রেম করিব না তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখিতে হয় আমাদের পরম প্রেমাস্পদ যে মলের পুত্তলী স্থূল শরীর, ইহাকে কি প্রকারে প্রেম করি? ভগবান যে প্রকাশমান তাঁহাকে প্রেম করিতেছি না, কিন্তু নিজেকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থায় প্রেম করিতেছি, অপবিত্র হেয় জ্ঞান করিতেছি না। সমদর্শী প্রেমিকের এ কিরূপ প্রেম? সাকার বা প্রকাশমানকে ত্যাগ করিয়া অপ্রকাশ নিরাকারকে প্রেম করিতে যাওয়া আর লীলাময়ী কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া ঘুমন্ত সেই কন্যাকেই প্রেম করিতে যাওয়া একই।

অনেকেই মুখে বলেন "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যাঁহার ঈশ্বর গড্ আল্লা প্রভৃতি কল্পিত নাম তিনিই এক সত্য, তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য এ আকাশে নাই। কিন্তু এই বাক্যের সারভাব অনেকেই গ্রহণ করেন না। ইহা ত বুঝা উচিত যে যখন এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই তখন এই যে পরিদৃশ্যমান জগত যাহাকে মায়া জড় বোধে পরিত্যাগ করিতেছি এ দ্বিতীয় সত্য কোথা হইতে আসিল? আরও বলিতেছি পরমাত্মা ওষধিতে বনস্পতিতে চন্দ্রাদিত্যে ও জীবের হৃদয়ে প্রকাশমান। কিন্তু যাহাতে তিনি প্রকাশমান সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি সংখ্যক সত্য কোথা হইতে আসিল? আর জীব সংজ্ঞক যিনি এই সকল বোধ করিতেছেন তিনি অপর এক সত্য কোথা হইতে আসিলেন? যদি সমস্ত পদার্থেই তিনি বিরাজমান ও সেই সমস্ত পদার্থই যদি মিথ্যা তাহা হইলে তিনি নিজে সত্য কি মিথ্যা ইহা কিরূপে প্রমাণ হইবে ও কেই বা

প্রমাণ করিবে? আর যদি তাবৎ প্রকাশমান পদার্থ লইয়া তিনি সত্য হন তাহা হইলে সকলের সহিত সকলের প্রেম করা উচিত নতুবা ধর্ম্ম কর্ম্ম ইষ্টদেবতা প্রেম ইত্যাদির বিচার পণ্ডশ্রম মাত্র।

আরো সূক্ষ্মরূপে বুঝিয়া দেখ, এক সত্য স্বতঃপ্রকাশ স্বয়ং নিরাকার সাকার বা কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নাম রূপ লইয়া পূর্ণরূপে প্রকাশমান অর্থাৎ এক ওঁকার মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জীবসমূহের মাতা পিতা গুরু আত্মা অনাদিকাল বিরাজমান, অমূল্যরত্ন। ইহাঁর হস্তে উদ্যত দণ্ড না দেখিয়া ইহাঁকে অবহেলায় আমরা প্রেম করিতেছি না। অথচ ইনি সর্ব্বপ্রকারে আমাদের অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল করিতেছেন। ইনি রাজার মস্তিষ্কে রাজার মত, প্রজার মস্তিষ্কে প্রজার মত, সাধুর মস্তিষ্কে সাধুর মত কার্য্য করিতেছেন। ইনি স্থূলরূপে স্থূলের কার্য্য অন্নাদি উৎপন্ন করিয়া জীব সমূহকে পালন করিতেছেন, সূক্ষ্মের কার্য্য জীব সমূহকে জ্ঞান দিয়া ক্রমশঃ মুক্তির পথে অগ্রসর করিতেছেন। তুলনায় তৃণাদপি ন্যূন— তাঁহার শক্তির কণামাত্র প্রকাশ, রাজা বাদসাহের হাতে রাজদণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়া ভয়ের তাড়নায়, ধনী দরিদ্র জ্ঞানী অজ্ঞান মূর্খ পণ্ডিত প্রভৃতি সকলেই ভয় তাড়িত ভাবে অবনত মস্তকে প্রেম করিতে চাহি, কিন্তু ইহাঁকে প্রেম করিতে চাহি না। আমাদের এ কিরূপ প্রেম?

এক সত্য ব্যতীত যখন দ্বিতীয় সত্য নাই তখন যে প্রেমিক নিরাকার সাকার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নাম রূপ লইয়া প্রেম সমুদ্রবৎ পূর্ণরূপে প্রেম ভক্তি স্থাপন পূর্ব্বক উপাসনা ও তদঙ্গীভূত প্রণাম নমস্কারাদি করেন তিনিই যথার্থ প্রেমিক। আমরা যাহাকে যথার্থ প্রেম করি তাহাকে যেমন রুগ্ন সুস্থ, ধনী দরিদ্র, প্রফুল্ল বিষণ্ণ, যৌবন বার্দ্ধক্য, সর্ব্বাবস্থায় সমভাবে প্রেম করি এবং এইরূপ প্রেমকেই যথার্থ প্রেম বলি, সেইরূপ যিনি যথার্থ ভগবৎ প্রেমিক হইবেন তিনি সত্য বা বস্তু বা ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে সর্ব্বরূপে সর্ব্বভাবে প্রেম করিবেন, মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইবেন না। তিনি বাহ্যেন্দ্রিয় অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু বোধ করিবেন তাহাই যে পরমাত্মা ইহাতে তাঁহার অণুমাত্র সংশয় থাকিবে না। আদিতে অন্তে মধ্যে ভিতরে বাহিরে সেই পরম প্রেমময়কেই দেখিবেন। যখন যেখানে যে ভাবে চেতনার স্পন্দন ঘটিবে তিনি সেই পরম প্রেমময়েতেই তাহার সমাপ্তি দেখিবেন। খাওয়া পরা চলা ফেরা দেখা শুনা সকল কার্য্যে একমাত্র তিনিই প্রকাশমান থাকিবেন—যিনি অণু হইতেও অণু এবং মহৎ হইতেও মহৎ তিনিই আত্ম, তিনিই পর, তিনিই প্রকাশ, তিনিই অপ্রকাশ, তিনি ছাড়া কিছু নাই। প্রেম যে বলিতেছি তাহা ও তিনি। তিনিই স্বয়ং প্রেম, এই জগত সেই প্রেমের প্রকাশ মাত্র। এখন দেখ, কে কাহাকে প্রেম করিবে কে কাহাকে প্রেম না করিবে?

হে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা, আপনি নিজগুণে আমাদের সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদের অন্তঃকরণ হইতে বাদবিসম্বাদ হিংসা দ্বেষ মতামত মুছিয়া ফেলুন, প্রেমরূপে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন যাহাতে আমরা সর্ব্বভাবে সর্ব্বরূপে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালে সমভাবে প্রকাশে অপ্রকাশে পূর্ণরূপে আপনাকেই প্রেম করিতে পারি, যাহাতে আপনিই আমাদিগের নিকটে প্রেমরূপে প্রকাশমান হন, যাহাতে আপনি ভিন্ন প্রেম

বলিয়া দ্বিতীয় পদার্থ বোধ না হয়—ইহাই প্রার্থনা।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২৬ শক, ২২ এ আষাঢ়, বুধবার।

উপদেশ।

কেমনে ফিরিয়া যাও, না দেখি তাঁহারে,
কেমনে জীবন কাটে, চির অন্ধকারে।
মহান্ বিশ্বেতে থাকি, বিস্ময় বিহীন আঁখি,
বারেক না দেখ তাঁরে, এ বিশ্ব-মাঝারে।

মনুষ্যজীবন ধারণ করিয়া, এমন কৌশলময় এমন শোভাশালী জগৎ দর্শন করিয়া যদি তাহার স্রষ্টাকে তাহার মধ্যে না দেখিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যাও, তবে আর এখানে আসিয়া কি করিলে, কি দেখিলে? জগতে নিয়ম দেখিলে আর তাহার নিয়ন্তাকে দেখিলে না, জগতে শোভা দেখিলে আর তাহার শোভার আকরকে দেখিলে না? সূর্য্যকে দেখিলে আর সূর্য্যরথের সারথিকে দেখিলে না? নীল আকাশরূপ নীল সমুদ্রে সোনার তরী চন্দ্রমা নিশীথে নিস্তব্ধে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিলে, আর তাহার কাণ্ডারীকে দেখিলে না? কোটি কোটি নক্ষত্ররূপ পুষ্প গগন-উদ্যানে ফুটিয়া তাঁহার চরণে গন্ধ দান করিতেছে, সে সুগন্ধ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, বুঝিলে না? যিনি নিজে রূপ রস গন্ধ বিহীন হইয়া, এই সকল সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে তুমি দেখিলে না? কেবল মৃত্যুর রূপ জড়পদার্থ দেখিয়াই চলিয়া গেলে। মৃত্যুর বিপরীত সেই অক্ষয় জগৎপ্রাণকে দেখিলে না! তবে কিসের জন্য প্রাণধারণ? যিনি প্রাণস্য প্রাণ, তাঁহাকে প্রাণের মধ্যে দেখিলে না। দেখিবেই বা কি করিয়া! এ চর্ম্মচক্ষে সে জ্যোতিঃ কোথায়! সত্য বটে "তন্দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং" কিন্তু আর একদিকে, তিনি দয়াময় প্রেমময় ভক্তবৎসল। কৃপাগুণে তিনি সহজেই তাঁহার ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হন। সে সহজ পথে তুমি যাইলে না। তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিলে না। কৃপারূপ নয়নাঞ্জনে চক্ষুকে রঞ্জিত করিলে না। তবে আর তাঁহাকে কেমন করিয়া দেখিবে? তাঁহার নিমিত্ত সে পিপাসা কৈ? তবে আর কেমন করিয়া সে স্বর্গীয় বারি তৃষিত চাতকের ন্যায় পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে? "প্রেমপিয়ালা ভালবাসা কই"। একবার তাঁহার কৃপার প্রার্থী হইয়া অনুরাগরঞ্জিত নয়নে এই বিশ্বজগৎ দর্শন কর। ইহাকে এক নবতর সজ্জায়, নবতর শোভায় শোভিত দেখিতে পাইবে। তখন চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রে, সুন্দর সুগন্ধি পুষ্পে, নদী নদ সমুদ্রে, গগনভেদী পর্ব্বতে তাঁহার অরূপ রূপের ছায়া দর্শন করিয়া মহা আনন্দে আনন্দিত হইবে। তখন আত্মা কি এক উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিবে, "আঁখি ফুটিল, চাহি উঠিল চরণ দরশ আশে।" তখন যদি নির্ম্মল সরোবরের তীরে গিয়া উপবেশন কর, তাহার নির্ম্মল জলে নির্ম্মল পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইবে, শতদল পদ্মে মধুকরকে মধুপান করিতে দেখিলে তোমার আত্মা পরমেশ্বররূপ শতদলে বসিয়া পরম মধু পানে বিভোর হইবে। সে দৃশ্য দেখিয়া দেবতারাও মোহিত হইবেন। তখন যদি আতপতাপে তাপিত হইয়া বটচ্ছায়ায় উপবেশন কর, প্রাণ আপনা হইতে বলিয়া উঠিবে, এ সংসারআতপে তুমিই জুড়াইবার স্থান। হায়! এ প্রকার আনন্দ ঈশ্বরবিহীন ভাগ্যহীন মনুষ্যের ভাগ্যে দুষ্প্রাপ্য। জগৎগুরু

পরমেশ্বরের শিক্ষার কি কৌশল! তাঁর কৃপায় পিপাসু আত্মা এখানে জগতের শোভা দেখিতে দেখিতেই সেই শোভার আকর স্থানেই উপস্থিত হয়। সে অবস্থায় জগৎ তাহার নিকট লুপ্ত হয়। তখন আপনার অভ্যন্তরে তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার শোভা দর্শন করিয়া সে কৃতার্থ হয়। তখন ঈশ্বরদর্শন সহজসাধ্য হইয়া উঠে। এ প্রকারে যে তাঁহাকে না দেখিল, তাহার হৃদয় কি ঘন বিষাদে আচ্ছন্ন! কঠিন কথায়, কঠিন আঘাতে, ঘোর সঙ্কটে, বিরহ বিচ্ছেদে, পাপ তাপে আত্মা আর কাহার ক্রোড়ে গিয়া সন্তাপ নিবারণ করিবে? কাহার মুখ দেখিয়া এ দুঃসহ শোক হইতে মুক্ত হইবে? তাঁহার কৃপায় যিনি তঁাহাকে তাঁহার জগতে দেখিয়া পরিশেষে আত্মার অভ্যন্তরে দর্শন পান, তিনিই শোক হইতে মুক্ত হন, হৃদয়-গ্রন্থি হইতে মুক্ত হন, পাপ-তাপ-জনিত আত্মগ্লানি হইতে মুক্ত হন।

সাধক তাঁহাকে দুই প্রকারে দেখেন। তাঁহার জগতে ও আপনার অন্তরে।

"এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।"

তিনিই জানিবার যোগ্য। তাঁহার পর জানিবার যোগ্য, দেখিবার আর নাই। তিনি "শান্তং শিবমদ্বৈতং" রূপে বিরাজ করিতেছেন। সাধক তাঁহাতেই ডুবিয়া যান। সেই অমৃতসাগরে ডুবিয়া তাঁহার কি পরম শান্তি! পৃথিবীর লোকের নিকট হৃদয়দ্বার খুলিয়া তিনি কতবারই ক্ষতবিক্ষত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে হৃদয় দান করিয়া তাঁহার কি অসীম তৃপ্তি! তিনি তখন তাঁর শব্দহীন স্বর শুনিয়া কি সঙ্গীতই শ্রবণ করেন। দেবতারা নিয়ত সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন। যে মুহূর্ত্তে আত্মা এই মৃণ্ময় শরীর পরিত্যাগ করিয়া অমৃতধামে উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই সেই সঙ্গীত সে আরো সুস্পষ্ট শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ব জীবনের সকল যাতনার সংস্কার হইতে মুক্ত হইবে। অতএব প্রাণ থাকিতে থাকিতে সেই জগৎ-প্রাণকে দেখ। উক্ত দ্বিবিধ প্রকারেই তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হও। বল,—

"তুমি জ্যোতির জ্যোতি দেখা দেও আমারে।
রবি শশী তারা, শোভে না আমার কাছে,
যদি হারাই তোমারে।
কিসের সে জীবন যৌবন, তোমা বিহীনে,
কি হবে সে প্রাণে, যদি তোমারে না পাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সার সত্যের আলোচনা।

বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড।

গত মাসের প্রবন্ধে কর্ত্তা-কর্ম্মের এবং জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের উভয়াত্মক ঐক্য কিরূপ, তাহা প্রদর্শন করিয়া শেষে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল এই যে, সে যে উভয়াত্মক ঐক্য, তাহা কি অকস্মাৎ আকাশ হইতে নিপতিত হয়, অথবা, পূর্ব্বে যাহা প্রসুপ্ত ছিল, তাহাই জাগ্রত হয়। এ প্রশ্নের রীতিমত মীমাংসা করিতে হইলে—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঐক্য কিরূপ, এবং সে ঐক্য বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে কিরূপেই বা সংক্রামিত হয়, তাহার প্রতি বিধিমতে অনুসন্ধান প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

আমরা প্রত্যেকে এক-একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড; এবং সমস্ত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ক্রোড়ে করিয়া যে এক নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বর্গ-মর্ত্ত্যপাতাল ব্যাপিয়া বিরাজমান, তাহাই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের যথাসর্ব্বস্ব যাহা কিছু আছে,

সমস্তই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে ধার করিয়া পাওয়া। তার সাক্ষী মনুষ্যের উদরভাণ্ডে যে তণ্ডুলান্ন রহিয়াছে, তাহা ধান্যক্ষেত্রেরই তণ্ডুল; মনুষ্যের রক্তে যে জল রহিয়াছে, তাহা সমুদ্রেরই জল; মনুষ্যের শরীরে যে তেজ রহিয়াছে, তাহা অগ্নিরই তেজ; মনুষ্যের নাসিকাপথ দিয়া যে বায়ু যাতায়াত করিতেছে, তাহা বহিরাকাশেরই বায়ু। এ তো সকলেরই একপ্রকার দেখা কথা; তা ছাড়া, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন এই যে, প্রথমে পৃথিবী উচ্ছৃঙ্খল ভৌতিক শক্তি-সকলের ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল। ক্রমে পৃথিবীতে ভৌতিক শক্তির উন্মত্ত নৃত্যলীলার সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প করিয়া জীবনী শক্তির উন্মেষ হইতে লাগিল। উদ্ভিদ্ জন্মিবার পূর্ব্বে পৃথিবীতে শুদ্ধকেবল ভৌতিক শক্তির দল, সংক্ষেপে—ভূতের দল, দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার পরে যখন উদ্ভিদের আদিম স্তর পঙ্কশয্যা হইতে অল্পে অল্পে গাত্রোত্থান করিয়া জলস্থলের অন্ধিসন্ধি প্রদেশসকল শ্যামলচ্ছদে আবরণ করিতে লাগিল এবং তাহার পরে সেই নূতন ব্যাপারটি যখন জলের কিনারা হইতে ক্রমে ক্রমে ডাঙা বাহিয়া উঠিয়া দেশবিদেশ ব্যাপিয়া দলে দলে সাজিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, তখন পৃথিবী একবিধ শক্তির পরিবর্ত্তে দ্বিবিধ শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল—ভৌতিক শক্তি এবং জীবনী শক্তি, এই দুইপ্রকার শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল। তাহার পরে যখন উদ্ভিদশ্রেণী নানা বর্ণের ফলফুলপল্লবের বিচিত্র বেশে সজ্জিত হইতে লাগিল এবং জলচর, ভূচর, খেচর প্রভৃতি নানা জন্তু পঙ্ক হইতে, অণ্ড হইতে, জরায়ু হইতে, কালে-কালে বাহির হইয়া পালে-পালে বিচরণ করিতে লাগিল, আর, সেই সঙ্গে গিরি-গুহা-অরণ্য গর্জ্জনরবে এবং বৃংহিতরবে, গহন বন ঝিল্লী-রবে, পুষ্পমঞ্জরী গুঞ্জরিত-রবে, লতাকুঞ্জ কূজিত-রবে, তৃণ-ভূমি হম্বারবে, বিস্তীর্ণ প্রান্তর হ্রেষারবে শব্দায়মান হইতে লাগিল, তখন পৃথিবী দ্বিবিধ শক্তির পরিবর্ত্তে ত্রিবিধ শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল—ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি এবং চেতনাশক্তি, এই তিনপ্রকার শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল। সর্ব্বশেষে যখন মনুষ্য বাহির হইয়া প্রথমে হামাগুড়ি দিতে লাগিল, এবং ক্রমে উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া চারিদ্বিক্ নিরীক্ষণ করিয়া গন্তব্যপথে চলিতে লাগিল এবং তাহার পরে যখন বিচারবিবেচনা এবং যুক্তি খাটাইয়া সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন পৃথিবী ত্রিবিধ শক্তির পরিবর্ত্তে চতুর্ব্বিধ শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল—ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধী-শক্তি, এই চারিপ্রকার শক্তির ক্রীড়া-ক্ষেত্র হইল। এই যে চারি প্রকার শক্তি—ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধী-শক্তি, এ চারিপ্রকার শক্তির প্রথমে প্রথমটি একাকী, তাহার পরে প্রথম এবং দ্বিতীয় যুগ বাঁধিয়া, তাহার পরে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যোট বাঁধিয়া, পৃথিবীতে যথাক্রমে পরে পরে আবির্ভূত হইল, এবং পরিশেষে যখন প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয়ের উপরে চতুর্থ আবির্ভূত হইল, তখন সর্ব্বপ্রকার শক্তি একত্র সমবেত হইয়া মনুষ্যশরীরের আশ্রয় গ্রহণ করিল। অর্থাৎ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যতপ্রকার শক্তি আছে—ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধীশক্তি—সমস্তেরই কিছু-না-কিছু নিদর্শন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে পুঞ্জীভূত হইল; কোনো প্রকারেরই সংগ্রহকার্য্য অবশিষ্ট রহিল না। শেষরাত্রে প্রত্যূষের হ'ব হ'ব সময়ে পক্ষিকুলের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়, ইহা সকলেরই দেখা কথা।

সেই দিবা এবং রাত্রির সন্ধিস্থানে সূর্য্যের উদ্বোধনী শক্তি (অর্থাৎ ঘুমভাঙানি শক্তি) একাকী অভিব্যক্ত হয়; দ্যোতনাশক্তি, তাপনী শক্তি এবং দাহিকা শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে। তাহার কিছুকাল পরে যখন প্রত্যূষ ফুটিয়া বাহির হয়, তখন সূর্য্যের উদ্বোধনী শক্তির উপরে আর-একটি শক্তি অভিব্যক্ত হয়—সেটি হ'চ্চে দ্যোতনাশক্তি। এই সময়টিতে অর্থাৎ প্রত্যূষের দিবালোকে সূর্য্যের দুইপ্রকার শক্তি অভিব্যক্ত হয় এবং দুই-প্রকার শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে;—উদ্বোধনী শক্তি এবং দ্যোতনা শক্তি অভিব্যক্ত হয়, তাপনী শক্তি এবং দাহিকা শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে। মধ্যাহ্নদিবালোকে সূর্য্যের তিনপ্রকার শক্তি অভিব্যক্ত হয়—একপ্রকার শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে; উদ্বোধনী শক্তি, দ্যোতনাশক্তি এবং তাপনীশক্তি অভিব্যক্ত হয়—দাহিকা শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে। তাহার পরে যদি প্রদাহক কাচের (Burning glass-এর) মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মিকে বস্ত্রাদির উপরে পুঞ্জীভূত করা যায়, তাহা হইলে সেই পুঞ্জীভূত সূর্য্যরশ্মিতে সূর্য্যের সর্ব্বাঙ্গীণ শক্তি অভিব্যক্ত হয়—উদ্বোধনী শক্তি, দ্যোতনাশক্তি, তাপনীশক্তি এবং দাহিকা শক্তি, এই চারিপ্রকার শক্তি একযোগে অভিব্যক্ত হয়। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে তেমনি (অর্থাৎ মনুষ্যরাজ্যে তেমনি) বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাঙ্গীণ শক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে—ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি, এবং ধীশক্তি, এই চারিপ্রকার শক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের চারি কোষ হ'চ্চে (১) ভৌতিক শক্তির আধার —ভূতকোষ; (২) ভৌতিক শক্তি এবং জীবনী শক্তি দুয়ের একাধার—উদ্ভিদ-কোষ; (৩) ভৌতিকশক্তি, জীবনী শক্তি এবং চেতনাশক্তি তিনের একাধার—পশ্বাদিকোষ; (৪) ভৌতিকশক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধীশক্তি, এই চতুর্ব্বিধ শক্তির একাধার—মানবকোষ। তেমনি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের চারি কোষ হ'চ্চে (১) ভৌতিক শক্তির আধার অস্থিমাংস প্রভৃতি অন্নময় কোষ; (২) ভৌতিকশক্তি এবং জীবনী শক্তি দুয়ের একাধার—প্রাণময় কোষ (বলা যাইতে পারে (Vegitative system;) (৩) ভৌতিকশক্তি, জীবনী-শক্তি এবং চেতনাশক্তি তিনের একাধার—মনোময় কোষ (Animal system বা Nervous system); (৪) ভৌতিকশক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধীশক্তি—এই চতুর্ব্বিধ শক্তির একাধার—বিজ্ঞানময় কোষ (Brain)। ইহাই হিরণ্ময় কোষ। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ হ'চ্চে জগতের আদিম প্রকাশ বা আদি-সূর্য্য। * তা ছাড়া, চতুর্ব্বিধ শক্তির সামঞ্জস্যের এবং ঐক্যের একটি কেন্দ্রস্থান বা সন্ধিস্থান বা লয়স্থান বা সমাধিস্থান আছে—সেটা হ'চ্চে আনন্দময় কোষ। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ক্ষুদ্র ব্রহ্মা-

---

* এরূপ ধারণার কারণ কি, তাহা ভাঙিয়া বলিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়; বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার স্থানসঙ্কুলান হওয়া দুর্ঘট। উপনিষদে আছে—"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ।" হিরণ্ময় পরম কোষে বিরজ অখণ্ড ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন—সেই শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি—যাঁহাকে আত্মবিদেরা জানেন। ইহাতেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে. বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড দুয়েরই হিরণ্ময় কোষে ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন, যেহেতু তিনি অখণ্ড। এটাও ভাবে বলা হইয়াছে যে, হিরণ্ময় কোষ এক হিসাবে যেমন সর্ব্বজগতের কেন্দ্রস্থান, আর-এক হিসাবে তেমনি সর্ব্বজগতে পরিব্যাপ্ত। ফলে উহা সেইরূপ-এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতির্ম্মণ্ডল, যাহার উপলক্ষে পাশ্চাত্যপ্রদেশীয় Augustine ঋষি বলিয়াছেন—"whose centre is everywhere but circumference nowhere" কেন্দ্র যাহার সকল স্থানেই—পরিধি যাহার কোনো স্থানেই নাই।

ণ্ডের এইরূপ খাপে-খাপে মিল রহিয়াছে—মিল যখন রহিয়াছে, আর, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের যথাসর্ব্বস্ব যাহা কিছু আছে সমস্তই যখন বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে আসিয়াছে, তখন, পঞ্চকোষের একত্র সমাবেশজনিত যে এক আত্মজ্ঞেয়ের এবং কর্ত্তাকর্ম্মের উভয়াত্মক ঐক্য অনুভূত হয় ও সেই ঐক্যে ভর দিয়া যে এক "আমি আছি" দণ্ডায়মান হয়, সেই যে উভয়াত্মক ঐক্য এবং সেই যে "আমি আছি", দুইই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সার্ব্বাত্মিক ঐক্য এবং সর্ব্বব্যাপী আমি আছি হইতে আসিয়াছে—তা বই, তাহা অকস্মাৎ আকাশ হইতে নিপতিত হয় নাই—ইহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। এবারে যাহা অতীব সংক্ষেপে বলা হইল, আগামী বারে তাহা বিস্তারপূর্ব্বক ভাঙিয়া বলিবার ইচ্ছা রহিল।

এপিক্‌টেটসের উপদেশ।

জ্ঞানী ও অজ্ঞানের ভয়।

১। কোন পদার্থ যখন আমাদের চিত্তে প্রতিভাত হয়, তখন প্রথমেই তাহার প্রতীয়মান রূপটিতেই আমরা অভিভূত অথবা বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি। তাহাতে আমাদের ইচ্ছা-শক্তির কোন হাত থাকে না। উহা আমাদের আয়ত্তের বাহিরে। ঐ পদার্থসমূহের এমনি একটি নিজস্ব শক্তি আছে যে উহা আমাদের অন্তরে বলপূর্ব্বক প্রথমেই একটা অযথা প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু এই প্রতীতিগুলির সত্যতা সম্বন্ধে বুদ্ধির অনুমোদন চাই—এই অনুমোদন দেওয়া, না দেওয়া মানুষের ইচ্ছা-শক্তিসাপেক্ষ। আকাশে একটা ঘোরতর শব্দ হইল, সহসা কোন বস্তুর পতন হইল, কোন বিপদের পূর্ব্বসূচনা হইল, অথবা এই প্রকার আর-কোন-কিছু হইল—তখন তত্ত্বজ্ঞানীরও চিত্ত কিঞ্চিৎ বিচলিত না হইয়া যায় না; তিনি শিহরিয়া উঠিবেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইবে। উহার দ্বারা তাঁহার কোন অমঙ্গল হইবে এরূপ ধারণা-বশে তিনি বিচলিত হয়েন না। পরন্তু বুদ্ধি জ্ঞানের কার্য্য আরম্ভ না হইতে হইতেই, এক প্রকার অচিন্তিত দ্রুত-উৎপন্ন স্বাভাবিক চাঞ্চল্য আসিয়া তাঁহাকে বিচলিত করে। কিন্তু একটু পরেই যখন বিবেচনা করিয়া দেখেন, তখন ঐ প্রতীয়মান পদার্থ-সকল তাঁহার অন্তরাত্মার বাস্তবিক ভয়ের বিষয় বলিয়া মনে হয় না, তৎসম্বন্ধীয় প্রতীতিতে তিনি সায় দেন না, অথবা অনুমোদন করেন না, তিনি উহা অগ্রাহ্য করেন, পরিত্যাগ করেন, তাহাতে এমন কিছুই দেখেন না যাহাতে তাঁহার ভয় হইতে পারে। তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, জ্ঞানী ও অজ্ঞানের মধ্যে এইটুকুই প্রভেদ। অজ্ঞানেরা মনে করে, পদার্থ-সমূহের প্রথম প্রতীতিতে উহাদের যেরূপ ভীষণ ও কঠোর বলিয়া মনে হয়, উহারা আসলেও তাই। উহাদের বুদ্ধিও এই প্রতীতিতে সায় দেয়, অনুমোদন করে। কিন্তু যদিও তত্ত্বজ্ঞানীর মুখ কিছুকালের জন্য বিবর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু তিনি ইহাতে সায় দেন না, অনুমোদন করেন না। এই প্রতীতি সম্বন্ধে তাঁহার মতের কোন পরিবর্ত্তন হয় না; অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তিনি মনে করেন, উহার মধ্যে বাস্তবিক কোন ভয়ের কারণ নাই—উহারা ভীষণ আকার ধারণ করিয়া ফাঁকা ভয় প্রদর্শন করিতেছে মাত্র।

২। আমাদের আত্মা একটি জলপূর্ণ পাত্রের মত। পাত্রস্থ জলের উপর যেরূপ আলোক-কিরণ পতিত হয়, সেইরূপ পদার্থসমূহ-জাত প্রতীতিও আত্মার উপর প্রতিভাত হয়। জল চঞ্চল হইলে, কিরণও

যেরূপ চঞ্চল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আসলে চঞ্চল নহে, সেইরূপ মানুষের মন যখন তমসাবৃত হয়, ঘূর্ণ্যমান হয়, তখনই বিকৃত রূপ-সকল উপলব্ধি হয়, আসল সত্যের কোন বিকার হয় না; যে মনের উপর উহা প্রকটিত হয়, সেই মনেরই বিকৃত অবস্থা প্রযুক্ত উহা বিকৃত ভাবে প্রতীয়মান হয়। সেই বিকৃত অবস্থা ঘুচিয়া গেলেই তাহার নিকট বাস্তবিক সত্য আবার স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ পায়।

হূন জাতীয় ফকীর।

কোন সময়ে একজন হূন জাতীয় ফকীর ভিন্নধর্ম্মীদিগের অত্যাচারে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া নির্জ্জন নিরানন্দ প্রান্তরে প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেন তখন তাঁহার সহিত একটী কুক্কুট ও একটী গর্দ্দভ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। গর্দ্দভ তাঁহার বাহন-রূপে ব্যবহৃত হইত। এবং কুক্কুট নিশাবসানে শয্যাত্যাগের সময় জ্ঞাপন করিত। তিনি একটী দীপও সঙ্গে লইয়া ছিলেন। ইহা জ্বালাইয়া তিনি রাত্রে অধ্যয়ন করিতেন।

সূর্য্য ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িল এবং রাত্রি ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু এই দুর্ভাগ্য পথিক বিশ্রাম করিবার কোন স্থান দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে পথশ্রমে একান্ত ক্লান্ত ও অবশ-প্রায় হইয়া তিনি এক গ্রামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাতে মনুষ্যের বসতি ছিল। দেখিয়া তাঁহার মনে বড়ই আনন্দ হইল। ভাবিলেন যেখানে মনুষ্য আছে সেখানে মনুষ্যত্ব, এবং পরের দুঃখ বুঝিবার শক্তি অবশ্যই আছে। কিন্তু তাঁহার এ বিশ্বাস ভ্রমে পরিণত হইল। তিনি এক রাত্রের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন কিন্তু সে কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না—কেহই তাঁহাকে গৃহে স্থান দিল না। কাজেই তিনি নিকটবর্ত্তী অরণ্যের মধ্যে বিশ্রাম স্থান অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইলেন। এবং বলিলেন "হায় এই ভীষণ ঝটিকা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য কাহারও গৃহের একপার্শ্বে স্থান পাইলাম না! কি দুর্ভাগ্য! কিম্বা ইহাই বা কেন বলি; জগদীশ্বর ন্যায়বান্। তিনি যাহা কিছু করেন অবশ্যই মঙ্গলের জন্য। এই বলিয়া তিনি এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন এবং দীপ জ্বালাইয়া পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। এক পরিচ্ছেদ পড়িতে না পড়িতে প্রবল বাত্যায় সহসা তাঁহার দীপটি নির্ব্বাপিত হইল। এবং তিনি কাতর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, কি! অধ্যয়ন করিয়া একটু আনন্দ উপভোগ করিব তাহাও কি ভাগ্যে ঘটিবে না! অথবা সেই ন্যায়পর পরমেশ্বর যাহা কিছু করেন অবশ্যই মঙ্গলের জন্য।

পরে কিয়ৎকাল নিদ্রা যাইবার জন্য তিনি সেই অনাবৃত ভূমিতলেই শয়ন করিলেন। এবং সবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন এমন সময়ে এক নেক্‌ড়ে বাঘ আসিয়া কুক্কুটটীকে বিনাশ করিল। ফকির বিস্ময়ের সহিত বলিলেন "এ আবার কি এক নূতন বিপদ্! অতি সতর্ক ভাবে যে আমার কার্য্য করিত সেই কুক্কুট আজি বিনষ্ট হইল। কে আর নিশাবসানে অধ্যয়ন করিবার জন্য আমার নিদ্রাভঙ্গ করিবে। কিন্তু বিধাতা ন্যায়বান্। আমরা এই মরজগতে কোন্ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম কীট। আমাদিগের মঙ্গলের বিষয় তিনি অবশ্যই আমাদিগের অপেক্ষা বিশেষ-রূপ জ্ঞাত আছেন। এই কথা শেষ হইতে না হইতে বৃহৎ এক সিংহ আসিয়া গর্দ্দভ-টীকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। পথিকের

নিকট আর কেহই রহিল না। তিনি আপন দুঃখে বলিতে লাগিলেন "এখন কি করিব? আমার দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে, কুক্কুট বিনষ্ট হইয়াছে, শেষে এই গর্দ্দভটীও নিহত হইল, সবই গেল!

ঈশ্বর যাহা কিছু করেন সমস্তই মঙ্গলের জন্য এইরূপ চিন্তায় ফকীর অনিদ্রা অবস্থায় রাত্রি যাপন করিলেন। এবং অতি প্রত্যূষে স্থানান্তরে যাইবার জন্য অশ্ব বা অন্যকোন ভারবহনোপযোগী জীবের অনুসন্ধানে গ্রামে গমন করিলেন। কিন্তু একি! সে গ্রামে একটী প্রাণীও যে জীবিত নাই। রাত্রি-যোগে একদল দস্যু ঐ গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল এবং প্রতিবাসীদিগকে নিহত করিয়া তাহাদের গৃহসামগ্রী সকল লুণ্ঠন করিয়াছিল। এই আশ্চর্য্য ঘটনায় ফকীর বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার মনোভাব প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তিনি ভাবের উচ্ছ্বাসে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "জগদীশ্বর, মদীয় পূর্ব্ব পুরুষ-দিগের চিরারাধ্য দেবতা, এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি যে মনুষ্য—এই ক্ষণস্থায়ী জীব অতি অন্ধ এবং অজ্ঞান। তাহাদের রক্ষার জন্য যে সকল কার্য্য করা হয় তাহারা সেই গুলিকেই প্রায় অনিষ্টকর বলিয়া ভাবে, কিন্তু তুমিই কেবল দয়ালু এবং ন্যায়পর। যদি এই সকল নিষ্ঠুর লোক নির্দয় ভাবে আমাকে এই গ্রাম হইতে তাড়াইয়া না দিত তাহা হইলে আমাকেও তাহাদিগের সহিত মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইত। যদি বাত্যায় আমার দীপ নির্ব্বাপিত না হইত তাহা হইলে দস্যুগণ সে স্থানে যাইয়া আ-মাকে হত্যা করিতে পারিত। কুক্কুট ও গর্দ্দভের স্বরে আমার আশ্রয়স্থান জানিতে পারিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে পারিত এই জন্যই আমার সেই দুটী সঙ্গী নিহত হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিতেছি ইহা তোমারি কার্য্য, তোমারি দয়া। চিরদিন তোমার পবিত্র নাম কীর্ত্তিত হউক।

মহম্মদ ও কোরাণ।

মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদ নাতি-দীর্ঘ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার হস্ত পদ স্থূল-স্থিত ছিল। যৌবনে তাঁহার দেহ বলবত্তার পরিচয় দিত। বার্দ্ধক্যে কথঞ্চিৎ স্থূলাকৃতি হইয়া পড়িলেও সুপ্রশস্ত বক্ষের উপর তাঁহার সুগঠিত ও সুপুষ্ট গ্রীবা স্তম্ভখণ্ডের ন্যায় শোভা পাইত। সমুন্নত ললাট, কৃষ্ণ চক্ষু, মিলিত ভ্রূযুগল, ভঙ্গীযুক্ত মুখমণ্ডল, তাঁহার বাগ্মিতা-শক্তির পরিচয় দিত। স্বভাবতঃ গম্ভীর হইলেও তাঁহার সুমিষ্ট হাস্যের আকর্ষণী শক্তি ছিল। তাঁহার দেহশ্রী রক্ত-বর্ণ ছিল; উহা উত্তেজনার সময় আরও গাঢ়-তর হইয়া অলৌকিক দেবশ্রী ধারণ করিত। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, প্রবল মেধা, অদ্ভুত উৎভাবনী শক্তি, তদানীন্তন কালের প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম্মে অভিজ্ঞতা ও সুমিষ্ট-কণ্ঠ-প্রসূত বক্তৃতা লোকের চিত্তহরণ করিত।

আহারে ও বেশবিন্যাসে সংযম ও মধ্যে মধ্যে উপবাস তাঁহার ভাল লাগিত। মস্তকে তিনি টুপি ব্যবহার করিতেন, বলি-তেন শিরস্ত্রাণ স্বর্গে দেবদূতেরাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। নিরবচ্ছিন্ন কৌষেয় বস্ত্রের পরিবর্ত্তে কার্পাস ও রেশম মিশ্রিত বস্ত্রই প্রশস্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন; রঞ্জিত বস্ত্র ও সুবর্ণ অঙ্গুরীয় পরিধান করিতেন না। "ঈশ্বর প্রেরিত মহম্মদ" নামাঙ্কিত রৌপ্য অঙ্গুরীয় তিনি ব্যবহার করিতেন। তিনি দেহশুদ্ধি ও স্নানের পক্ষপাতী ছিলেন;

বলিতেন, পৃথিবীর মধ্যে দুইটি সামগ্রী আমার অতিপ্রিয়, স্ত্রী ও সুগন্ধি দ্রব্য; এই দুইই আমার চক্ষে আরাম দেয় এবং আমাকে প্রার্থনা-প্রবণ করে। পরিচ্ছন্নতা ও সুগন্ধি তৈল ব্যবহারজনিত তাঁহার দৈহিক সুগন্ধ তাঁহার শিষ্যেরা অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

মহম্মদের স্ত্রীসংখ্যা পঞ্চদশ, কাহারও মতে পঞ্চবিংশতি হইলেও মৃত্যু সময়ে নয়টি মাত্র জীবিতা ছিলেন। মেদিনার ভজনালয়ের সান্নিধ্যে প্রত্যেকের বিভিন্ন নিবাস নিকেতন নির্দ্দিষ্ট ছিল। স্ত্রীর আধিক্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে বলিতেন, অধিক সংখ্যক ধর্ম্মবীরের জন্মদানই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁহার এ সঙ্কল্প সিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই। মৃত্যুসময়ে তাঁহার কন্যা (আলির পত্নী) ফতেমাই জীবিত ছিলেন এবং তিনিও পিতার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই কালগ্রাসে নিপতিত হয়েন। ঐ ফতেমার জ্যেষ্ঠপুত্র হাসেনই কালিফের রাজসিংহাসনে বসিতে পাইয়াছিলেন।

মহম্মদ লোকের সহিত ব্যবহারে ন্যায়পর ছিলেন। দেশীয় বিদেশীয়, ধনী দরিদ্র, দুর্ব্বল সবল, সকলকেই তিনি তুল্যভাবে দেখিতেন। জনসাধারণ তাঁহার নিকট স্নেহ দয়া পাইয়া তাঁহ'কে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত। মহম্মদ স্বভাবতঃ কোপনস্বভাব হইলেও আপনাকে বিশেষ শাসনে রাখিতেন; তাঁহার পারিবারিক ব্যবহারও সুমিষ্ট ছিল।

পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহাতে অনেকানেক অলৌকিক (miracle) কার্য্য আরোপিত হইলেও, তিনি স্বীয় জীবদ্দশায় তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন বলিয়া ভান করিতেন না। কোরাণের অলৌকিকতা সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং তাহাই তিনি লোকের নিকট প্রচার করিতেন। শিষ্যগণের নিকট মহম্মদ কর্ত্তৃক বিবৃত কোরাণ অনেক অংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। কোরাণের অংশ সকল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকের নিকট মহম্মদ ব্যক্ত করেন। বিবৃত অংশ সকল শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পার্চমেণ্টে চর্ম্মে কখন বা তালপত্রে লিখিত হইয়া একটি সিন্দুকের ভিতরে স্থান পাইত এবং মহম্মদের এক স্ত্রীর উপর তাহার রক্ষার ভার ছিল; কোন কোন উপদেশ শ্রুতিপরম্পরাও রক্ষিত হইয়াছিল। মহম্মদের জীবদ্দশায় ঐ সমস্ত উপদেশাবলী শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় নাই বা কেহ তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টাও করেন নাই। কোরাণে এই কারণে সঙ্গতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে আবুবেকার ঐ গুলি সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। কোরাণের অনেক অংশ মহম্মদের জনৈক শিষ্য জায়েদ ইবন তাবেতের কণ্ঠস্থ থাকায় তিনি ঐ কার্য্যে নিয়োজিত হন। অপরের স্মৃতির মধ্যে যাহা সঞ্চিত ছিল তাহাও তিনি সংগ্রহ করেন। কিন্তু তাহাতেও কোরাণে পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ বা সুন্দররূপ শৃঙ্খলা সম্যক্‌রূপে রক্ষিত হয় নাই। ঐ সংগৃহীত কোরাণেরই প্রতিলিপি মুসলমান রাজ্যের চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল প্রতিলিপিতে কালক্রমে তারতম্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৃতীয় কালিফ ওথমান ঐ সমস্ত প্রতিলিপি চারিদিক হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রকৃত পাঠ নির্ধারণ করিয়া দেন এবং অন্যান্য সমস্ত প্রতিলিপি ধ্বংশ করিয়া ফেলেন।

কোরাণ শব্দের অর্থ যাহা পড়িবার উপযুক্ত অর্থাৎ পঠিতব্য। কোরাণের

ভাষা অতি অপূর্ব্ব, এমন কি আরবীয় ভাষার আদর্শস্থানীয়। মহম্মদ নিজে যে ঈশ্বর-প্রেরিত, পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যদি তিনি কাহাকেও তৎসম্বন্ধে সন্দিহান দেখিতেন, অমনি তিনি তাহাকে স্পর্দ্ধার সহিত বলিতেন, আচ্ছা কোরাণের ভাষার অনুরূপ এক অধ্যায় লিখ দেখি (কোরাণ দশম অধ্যায়)। বলা বাহুল্য মহম্মদের সময়ে বিজ্ঞ সুলেখকের অভাব ছিল না। লাবিদ ইবন রাবিয়া নামক জনৈক কবি ঐ সময়ে আরবে আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার কবিতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় মক্কা-মন্দিরের প্রবেশদ্বারে উহার একখণ্ড প্রতিলিপি সংলগ্ন করিয়া রাখা হইয়াছিল। সে সময়ে অন্য কেহই তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কবিতা লিখিতে সাহসী হন নাই। কথিত আছে যখন কোরাণের দ্বিতীয় অধ্যায় উহার পার্শ্বে লিখিত হইল, পৌত্তলিক লাবিদ উহার দুই চারিটি কথা পাঠ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন এ যে মনুষ্যের রচনা নয়, ইহা যে ঈশ্বর-প্রণীত; এই বলিয়া তদণ্ডেই তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। কোরাণ গদ্যে লিখিত হইলেও উহার ভাষার লালিত্য ও গাম্ভীর্য্য অনেককেই ঐ ধর্ম্মে আকৃষ্ট করে। মহম্মদের অসাধারণ বাগ্মিতাও বিধর্ম্মী শ্রোতৃবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ ও দীক্ষিত করিতে ত্রুটি করে নাই।

ঈশ্বরের একত্ব স্থাপনেই মহম্মদের গৌরব। তাঁহার মতে যখনই ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হয়, ঈশ্বর ধর্ম্মবীরগণকে সদ্ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য প্রেরণ করেন। মুসা ও ঈশা তাঁহাদের মধ্যে প্রশংসিত হইলেও মহম্মদ নিজে শেষ প্রেরিত ধর্ম্মবীর। ধর্ম্মবীর অবজ্ঞাকারীর জন্য যে ঘোর শাস্তি প্রতীক্ষা করে, তাহার বিষদ বর্ণনা কোরাণের অনেক অংশে স্থান পাইয়াছে। মহম্মদ কোরাণে সামাজিক পারিবারিক বিধি ব্যবস্থা খাদ্যাখাদ্য বিচার দায়াধিকার দানের নিয়ম প্রভৃতি সমস্তই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, ঈশ্বরের নাম ও গৌরব সসম্ভ্রমে কোরাণে লিখিত আছে। ঈশ্বরের নাম অনেকে হাস্য পরিহাসের মধ্যে ব্যবহার করেন। কিন্তু মহম্মদ তাহার বিরোধী ছিলেন।

খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাব মহম্মদকে বিশেষ রূপে স্পর্শ করিলেও ত্রিত্ববাদ তাঁহাকে অবসন্ন করিতে পারে নাই। কোরাণের ৪র্থ অধ্যায়ের শেষ অংশে মহম্মদ বলিতেছেন "ঈশ্বরে বিশ্বাস কর এবং তাঁহার প্রেরিতগণকে বিশ্বাস কর, কিন্তু বলিও না যে তিন ঈশ্বর আছেন; ঈশ্বর এক; তাঁহার আবার পুত্র! হইতেই পারে না। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে যাহা কিছু, তাঁহারই, তাঁহার আশ্রয়ই আমাদের যথেষ্ট"। ৫ম অধ্যায়ে আছে "তাহারা বাস্তবিকই অবিশ্বাসী, যাহারা বলে খ্রীষ্টই ঈশ্বর, খ্রীষ্ট ধর্ম্মবীর ভিন্ন আর কিছুই নহেন, তাঁহার পূর্ব্বেও অনেক ধর্ম্মবীর জন্মিয়াছিলেন।

প্রার্থনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে মহম্মদের অসাধারণ বিশ্বাস ছিল। প্রার্থনাশীল হইবার জন্য কোরাণে যথেষ্ট বিধান আছে। ঈশ্বরের যে অসীম দয়া এ কথা মহম্মদের ন্যায় অল্প লোকেই বুঝিয়াছিলেন। মহম্মদ এক আধারে ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীর। কোরাণ ধর্ম্ম ও সংহিতার মিলন ক্ষেত্র। দানধর্ম্মের ব্যবস্থা কোরাণে যেরূপ দৃষ্ট হয়, অন্যত্র তাহা দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধমর্ণের নিকট সুদ গ্রহণের তিনি বিরোধী ছিলেন। শিষ্যগণকে তৎসম্বন্ধে বিশেষরূপ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। মহম্মদের স্বর্গের বর্ণনায় সুখাদ্য ফল অপ্সরা ছায়া নদীবহুল সুন্দর কাননের বিশেষ উল্লেখ আছে। আরবের মরুভূমির মধ্যে যাঁহার

জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল, তাঁহার পক্ষে ঐ রূপ বর্ণনা অসঙ্গত নহে। মৃত্যুর পরে লোকের যে পুনরুত্থান হয়, মহম্মদের এরূপ বিশ্বাস ছিল।

কোরাণের ১০ম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে মহম্মদ ৪০ বৎসর বয়স হইতে প্রচারব্রত অবলম্বন করেন। ৬৩ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহাবসান হয়। স্ত্রীগণের মধ্যে আয়েসাকে তিনি অধিক ভালবাসিতেন। আপনার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি এক দিন আয়েসাকে স্নেহভরে বলিলেন আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে তোমার মৃত্যু হইলে ভাল হইত, তাহা হইলে চিরনিদ্রার সময় তোমার নিমীলিত নয়নকে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিতাম, তোমাকে অন্ত্যেষ্টি-বসন পরাইতে পাইতাম, তোমার আত্মার কল্যাণের জন্য নিজে প্রার্থনা করিতে পারিতাম। আয়েসা বলিলেন, বুঝিয়াছি, তাহা হইলে অন্য স্ত্রীর সহিত থাকিবার তোমার সুবিধা হইত। তাহাতে মহম্মদ ঈষৎ হাস্য করিলেন; কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আয়েসার নিকট রহিলেন। একমাত্র সন্ততি ফতেমা পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। ফতেমার উপর মহম্মদের অসীম স্নেহ ছিল। আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া প্রার্থনান্তে সমাগত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, যদি তোমাদের কাহারও নিকট অপরাধী থাকি, বল, তাহার প্রতীকার করিতেছি। ইহজীবনে শাস্তিভোগ বরং ভাল, পরজীবনে কখনই তাহা প্রার্থনীয় নহে। মহম্মদ তিনটি আজ্ঞা এই সময়ে প্রচার করেন (১) আরব হইতে প্রতিমাপূজকগণকে বিতাড়িত কর। (২) নূতন দীক্ষিতগণকে তোমাদের সহিত সমান অধিকার প্রদান কর। (৩) প্রার্থনানিরত থাক।

শুক্রবার সমাগত হইল। সাধারণ উপাসনার সময় উপস্থিত। পীড়িত শয্যাগত ক্ষীণ-দেহ মহম্মদ ভজনালয়ে যাইতে অক্ষম। তিনি মস্তকে জল ঢালিলেন, সামর্থ্য ফিরিল না। উঠিতে চেষ্টা করিলেন, মূর্চ্ছা আসিল। আবুবেকারকে উপাসনার ভার দিয়া পাঠাইলেন। শ্রোতৃবৃন্দ অসন্তোষের ভাব দেখাইল। নিরুপায় মহম্মদ আলি ও আল আব্বসের স্কন্ধে ভর দিয়া ভজনালয়ে যাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে শান্ত ও স্থির হইল। তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন আমার সময় আসন্ন দেখিয়া তোমরা ভীত হইয়াছ। জিজ্ঞাসা করি কোন ধর্ম্মবীর কি চিরজীবী হইতে পারিয়াছেন। তোমরা কি মনে কর আমি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিব। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ত সকলই সংঘটিত হয়। কেহ তাহা রোধ করিতে পারে না। যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, আমি তাঁহার নিকট ফিরিব। আমার শেষ আদেশ এই যে তোমরা বিচ্ছিন্ন হইও না, পরস্পরকে প্রীতি সম্মান ও সাহায্য কর, বিশ্বাস ও সাধুকর্ম্মে বর্দ্ধিত হও; ইহাতেই মনুষ্য সমুন্নত হয়, তৎভিন্ন আর সকলই রসাতলে লইয়া যায়। ইহলোক হইতে আমি অগ্রেই বিদায় লইতেছি, তোমরাও আমার পরে আসিবে। মৃত্যু সকলেরই জন্য। আমার জীবন তোমাদের কল্যাণের জন্য ছিল। আমার মৃত্যুতেও তোমাদের কল্যাণ সাধিত হউক। ইহাই মহম্মদের শেষ উপদেশ।

মৃত্যুকে সম্মুখে দেখিয়া মহম্মদ তাঁহার দাসবর্গকে মুক্তি দিলেন। ধন-সম্পত্তি দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিবার আদেশ দিলেন। স্বর্গের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া বলিলেন মৃত্যুর সহিত এই সংগ্রামে ঈশ্বর আমার সঙ্গে থাকুন। অর্দ্ধস্ফুট স্বরে

আয়েসার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া বলিয়া উঠিলেন "ইহাই হউক, স্বর্গে মহিমান্বিত দেবগণের সঙ্গে।" আর বুঝাগেল না। প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল, কিন্তু সে পবিত্র বায়ুর হিল্লোল এখনও সমগ্র মুসলমান-জগতে ঈশ্বরের একত্ব উপাসনার বিশেষত্ব ও দানধর্ম্মের গৌরব বহন ও প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে।

চিন্তার প্রভাব।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

এইরূপই আমরা চিন্তার বিশ্ববিজয়িনী শক্তি দেখিতে পাই। ইহাই আমাদের গৃহের সুখ ও সচ্ছন্দতা আনয়ন করিয়াছে, ইহাই আমাদের জড়প্রকৃতি ও শক্তির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করাইয়াছে, ইহাই আমাদের সুকোমল ভাব সকলকে উন্নত ও পবিত্র করিয়াছে, ইহা বিশ্বপতির অপরিমেয় বিশ্ব-সংসারকে আমাদের হৃদয় ও কল্পনার সম্মুখে ধরিয়াছে। ইহা অতি দরিদ্র লোকের উদ্যানেও স্বর্গের পারিজাত পুষ্পকে প্রস্ফুটিত করিয়াছে। ইহা সর্ব্বদাই গতিশীল কখনও স্থিতিশীল নহে। ক্রমশঃ এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্য জয় করিতে করিতে চলিয়াছে। ইহা কেবল হৃদয়ের অসীম শক্তির নিকটেই কথা কহে। অন্য কাহারও কথায় কর্ণপাত করে না। ইহা সকলের নিকটেই আশার পতাকা উড্ডীন করে। চিন্তাশক্তিকে সহজে উদ্রেক করা যায় না কিন্তু একবার উত্তেজিত হইলে উহা শিরায় শিরায় ধাবিত হয়, মনুষ্যের সমস্ত মন প্রাণকে আচ্ছন্ন করে। একজন কবি বলিয়াছেন,—এইরূপ অবস্থায় ঈশ্বরের সকল ভাবই মনুষ্য-আত্মাতে প্রবেশ করে।

চিন্তাশক্তির কোন সীমা নাই। ইহার উজ্জ্বল অগ্নিময় পথে সকল বাধাবিপত্তি ভস্মীভূত হইয়া যায়। চিন্তাই আমাদিগকে মনুষ্যত্ব লাভে সক্ষম করে। ধর্ম্মজীবনে আত্মচিন্তা একটী প্রধান সহায়। পিথাগোরাস বলিয়াছেন শয়নের পূর্ব্বে অন্ততঃ তিনবার সমস্ত দিবসের কার্য্যকলাপ চিন্তা করিলে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরে মানুষকে লইয়া যাইতে পারে। তিনি বলেন সমস্ত দিন যেখানে যেখানে যাইয়াছ, যাহা যাহা দেখিয়াছ, যাহা যাহা শুনিয়াছ, তাহার মধ্যে কি শিক্ষা করিয়াছ ভাবিবে। এমন কি কর্ম্ম করিয়াছ যাহা তোমার করা উচিত ছিল না, কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলা করিয়াছ, নূতন কোন কু-অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়াছ কি না? এ সকল বিষয়ের চিন্তাতে মনুষ্যকে ধর্ম্মের পথে ও ঈশ্বরের সন্নিধানে লইয়া যায়। আমাদের লক্ষ্য স্থির রাখিতে হইবে। আমাদের গম্যপথে অগ্রসর হইতেছি কি পশ্চাৎপদ হইতেছি ইহা সর্ব্বদা চিন্তা করা আবশ্যক। চিন্তা বাহ্য জগতের উপর তাহার শক্তি চালনা করিয়া যেমন ঘোরতর বিপ্লব সাধন করিয়াছে সেইরূপ অধ্যাত্ম জগতে ইহার রাজ্য বিস্তার করিয়াছে। বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভে, ঈশ্বর জগত ও মনুষ্য মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণে ইহা বিশেষ কার্য্য করিয়াছে ও করিতেছে। দর্শনশাস্ত্র প্রগাঢ় চিন্তার ফল, উপনিষদ পরমাত্ম চিন্তারই ফল। ভারতবর্ষের পরম শ্রদ্ধাস্পদ যোগী ঋষিরা ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের সাধু পুরুষেরা ধ্যানবলেই ঈশ্বরের স্বরূপ ও গূঢ় ভাব সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। চিন্তাই মনুষ্যের বিশেষত্ব। চিন্তাবিহীন মনুষ্য, মনুষ্যপদের বাচ্য নহে। কিন্তু যে সে চিন্তায় মনুষ্য হওয়া যায় না। বাস্তবিক মনুষ্য চিন্তা হইতেই জন্মগ্রহণ

করিয়াছে এবং কখন এক মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তাবিহীন নহে। কিন্তু যে উচ্চ মহৎ ও পবিত্র বিষয়ের চিন্তায় আমাদিগকে উচ্চ মহৎ ও পবিত্র এবং সুখী করে তাহাতে আমরা সহজে ক্লান্ত হইয়া পড়ি সুতরাং সে সকল চিন্তা হইতে আমরা সর্ব্বদাই বিরত থাকি। অনিত্য অসার চিন্তা এবং দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা ও লোকনিন্দার চিন্তাতে আমরা অধিক সময় অতিবাহিত করি। ইহাতে যে আমাদের আত্মার অসদ্গতি ও অকল্যাণ সাধিত হয় সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা ঈশ্বরের উপাসক, আমাদের উপাসনা তখনই সার্থক হইবে যখন আমরা তাঁহার বিশ্বে ও আমাদের অন্তরে তাঁহার কার্য্যকলাপ সকল দেখিয়া তাহারই চিন্তার অনুসরণ করিতে পারিব এবং তখনই আমরা তাঁহার জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যে ভূষিত হইতে পারিব।

Sermons of Maharshi Debendranath Tagore.

(Translated from Bengalee.)

Sermon XLVIII.

Divine Protection.

Though living in the midst of the commotion born of worldly infatuation, we have gathered here and placed ourselves under the protection of God. Though all around us is heard the din of worldliness and there rage quarrels, disputes, malice and slander, we have come here and sought the shelter of the Lord who is above all quarrels and who is holiness itself. We have placed ourselves under the protection of Him who is the fountain of righteousness and the destroyer of sin, though we are beset by envy and malice, sin and suffering, and environed by the guile and disingenuousness of the world. When we find that all around us, in the name of religion and righteousness, deeds of irreligion and unrighteousness are perpetrated, and when we find men about us spending days and nights in merriment and laughter, we save ourselves from their corrupting contagion by seeking the protection of Him who is holiness itself. We have come to God only in the anticipation of having our soul delivered from the tumult of worldly infatuation, from malevolence and revilement, from all impurity and corruption. That is the only expectation that has brought us here under His protection; we have no other prayer to offer to Him but this. Our only prayer is that we may render ourselves holy and worship the Holy God, that with all devotion and a pure heart we may offer to Him our love and reverence, that we may be true Brahmos by placing ourselves under the protection of Him—the Brahma. With this hope in our hearts we have embraced Brahmoism and Brahmoism offers us fruits more precious than we had hoped they would be. As the Ganges cools our bodies when we bathe in its waters, so Brahmoism cools our inner being when it is consumed by the fire of the world's trials and tribulations; as the Ganges slakes our thirst, when we drink its water, so Brahmoism quenches our thirst for knowledge; as the cool soft breeze that blows over the Ganges thrills our physical frame with pleasurable sensations, so Brahmoism by its saving truths infuses joy into our souls. Since we have placed ourselves under the protection of God, we have ever rejoiced in His joy divine. Our soul is sanctified as we cultivate His companionship, and it is invigorated as we worship Him. Hungering, we have asked God for food, and He has appeased our hunger by granting us the truth which is the food for the soul longing for knowledge. Defiled by sin, whenever we have stood before Him with a penitent heart, He

has saved us from the corruption of sin. Enfeebled in soul, whenever we have prayed to Him for spiritual strength, He has vouchsafed vigour unto our feeble soul. He is perpetually with us; who has seen another such a friend and such a well-wisher as the Lord? Fully has He granted us that for which we came to Him. As teacher, He has imparted to us knowledge; as Father, He has given us food; as Mother He has blessed us with affectio.n What power can dissever such a loving God from us? Who is there that can deprive us of the nectar of joy that we drink when we commune with Him in spirit, or of the spiritual strength we gather when we behold His face in its benign aspect? What fear can we have, and what misery and what infatuation can afflict us, when we behold God in our inner being, as the Lord of our souls? For ever does He rescue us from sorrows and dangers and delivers us from sin and suffering. The reward that He is granting us exceeds a thousand times what we had hoped for when we placed ourselves under His protection. Assuming the position of our spiritual guide He is teaching us true wisdom, is sending truth to our understanding, is purifying our hearts, and, having helped our soul to advance in love, wisdom and purity, He leads us into His kingdom where goodness and holiness hold sway for ever and ever. When we first sought, and placed ourselves under His protection, we were then shrouded by a darkness, in the midst of which we yearned to obtain Him; we knew not then that so abundant would be the fruit that we might reap. The more we see of God, the more we discover that there is no end to His mercy, that He showers love on us ceaselessly as the Father and the Mother do on their children. In His presence, our soul has its strength increased a thousand-fold when besieged by dangers; in His presence, death has no terror for us; in His presence, we are not cast down by affliction and the pang of bereavement. Let dispute rage around us, we shall keep our eyes turned towards God. Truths brighten to our mental vision when we gaze into His eyes of love fixed upon us. The heart becomes pure when we offer it to the Lord and none has the power to rob us of that purity. If the enemy comes and severs the body from the heart, the heart lies happily in the lap of the Lord; if he cuts off the head, the living soul within me joins the Soul of the soul and sings His glory. The eternal light that pervades the earth and the heavens and the regions beyond the heavens has for it source and origin the Great Spirit who is centred in this soul as the Life; even if the head is severed from the body, the soul will retain in it the immanent God who is life itself; even if the heart is separated from the body and cast off, it will bear on it the manifestation of His mercy. So deeply imbedded is His mercy in our soul that the destruction of the body will not cause any diminution of His mercy towards the soul. We have been delivered from all fear by placing ourselves under the protection of God. He is daily sending truths to us. At first we knew not much of Him. Through His mercy have we now known Him. He Himself sent into our hearts love for Him, and then He revealed Himself in our understanding as the sole object of our love. Then from His ministrations we learnt truths which no books had ever given us. Then was my thirst for knowledge gratified and the receptacle of my heart filled, and I began to behold His glory everywhere. Then I realized that He who was my God was the God of all countries and of all times and was the Guide of all, the Father of all, and the Mother of all.

সমালোচনা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী নামক মাসিক-পত্রিকার দুই খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পত্রিকা খানি টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি এল মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে আয়ুর্ব্বেদীয় চরকও সুশ্রুতের সুবিখ্যাত অনুবাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। আমরা এই পত্রিকা খানি পাঠ করিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। অনেক সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ও ডাক্তার মহাশয়গণ শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ ইহাতে লিখিয়া থাকেন এবং সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়

প্রত্যেক প্রবন্ধের নিয়ে নিজ মন্তব্য ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে, 'কোঃরুক ?" অর্থাৎ নীরোগ শরীর কাহার ? "বাদসা ও বিষ্ঠা" "শুক্র বা জীবনতত্ত্ব" প্রভৃতি প্রবন্ধ গুলি পাঠ করিয়া স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যায়। আমাদের দেশ এখন বিজাতীয় আচার পদ্ধতি অবলম্বনে এবং বিদেশীয় ঔষধ সেবনে দিন দিন যে প্রকার শারীরিক ও মানসিক অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে এ সময়ে এইরূপ ধরণের একখানি স্বাস্থ্য-তত্ত্ব-বিষয়ক পত্রিকা প্রচলিত না থাকিলে আমাদের চৈতন্য হইবে না। কবিরত্ন মহাশয় আমাদের চৈতন্য দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা ও লেখার ভাব এত সহজ ও সরল যে তাহাতে চিকিৎসা-শাস্ত্রের জটিল তত্ত্বগুলি অতি সহজে পাঠকের মনে প্রবেশ করে এবং পাঠ করিতে করিতে মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিবেকের উদয় হয়। এই পত্রিকা প্রত্যেক গৃহী ও গৃহিণীর পাঠ্য হওয়া উচিত। ইহাতে ভ্রষ্ট রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশানুরাগ ও মানবজীবনের কল্যাণ বৃদ্ধি হইবে। আমরা ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা করি, কবিরত্ন মহাশয় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এই ভাবে স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিতে থাকুন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৫, জ্যৈষ্ঠ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৬৯৮০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬২৩ ৶৯
সমষ্টি	...	৬৯২৮ ৶৯
ব্যয়	...	১১৯।/০
স্থিত	...	৫৭৩।৶৯

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৭৩।৶৯

৫৭৩।৶৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ৩২৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

২৫৲

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু বামাচরণ বসু

২৲

৩২৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২৫৶০
পুস্তকালয়	১২।৶০
গচ্ছিত	৶০
	৬৯৮০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ		...	৪৬॥৶৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		...	২২ ৶৩
পুস্তকালয়	...	...	১ ৶৯
যন্ত্রালয়		...	৪৯ ৶৯
			১১৯।/০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৫, আষাঢ় মাস।

আয়		৭০৩।৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত		৫৭৩।৶৯
		১২৭৭৶৩
ব্যয়	...	৬৯২।/৯
স্থিত	...	৫৮৪৸/৬

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৮৪৸/৬

৫৮৪৸/৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ৬০০৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১৩৲

পরলোকগত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
প্রদত্ত বেঙ্গল বণ্ডেড্ অয়ার হাউসের
সেয়ারের ডিবিডেণ্ট
দাঃ শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়

১৯০৲

৬০০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৮৷৵০
পুস্তকালয়	...	১১৸৶৬
যন্ত্রালয়	...	৭১৸৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১॥০
সমষ্টি	...	৭০৩॥৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৫৪৩ ৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৪৷ ৬
পুস্তকালয়	...	৬ ৻৬
যন্ত্রালয়	...	১০৮৸৵৯
সমষ্টি	...	৬৯২৷/৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৫, শ্রাবণ মাস।

আয়	...	৫৬৯৶৯
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৮৪৸/৬
সমষ্টি	...	১১৫৪/৩
ব্যয়	...	৫৭৫৸৵৩
স্থিত	...	৫৭৮ ৶০

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
৭৮৶০

৫৭৮৶০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৮৫৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮০৲

এককালীন দান।

শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী
৫৲

১৮৫৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৯৸০
পুস্তকালয়	...	৪৷/৬
যন্ত্রালয়	...	৩৪৭॥৶৩
গচ্ছিত	...	১৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১।০
সমষ্টি	...	৫৬৯৶৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩৯৪৷৵৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৩॥/০
পুস্তকালয়	...	৷/৯
যন্ত্রালয়	...	১৫৭॥/০
সমষ্টি	...	৫৭৫৸৵৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি। শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ ও ধনরক্ষক। সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের একপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩ টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

সম্মুখে দুর্গোৎসব। এ সময়ে কর্ম্মচারীদিগের বেতনাদি হিসাবে সমস্ত চুকাইয়া দিতে হয়। এজন্য গ্রাহকগণকে সসম্মানে জানাইতেছি তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনাদের দেয় তত্ত্ববোধিনীর মূল্য ও মাশুল শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

ষোড়শ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

কার্ত্তিক ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৫।

৭৩৫ সংখ্যা

১৮২৬ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

সুখ।*

সুখ সকলেই চায়, দুঃখ কেহই চাহে না। অথচ যাহার শরীর আছে তাহার সুখ দুঃখ দুইই ভোগ হইতেছে, সহস্র চেষ্টাতেও কেহ দুঃখের সম্পর্ক ছাড়িয়া কেবল সুখই পাইতেছেন—এমন নহে। বরং তাহার বিপরীতে দুঃখেরই মাত্রা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে জগতবাসী স্ত্রী পুরুষ আমাদের সকলেরই বুঝিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে এই জগতে দুঃখ অশান্তির কারণ কি? লোকে বলে এবং শাস্ত্রেও দেখা যায় যে এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই, সকল সম্প্রদায়ের লোকেই বলিয়া থাকেন যে, সেই সত্যেরই নাম ঈশ্বর, গড্, আল্লা, খোদা, পরব্রহ্ম ইত্যাদি। মুখে আমরা সকলেই এই কথা বলি অথচ প্রত্যেক সমাজেই অপর সমাজের প্রতি বিদ্বেষ বশত সকলেই আমরা দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করিতেছি। ইহা কি ঈশ্বর নামা একই সত্য মানিবার ফল? কিম্বা যিনি সত্য তাঁহাকে না চিনিয়া, না জানিয়া, তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ঈশ্বর পরমেশ্বর প্রভৃতি একটী বস্তুশূন্য কল্পিত নাম বা শব্দ কেবল মুখে বলিয়া থাকি তাহারই এই ফল? অথবা যথার্থই কি সত্য নামে কোন বস্তু নাই, কেবল নাম কল্পনা মাত্র সার? যদি সত্য নামে কোন বস্তু না থাকেন, ঈশ্বর প্রভৃতি নাম একটী আওয়াজ মাত্র এমন হয় তাহা হইলে ধর্ম্ম কর্ম্ম, জ্ঞান বিশ্বাস, ভজন পূজন, উপাস্য উপাসনা, বিচার আচার প্রভৃতি সমস্তই নিতান্ত পণ্ডশ্রম।

সত্য যাঁহার নাম, যাঁহাকে আমরা ধর্ম্ম বা উপাস্য দেবতা বলি তিনি যদি এই অনন্ত আকাশে কোথাও থাকেন তবে আমরা যখন বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্য আমাদের বিচার পূর্ব্বক অনুসন্ধান করা উচিত যে সেই উপাস্য দেবতা ধর্ম্ম পুরুষ কি ও কোথায়? তাঁহার রূপ কি? আমরা নিজে কোন্ রূপবিশিষ্ট হইয়া কোন্ রূপকে তাঁহার রূপ জানিয়া ধ্যান ধারণা উপাসনা, প্রেম ভক্তি করিব? তাঁহাকে কি বলিয়া চিনিয়া ও কি তাঁহার প্রিয়কার্য্য বুঝিয়া তাঁহার আজ্ঞাপালন করিব? যাহাতে সেই সর্ব্বসুখদাতা প্রসন্ন হইয়া আমাদের সর্ব্বদুঃখ অমঙ্গল দূর

* শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে মহিলা-সমাজে তাঁহারই অন্তঃপুরস্থ কোন মহিলা কর্ত্তৃক পঠিত।

করিয়া মঙ্গলময় সুখ বিধান করিবেন, তাঁহার অস্তিত্ব, রূপ গুণ শক্তি কোথা যে তাঁহাকে চিনিয়া বিশ্বাস পূর্ব্বক তাঁহাতে ভক্তি শ্রদ্ধা দাঁড়াইবে? মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্ব্বক এ বিষয় অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য নহে কি?

সুখ সকলেই চায়, কিন্তু সুখ কি দিয়া হয় ও কে সুখদাতা? মিথ্যা হইতে সুখ, কি, সত্য হইতে সুখ? সকলেই জানেন যাহা নাই তাহারই নাম মিথ্যা। মিথ্যা হইতে কিরূপে সুখ সম্ভবে? যদি সম্ভবে তবে যাহা সত্য অর্থাৎ যিনি আছেন তাঁহা হইতেই সম্ভবে। যিনি সুখ চাহেন ও যাঁহার দ্বারা সুখ চাহেন বা যাঁহার নিকট সুখ চাহেন—যদি ভিন্ন ভিন্ন হন তবে ইহাঁরা কে আর যদি একই হন তবে ইনি কে—সত্য না মিথ্যা? ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত। প্রথমে স্থূল ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করি। স্থূল শরীরের কষ্ট প্রধানতঃ ক্ষুধা তৃষ্ণা। সে কষ্ট নিবারণের জন্য স্থূল পদার্থ যে পৃথিবী তাহার রূপান্তর বা অংশ অন্ন, ও স্থূল জলের প্রয়োজন। অন্ন জল স্থূল পদার্থ হইলেও তাহার অভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া কষ্টে কষ্টে প্রাণ যায়। সময় মত এক বিন্দু জল না পাইলে জ্ঞানী ধ্যানী ধীর বীর সকলেরই জ্ঞান লোপ হয়, মরণান্ত ঘটে। এই স্থূলের অভাবে মানুষের যে কি কষ্ট এবং এই স্থূলকে পাইলে যে কি সুখ তাহার আর যুক্তি দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সূক্ষ্মশরীররূপী যে জীব, অভাব মোচন পূর্ব্বক তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য এই আকাশে প্রকাশমান কি পদার্থের প্রয়োজন? জল জল, ভাত ভাত করিলে বা অন্ন জল দেখিলে বাস্তবিক ক্ষুধা পিপাসা নিবারণ হইয়া সুখ বোধ হয় না, বাস্তব অন্ন জল আহার পান করিলে অভাব মিটিয়া কষ্ট ঘুচিয়া সুখ বোধ হয়। সূক্ষ্ম শরীর বা জীবের অভাব মোচন ও সুখ প্রাপ্তির জন্য কোন বাস্তব পদার্থের প্রয়োজন আছে, কি শুধু শব্দ ও কল্পনার দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হইবে? এই অনন্ত আকাশে সত্য নামা যথার্থ, বাস্তব কোন সূক্ষ্ম শক্তি বা জ্ঞানময় প্রকাশস্বরূপ বা জ্যোতিঃস্বরূপ কেহ বা কিছু আছেন কিনা যাঁহাকে ধারণ বা গ্রহণ করিলে জীবের সূক্ষ্ম শরীরের অভাব জন্য দুঃখ দূর হইয়া সূক্ষ্ম শরীরের পোষণ হইবে ও তাহাতে সুখের উদয় হইবে? আমরা জীব বস্তু। সেই বস্তু সূক্ষ্ম ভাবে প্রকাশমান। কোন্ প্রকাশমান বা জ্যোতিঃস্বরূপ সূক্ষ্ম বস্তু পাইয়া আমরা জীব সমূহ দুঃখমুক্ত হইয়া পরমানন্দে থাকিব?

আমরা বলিয়া থাকি যে জ্ঞান, প্রেম, দয়া, স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি সূক্ষ্ম শরীরের বা জীবের বা আত্মার পোষণের জন্য প্রয়োজন, ইহার অভাবেই সূক্ষ্ম শরীরের বা জীবের কষ্ট অর্থাৎ আমাদের আধ্যাত্মিক দুঃখ। এখানে একটী কথা বুঝিতে হইবে। এই যে জ্ঞানাদি শব্দ ব্যবহৃত হইল ইহা শুধুই কল্পিত শব্দ মাত্র বা ইহার মূলে, সত্য নামা বস্তু আছেন? যদি থাকেন তবে সে বস্তু কি? সেই বস্তু সত্য কি মিথ্যা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে যে আমরা নিজে সত্য কি মিথ্যা? যদি মূলে আমরাই মিথ্যা হই তবে তিনি যে সত্য আছেন তাঁহাকে ধারণ করা আমাদের পক্ষে কিরূপে সম্ভবে? নিজেকে আমরা সকলেই বিশ্বাস করিতেছি যে আমরা সত্যই আছি। তাঁহাকে যে বিশ্বাস করিব তিনি সত্য আছেন ইহা কি দিয়া কিরূপে বিশ্বাস করিব? এ বিষয়ে আলস্য ত্যাগ করিয়া তীক্ষ্ণ ভাবে বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া কার্য্য করা কি উচিত

নহে? যাহাতে সমস্ত দুঃখ কষ্ট ঘুচিয়া সুখ শান্তি লাভ হয় তাহাই কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে?

যদি আমরা সূক্ষ্মরূপে প্রকাশমান জ্যোতিঃস্বরূপকে ধারণ বা অবলম্বন না করি, মিথ্যা বোধে পরিত্যাগ করি তবে আমাদের সূক্ষ্ম শরীর কিসে দ্বারা রক্ষা পাইবে? সে প্রকাশ কোথায় যাহাকে ধারণ করিয়া আমাদের সূক্ষ্ম শরীর রক্ষা হইবে ও আমরা সুখ পাইব? স্থূল সূক্ষ্মের অতীত যে কারণ ভাব তাহার বিষয় কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। স্বরূপ পক্ষে তিনি বা বস্তু যাহা তাহাই প্রকাশমান। কিন্তু উপাধিভেদে প্রকাশ ভাবে স্থূল সূক্ষ্ম সমষ্টিতে আমাদের প্রয়োজন আছে কি না? কষ্ট নিবারণ ও সুখ প্রাপ্তির জন্য স্থূল সূক্ষ্মকে বাস্তবিক আমাদের প্রয়োজন হইতেছে—ইহা প্রত্যক্ষ কি না? আমরা নিজে স্থূল সূক্ষ্মের ক্ষুদ্র সমষ্টি, ইহার দুঃখ বা অভাব দূর করিয়া সুখ বিধানের জন্য স্থূল সূক্ষ্ম ভাবে পূর্ণ পরমাত্মাকে প্রয়োজন কি না? যাহাতে আমরা সর্ব্বপ্রকারে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারি?

হে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা আত্মা গুরু, আপনি সুখ স্বরূপ, আপনাকে ও আমাদিগকে কিরূপ জানিয়া ও কি ভাবিয়া আলিঙ্গনে গ্রহণ করিব যাহাতে সুখ যে বাস্তবিক কি বুঝিয়া মুক্ত স্বরূপে পরম সুখের নিত্য অধিকারী হইব, যাহাতে সর্ব্ব বিরোধ অশান্তি ভুলিয়া পরমানন্দে শান্তিস্বরূপে অবস্থিতি করিতে পারিব। আপনি নিজগুণে আমাদের সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদের সকল শঙ্কা ভ্রান্তি মোচন পূর্ব্বক আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ

১৮২৬ শক, ২৬ এ শ্রাবণ, বুধবার।

কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ব্রহ্মোপাসক হইতে হইলে, কর্ত্তব্য-কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। কর্ত্তব্য কর্ম্ম তিন প্রকার। শরীরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, মনের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শরীর দেব-মন্দির। এই দেবমন্দিরকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে। শরীর সুস্থ না থাকিলে, মন সুস্থ থাকে না। মন সুস্থ না থাকিলে, আত্মা প্রকৃতিস্থ থাকে না। পবিত্র আহার পান ও পবিত্র জলে স্নান করিবে। অঙ্গচালনা, মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ এবং ব্যায়ামচর্চ্চা করিবে। এবিষয়ে আমাদের পূর্ব্বকালের ঋষিরা এবং ক্ষত্রিয়গণ আদর্শস্থল ছিলেন। মনোভাণ্ডারকে পরা ও অপরা বিদ্যা এবং ধর্ম্মরূপ রত্ন দ্বারা শোভিত করিবে। মন জ্ঞানসম্পন্ন না হইলে, মনুষ্য কখন প্রকৃতরূপে সুখী হইতে পারে না। পুরাবৃত্ত সকল কি অপূর্ব্ব সুখের দ্বারই উদ্ঘাটন করে! নিশীথে যখন সকলই নিস্তব্ধ, যখন মৃত্যুর ভীষণ ছায়া সর্ব্বত্র পতিত হয়, তখন কুরুক্ষেত্র, ম্যেরাথন প্রভৃতির যুদ্ধ পাঠ করিতে করিতে কি আনন্দই না উপস্থিত হয়, কেমন করিয়া জগতের উন্নতি হইতেছে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় সকল কেমন ক্রমে ক্রমে কেমন করিয়া সুসম্পন্ন হইতেছে; পুরাবৃত্ত পাঠকালীন কেমন তাহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। কালিদাস, সেক্সপিয়ার, ভবভূতি, স্কট প্রভৃতির কাব্য-শাস্ত্র পাঠ করিলে, মনে কেমন মনুষ্যচরিত্রের জ্ঞান ও পরমানন্দ উপস্থিত হয়! জ্যোতিঃশাস্ত্র আলোচনা করিতে মন কেমন লোক হইতে লোকান্তরে ভ্রমণ

করে। মনকে যেমন বিদ্যা দ্বারা শোভিত করিবে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধর্ম্ম দ্বারাও তেমনি অলঙ্কৃত করিবে। শুভ্র গঙ্গাজলে সুচারু চন্দ্রের আলোক প্রতিফলিত হইলে যে প্রকার শোভা হয়, ধর্ম্মরূপ চন্দ্রালোকে মন তাহা অপেক্ষাও শ্রী ধারণ করে। পাপ-মলিন চিন্তা হইতে মনকে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত রাখিবে। পাপচিন্তা উদিত হইবা-মাত্রই তাহাকে উন্মূলিত করিবে। অশ্বত্থ বৃক্ষের শিকড় যখন অট্টালিকায় প্রথম সঞ্চারিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে অতি সহজেই তুলিয়া ফেলা যায়। কিন্তু সময় দিলে অট্টালিকা না ভাঙ্গিলে আর তাহাকে তুলিতে পারা যায় না। সেইরূপ পাপচিন্তা হৃদয়ে একবার বসিয়া গেলে, পাপানুষ্ঠানে মন পরিপক্ক হইলে, পাপকে পরাজয় করা এক বিষম কঠিন কার্য্য হইয়া উঠে। হয় ত এ জীবনে আর হয় না। অতএব আত্মানু-সন্ধান দ্বারা পাপকে হৃদয় মধ্যে প্রবেশ ও অবস্থিতি করিতে না দেওয়াই কর্ত্তব্য। সুচতুর প্রহরীর ন্যায় জাগ্রত থাকিয়া আমরা যেন মনোরূপ দুর্গকে রক্ষা করি। পাপ-পিশাচী হৃদয়কে মোহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক-রিবে, চক্ষে অনবরত অনুতাপাশ্রু বহিবে, এই কি জীবন ধারণের ফল? “নারিনু ধরিতে মণি, কেবল দংশিল ফণি” এই আক্ষেপ করিতে করিতে কি জীবন কাটিয়া যাইবে? মনের বিষয় সম্বন্ধেই পাপ পুণ্য, অতএব পবিত্র বিষয় ভোগ করিয়া ইহাকে সুস্থ রাখিবে। নিজের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, পরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে। পরপীড়নই মহাপাপ। “পরনিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি ত্যজনা” নি-র্দ্দোষকে দোষী, নিরপরাধকে অপরাধী রূপে লোকের চক্ষে প্রতীয়মান করিয়া, দুর্ব্বৃত্ত লোকে পৃথিবীতে কি যাতনারই অব-তারণা করে! নিরীহ লোকের চক্ষের জল আকর্ষণ করিয়া পিশাচেরা কি ঘোর অত্যা-চারই করিয়া থাকে। “পর্ব্বত পাথারে, ব্যোমে, জাগে রুদ্র উদ্যতবাজ,” এ কথা তাহাদের মনে আইসে না। কিন্তু একদিন আসিবেই আসিবে। পরের ধনে, পরের মানে, পরের শ্রীতে, পরের কোন কিছুতে ঈর্ষা করিবে না।

> “য ঈর্ষুঃ পরবিত্তেষু রূপে বীর্য্যে কুলান্বয়ে।
> সুখসৌভাগ্যসৎকারে তস্য ব্যাধিরনন্তকঃ॥

যেমন পরপীড়ন পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ পরোপকার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জগতে পরোপকার হইতে শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। এখানে সকলের অবস্থা সমান নহে। আবার চিরদিন কাহারও অবস্থা সমান থাকে না। ধনী যদি নির্ধনকে না দেখে, বিদ্বান্ যদি অজ্ঞানকে না দেখে, সবল যদি দুর্ব্বলকে না দেখে, সম্পন্ন যদি বিপন্নকে না দেখে, সৌভাগ্যবান্ যদি দুর্ভা-গ্যকে না দেখে, তবে পৃথিবী এক মহা শ্মশানে পরিণত হয়। তুমি প্রকাণ্ড প্রাসাদে প্রভূত ধনরাশিতে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, অশন বসনে ও সৌভাগ্যসুখে পরিতৃপ্ত রহি-য়াছ, আর তোমার দ্বারদেশে অন্ধ আতুর নিরন্ন লোক ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণত্যাগ করিতেছে। এই জন্যই কি ঈশ্বর তোমাকে প্রভূত ধনরাশির অধিকারী করিয়াছেন? তোমার গাত্রে কৌষেয় বস্ত্র, আর অনাথ দুঃখী দারুণ শীতে একটু ছিন্নবস্ত্রও পরিতে পায় না। তোমার চক্ষের সমক্ষেই তাহার পর্ণকুটীর ভূমিসাৎ হইয়া যায়। সন্তান সন্ততি লইয়া সে সহসা নিশীথে অসহায় ও নিরাশ্রয়। এ ধন যথাযোগ্য পাত্রে দান করিয়া কি পরের প্রতি কর্ত্তব্যসাধন করিবে না? যদি তুমি নিজে তেমন সম্পন্ন না হও, একমুষ্টি ভিক্ষাও কি ভিখারীকে দিতে

পার না ? ঈশ্বর দানের পরিমাণ দেখেন না, কেবল শুভ অভিপ্রায়ই দর্শন করেন। এক বেলাও কি কাহাকে অন্ন দিতে পার না ? কেবল বিকটমূর্ত্তিতে ভিখারীকে তিরস্কার করিতেই শিক্ষা করিয়াছ ? ঐ যে ব্যক্তি অন্ধের যষ্টিস্বরূপ একমাত্র পুত্র হারাইয়া দিবারাত্র অশ্রুপাত করিতেছে, উহার অশ্রুমোচন করিবার ও সান্ত্বনা দিবার শক্তিটুকুও কি তোমার নাই ? এ পৃথিবীতে কত লোক মোহবিকারে বিকৃত হইয়া কি নিদারুণ যন্ত্রণাই সহ্য করিতেছে ! কি আত্মগ্লানির তীব্র বাণেই ক্ষতবিক্ষত হইতেছে। যদি তোমার শক্তি থাকে সদুপদেশ দান করিয়া, কোনরূপে তাহাদিগকে অবজ্ঞা ও অবমাননা না করিয়া কি তুমি তাহাদিগের দুর্দ্দশা দূর করিতে পার না ? আপনার ভোগলালসা খর্ব্ব করিয়া যে ব্যক্তি পরোপকার করে, সে মনুষ্য হইয়াও দেবতা। ঈশ্বর সততই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন, তিনি আনন্দরূপে তাঁহার হৃদয়ে বিরাজমান থাকেন। আর ঈশ্বরের প্রতি কি কর্ত্তব্য, তাহা কি বলিবার বিষয়, না উপদেশসাপেক্ষ। মাতৃগর্ভ-অন্ধকারে যিনি রক্ষা করিয়াছেন, ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি যাঁহার অসীম কৃপায় আমরা লালিত পালিত হইতেছি, তাঁর প্রতি কর্ত্তব্য কি, তাঁহার নিকট কেমন করিয়া কৃতজ্ঞ হইতে হয়, ইহা কি শিখাইয়া দিতে হয়। তিনি কি কেবল ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল দিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন ? পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিয়া কতবারই না তিনি আমাদিগকে বাঁচাইয়াছেন। তাঁর এক নিমেষের করুণা স্মরণ হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। যখন মানুষ পাপরূপ উচ্চ পর্ব্বতশিখরের এমন ধারে পড়ে, যেখান হইতে এক চুল পদস্খলন হইলে তাহার আর রক্ষা নাই, সে অবস্থায় কে আমাদিগকে পশ্চাৎ হইতে ধরিয়া প্রাণদান করেন ? তিনিই, যিনি আমাদের প্রাণদাতা পরমেশ্বর। অতএব তাঁহার প্রতি কি কর্ত্তব্য তাহা একবার মনে ভাবিয়া দেখ, উদাসীনের মত থাকিও না। প্রেমের চক্ষে ভক্তির চক্ষে তাঁহাকে দেখ। তাঁহার আদেশ আত্মার অন্তরতম প্রদেশে শ্রবণ কর, এবং প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক তাহা প্রাণপণে পালন কর। তাঁহার সহবাস-সুখ হইতে এক নিমেষের জন্যও বঞ্চিত হইও না। সকল কার্য্যে তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিও ; তিনি যেদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিবেন সেই দিকেই চলিও। তিনি শান্তি-সমুদ্র। তাঁহাতে দিনে নিশীথে ডুবিয়া থাকিও। তাঁহার করুণা কখন ভুলিও না। বল উৎসাহের সহিত বল,

"কত যে তোমার করুণা, ভুলিব না জীবনে।
নিশিদিন রাখিব গাঁথি হৃদয়ে।
বিষয় মায়াজালে রহিব না ভুলে আর ; ধন
প্রাণ দেহ মন, সব দিব তোমারে।"

হে বিধাতা ! হে জ্ঞানদাতা গুরু ! তুমি আমাদিগকে আপনার প্রতি, পরের প্রতি ও তোমার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম শিক্ষা দাও। এই আমাদের তোমার নিকট প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সার সত্যের আলোচনা।

জ্ঞেয়স্থানের কেন্দ্র।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে আছি'র সহিত আছে'র ঐক্য এবং তাহার অন্তর্ভূত জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের এবং কর্ত্তার সহিত কর্ম্মের ঐক্য—এই সকল ঐক্যের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে ; এবং বিগত প্রবন্ধে ঐ সকল ঐক্যের গোড়া'র বন্ধনগ্রন্থি কোন্-

খানটিতে, তাহার ঠিকানা নির্দ্দেশ করিবার অভিপ্রায়ে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থিত ঐক্যের প্রতি পাঠকের অনুসন্ধানদৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া সেই যে এক সর্ব্বতঃ-প্রসারিত অখণ্ডনীয় ঐক্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত, তাহার নামই বা কি, আর তাহা পদার্থটাই বা কি ?

উপরি-উক্ত ঐক্যের একটা নাম দিতে হইলে "সার্ব্বাত্মিক ঐক্য" এই নামটি আপাততঃ চলিতে পারে। সার্ব্বাত্মিক ঐক্য কি ? না, ইংরাজিতে যাহাকে বলে Organic Unity। উচ্চশ্রেণীর জীবশরীরে, বিশেষত মনুষ্য-শরীরে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, নবদ্বার-পুরের ঘাটিতে ঘাটিতে মস্তিষ্কের সন্তান-সন্ততির পাহারা বসানো রহিয়াছে। তার সাক্ষী বাহুখণ্ড দেখ, দেখিবে—এক প্রহরী বাহুর মূলগ্রন্থিতে, এক প্রহরী কনুই-স্থানে, এক প্রহরী মণিবন্ধে, পাঁচ-পাঁচ প্রহরী পাঁচ-পাঁচ অঙ্গুলিমূলে—নির্নিমেষ-নয়নে জাগিতেছে। এক-এক প্রহরী এক-একটি ক্ষুদ্র মস্তিষ্কপিণ্ড। আনখাগ্র বাহু-খণ্ডে এ যেমন দেখা গেল—আপাদমস্তক সর্ব্বশরীরেই তেমনি। মস্তকের মূলতম মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়া মেরুদণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মস্তিষ্কপিণ্ডের মধ্য দিয়া বিংশতি অঙ্গুলির বিংশতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মস্তিষ্কনিকর পর্য্যন্ত যে একটি নিরবচ্ছিন্ন অখণ্ড ঐক্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহারই নাম দেওয়া হইল সার্ব্বাত্মিক ঐক্য। মস্তকের সহস্রদল পদ্মে সে ঐক্য যোগাসনে-বিরাজমান ঋষি তপোধন। হৃৎপদ্মে সে ঐক্য সিংহাসনে-বিরাজমান ক্ষত্রিয় মহারাজ। নাভিপদ্মে সে ঐক্য আহরণ-ব্যাহরণ (আমদানি-রপ্তানি) প্রভৃতি বাণিজ্য-কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক বৈশ্য মহাজন। সে ঐক্য—রাজা, মন্ত্রী, কর্ম্মচারী ; রথী, সারথি, পদাতিক ; যোগী, ভোগী, জ্ঞানী, কর্ম্মী ; সমস্তই একাধারে। সে ঐক্যের চক্ষু সকল স্থানেই—হস্ত সকল কাজেই। পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে যদি আঘাত লাগে, তবে সে ঐক্যের তৎক্ষণাৎ তাহা গোচরে আসিবে ; হস্তে যদি আঘাত লাগে, তাহা হইলেও তাই ; বক্ষে যদি আঘাত লাগে, তাহা হইলেও তাই। তেমনি আবার, হস্ত হইতে যদি অক্ষররাজি বাহির হয়, তবে ইহা সুনিশ্চিত যে তাহা শরীরের সার্ব্বাত্মিক ঐক্য হইতেই বাহির হইতেছে ; পদ হইতে যদি ভ্রমণকার্য্য বাহির হয়, তাহা হইলেও তাই ; কণ্ঠ হইতে যদি গীতধ্বনি বাহির হয়, তাহা হইলেও তাই। এই যে এক সার্ব্বাত্মিক ঐক্য, যাহা শরীরের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যেকের অভাব সমস্তকে দিয়া এবং সমস্তের অভাব প্রত্যেককে দিয়া যুগপৎ পূরণ করাইয়া লইতেছে—এ ঐক্য কি কেবল ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেই আছে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে নাই ? বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যদি নাই—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিল তবে কোথা দিয়া ? যাহাকে বলা যাইতেছে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, তাহা আর তো কিছু না—কেবল বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের একস্থানের একটা শাখা। শাখাতে রসের সঞ্চার হয় কোথা হইতে ? অবশ্য মূল হইতে।

তুমি হয় তো বলিবে যে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মস্তক হইতে পদপ্রান্ত বড়-জোর সাত-হাত দূরে অবস্থিতি করে ; কিন্তু বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের নভস্তল হইতে রসাতল কোটি-কোটি-যোজন দূরে অবস্থিতি করে। সাত-হাত স্থানের অবকাশ-রন্ধ্র-নিকর অর্থাৎ ঝাঁঝ্‌রি ঐক্যের প্রলেপদ্বারা ভরাট্ করিবার পক্ষে বিশেষ কোনো বাধা দৃষ্ট হয় না,

কিন্তু কোটি যোজনের ব্যবধান পূরণ করা সোজা কথা নহে। কোটি যোজনের দুই পারের দুই বস্তুকে আঁকড়িয়া পাইতে হইলে—তাহা যিনি করিবেন, তাঁহার দৃষ্টি স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল ভেদ করিতে পারিবার মতো তীক্ষ্ণ হওয়া চাই; তাঁহার বাহুদ্বয় স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল পরিবেষ্টন করিতে পারিবার মতো দীর্ঘ হওয়া চাই। ইহার উত্তর এই যে, কিছুই চাই না—কেবল চক্ষু-দুটা উন্মীলন করা চাই। সবিতা দেব কি শতকোটিযোজন দূর হইতে পৃথিবীকে অবলোকন করিতেছেন না? শতকোটিযোজন দূরে থাকিয়াও পৃথিবীর হস্তধারণ করিয়া রাশিচক্রে দৌড়াদৌড়ি করাইতেছেন না?

পিপীলিকার মস্তক এবং পদতলের মধ্যে যেরূপ অল্প ব্যবধান, তাহাতে পিপীলিকা বলিলেও বলিতে পারে যে, হস্তীর পদাঙ্গুলি হস্তীর ললাটশিখর হইতে কোটি-যোজন দূরে অবস্থিতি করে, সুতরাং দুয়ের মধ্যে কোনোপ্রকার ঐক্যের বন্ধন স্থান পাইতে পারে না। তবে কিনা—পিপীলিকার যুক্তি পিপীলিকাকেই শোভা পায়—বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতকে শোভা পায় না। কেন না, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের নিকটে এ-কথা গোপন থাকিতে পারে না যে, হস্তীর মস্তক এবং পদের মধ্যে বিশাল ব্যবধান সত্ত্বেও দুয়ের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন যথেষ্ট দৃঢ়, আর পিপীলিকার মস্তক এবং উদরের মধ্যে অতীব অল্প ব্যবধান সত্ত্বেও দুয়ের মধ্যে বন্ধনের আঁট খুবই আল্গা।

যদি এমন হয় যে, একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্য হইতে দশ ভাই দশ দিকে ছট্‌কিয়া পড়িলে ভ্রাতাদিগের কাহারো তাহা বড়-একটা গায়ে লাগে না, তবে তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, ভ্রাতাদিগের মধ্যে ঐক্যের বাঁধুনি বড্ড আল্গা। কিন্তু যদি এমন হয় যে, দশ ভাইয়ের মধ্য হইতে এক ভাই পৃথক্ হইলে তাহার তো মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হয়ই, তা ছাড়া অপর নয় ভাইয়ের প্রত্যেকেরই প্রাণে আঘাত লাগে, তবে তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, ভ্রাতাদিগের মধ্যে ঐক্যের বাঁধুনি অত্যন্ত সুদৃঢ়। অতএব এটা যখন সকলেরই দেখা কথা যে, পিপীলিকার কিংবা বোল্‌তার শরীর মধ্যদেশে দ্বিখণ্ডিত হইলে তাহার পূর্ব্বার্দ্ধ এবং পশ্চার্দ্ধ উভয় খণ্ডই মিনিট-দশেক ধরিয়া জীবিত থাকে; পক্ষান্তরে, হস্তীর সেরূপ হইলে উভয় খণ্ডেরই যুগপৎ প্রাণবিয়োগ হয়; তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, সার্ব্বাত্মিক ঐক্যের বন্ধনের আঁট পিপীলিকাদেহে বড়ই আল্গা, হস্তিদেহে রীতিমত দৃঢ়। তা ছাড়া, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে এটা একটা নির্ঘাত বেদবাক্য যে, পৃথিবী হইতে সূর্য্য শতকোটি-যোজন দূরে অবস্থিতি করে, ইহা সত্য হইলেও সূর্য্যের জীবনই পৃথিবীর জীবন, সূর্য্যের আলোকই পৃথিবীর আলোক, সূর্য্যের বলই পৃথিবীর বল। এইজন্য বলিতেছি যে, সার্ব্বাত্মিক ঐক্যের নিকটে স্থানাস্থান নাই, কালাকাল নাই, পাত্রাপাত্র নাই, দূর-নিকট নাই, বড়-ছোটো নাই। কিন্তু কি হিসাবে নাই? সত্তা-হিসাবেই নাই। শক্তি-হিসাবে—স্থানাস্থানও আছে, কালাকালও আছে, পাত্রাপাত্রও আছে, দূর-নিকটও আছে, বড়-ছোটোও আছে তার সাক্ষী—সত্তা-হিসাবে (অর্থাৎ শুদ্ধকেবল 'অস্তি-নাস্তি' বিবেচনায়) শরীরের সার্ব্বাত্মিক ঐক্য মস্তকের উচ্চ শিখরেও যেমন—পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতেও তেমনি—উভয় স্থানেই সমান। কিন্তু শক্তিহিসাবে (অর্থাৎ শক্তির কর্ত্তৃস্থানই বা কোথায় এবং কর্ম্মস্থানই বা কোথায়; কে চালক, কে চালিত; এইরূপ চাল্য-চালক-বিবেচনায়) শরীরের

মধ্যে মস্তকই সার্ব্বাত্মিক ঐক্যের প্রধান আসন। সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া সার্ব্বাত্মিক ঐক্য একই ঐক্য—এ কথা খুবই সত্য; কিন্তু এ কথাও তেমনিই সত্য যে, সেই একই ঐক্য মস্তকের উচ্চমঞ্চে সারথিরূপে অধ্যাসীন রহিয়াছে এবং পদযুগে অশ্বযুগল-রূপে যোজিত রহিয়াছে। ফলেও এই-রূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আপনাকে এক বলিয়া ভাবনা করিবার সময় আমরা মস্তিকমণ্ডলেই মনঃসমাধান করি—পদযুগে মনঃসমাধান করি না।

মস্তিকমণ্ডল যেমন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সার্ব্বাত্মিক ঐক্যের প্রধান আসন, দৃশ্যমান সূর্য্য তেমনি সৌর জগতের সার্ব্বাত্মিক ঐক্যের প্রধান আসন; আদিসূর্য্য তেমনি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সার্ব্বাত্মিক ঐক্যের প্রধান আসন। এইজন্য সৌরজগৎকে এক বলিয়া ভাবনা করিতে হইলে সূর্য্যমণ্ডলের প্রতি প্রধানত লক্ষ্য সমাধান করা আবশ্যক হয়;—বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা করেনও তাই। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে সুদূর পুরাকালে সমস্ত সৌরজগৎ ব্যাপিয়া সূর্য্য একাকী অবস্থিতি করিতেছিলেন; কালক্রমে সূর্য্য হইতে গ্রহগণ এবং তাহাদের এক ভগিনী আমাদের এই পৃথিবী মাতা প্রসূত হইলেন। সূর্য্য হইতে পৃথিব্যাদি প্রসূত হইয়াছে বলিয়া সূর্য্যের আর-এক নাম সবিতা কিনা প্রসবিতা।

এ তো গেল পুরাণো কালের পুরাণো কথা। তা ছাড়া, বর্ত্তমানে আমাদের চক্ষের সম্মুখে কি হইতেছে—সে কথাটিরও খবর রাখা চাই; কেন না, সেইটিই কাজের কথা। বর্ত্তমানের সৌর-সমাচার বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলে বিজ্ঞান তাঁহার তান্ত্রিকী ভাষায়—একপ্রকার ছেঁদো কথায়—যে-সকল অদ্ভুত রহস্যকাহিনী বলিতে আরম্ভ করেন, তাহা বিধিমত টীকা এবং ভাষ্যের দ্যোতনা ব্যতিরেকে বুঝিতে পারা সুকঠিন। তাহার মধ্যে প্রধান একটি রহস্যকথা এই যে, খনিগর্ভস্থিত অঙ্গারের ভিতরে সূর্য্যরশ্মি পুঞ্জীভূত রহিয়াছে;—অঙ্গারকে যখনি প্রজ্বালিত করিয়া কাজে লাগানো যায়, তখনি তাহার সেই বহু-পুরাতন কালের সঞ্চিত গুপ্তধন অগ্নি-আকারে প্রকাশ্যে বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা এইখানেই থামিতেছে না; অধিকন্তু আমরা জানিতে চাই এই যে, সূর্য্যরশ্মি কি কেবল অঙ্গারের ভিতরেই সংগোপিত রহিয়াছে—আর কোথাও সংগোপিত নাই?

বিজ্ঞান বলেন এই যে, সকল বস্তুরই অন্তঃপুরে তড়িতের প্রকৃতিপুরুষাত্মিকা যুগলমূর্ত্তি (Negative এবং Positive Electricity) একত্রে নিলীন রহিয়াছে। অন্তঃপুর হইতে বহিঃক্ষেত্রে বাহির হইবার সময় জোড় ভাঙিয়া দোঁহে দুই দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ায়। তাহার পরে কোনো-প্রকার সঙ্কীর্ণ ব্যবধানের দুই পারে দাঁড়াইয়া দোঁহার সহিত দোঁহার যখন চোখো-চোখি হয়, তখন হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে যুগল-তড়িৎ একীভূত হইয়া যায়। তার সাক্ষী—আকাশের বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের উদ্ভাসনে নর-তড়িৎ এবংনারী-তড়িৎ কেমন আগ্রহের সহিত বিচ্ছেদের বাঁধ ভাঙিয়া-ফেলিয়া একত্র সম্মিলিত হয়, আর, তাহা যখন হয়, তখন কেমন তেজের সহিত উভয়ের অন্তর্নিগূঢ় অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ফলে, সকল বস্তুতেই যুগল তড়িৎ একত্রে নিলীন রহিয়াছে বলাও যা, আর, সকল বস্তুতে অগ্নি নিগূঢ় রহিয়াছে বলাও তা—একই কথা। * এই যে অগ্নি,

* শক্তির বহুরূপিতা (Transformation of forces বিজ্ঞানের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত। এক অগ্নি—

যাহা সকল বস্তুরই অভ্যন্তরে নিগূঢ় রহিয়াছে, তাহা পদার্থটা আর-কিছু না— সূর্য্যেরই প্রভাবাংশ। অগ্নি একপ্রকার পৃথিবীস্থ সূর্য্য। তবেই হইতেছে যে, সুদূর পুরাকালেও যেমন, এখনো তেমনি, সূর্য্যের প্রভাবাগ্নি সমস্ত সৌরজগৎ ব্যাপিয়া জলে-স্থলে-অনলে-অনিলে সর্ব্বত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। আসন গুটানো থাকিলেও আসন, বিছানো থাকিলেও আসন; তেমনি, সৌরজগৎ সূর্য্যে বিলীন থাকিলেও তাহা সূর্য্যেরই প্রভাব, সূর্য্য হইতে ছট্‌কিয়া বাহির হইলেও তাহা সূর্য্যেরই প্রভাব।

ছট্‌কিয়া বাহির হওয়ার নামই প্রকটিত হওয়া বা প্রকাশিত হওয়া বা আবির্ভূত হওয়া; আর, আবির্ভূতির প্রকরণ-পদ্ধতি হ'চ্চে দ্বন্দ্বের প্রতিযোগ। জল ডাঙার প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়; ডাঙা জলের প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়; বন-গিরি-নদী-সাগরের বিচিত্র বর্ণসকল পরস্পরের প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়। বর্ণবৈচিত্র্য আলোকের প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়; আলোকও তেমনি আবার বর্ণবৈচিত্র্যের প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়। গোড়া'র প্রতিযোগ হ'চ্চে—প্রকাশ এবং অপ্রকাশের প্রতিযোগ, অথবা, আলোক এবং অন্ধকারের প্রতিযোগ, আর, তাহার আনুষঙ্গিক আর-দুইটি অবান্তরশ্রেণীর প্রতিযোগ হচ্চে—(১) আলোক এবং বর্ণবৈচিত্র্যের প্রতিযোগ; (২) অন্ধকার এবং বর্ণবৈচিত্র্যের প্রতিযোগ; নিম্নে দেখ ঃ—

(১) প্রতিযোগ

আলোক বর্ণবৈচিত্র্য অন্ধকার

(২) প্রতিযোগ (৩) প্রতিযোগ

প্রতিযোগের মুখ্য প্রয়োজনীয়তা প্রকাশেরই জন্য। কিন্তু প্রকাশের সঙ্গে আনন্দের যোগ থাকা চাই, তা নহিলে প্রকাশের সমুচিত সার্থকতা হয় না। প্রতিযোগের পথ দিয়া যেমন প্রকাশ ফুটিয়া বাহির হয়, সংযোগের পথ দিয়া তেমনি আনন্দ ফুটিয়া বাহির হয়। শাস্ত্রের মতানুসারে প্রকাশও যেমন—আনন্দও তেমনি, দুইই সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম। সত্ত্বগুণ বলিতে সত্তা, প্রকাশ এবং আনন্দ, তিনই একসঙ্গে বুঝায়। সত্ত্বগুণ যে সত্তাবাচক, তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। কবিত্ব এবং কবিতা যেমন একই কথা, সত্ত্ব এবং সত্তাও তেমনি। তা ছাড়া, সত্ত্বগুণের মুখ্য ধর্ম্ম দুইটি; একটি হ'চ্চে প্রকাশ এবং আর-একটি হ'চ্চে আনন্দ। খাপছাড়া রকমের প্রকাশে আনন্দ হয় না, চৌকোষ রকমের প্রকাশেই আনন্দ হয়। অন্ধকার এবং আলোকের প্রতিযোগ মাত্রাতীত হইলে একদিকে আলোকের প্রকাশ অতিশয় তীব্রভাব ধারণ করে, আর-একদিকে অন্ধকারের প্রকাশ অতিশয় ভীষণ ভাব ধারণ করে। তাহাতে দর্শকের মন ব্যথিত হয়। প্রতিযোগ দর্শকের চক্ষে-অঙ্গুলি দিয়া দৃশ্য বস্তুসকলের প্রভেদলক্ষণ দেখাইয়া দ্যায়, আর সেইসঙ্গে প্রত্যেকের বিশেষত্ব ফুটাইয়া তোলে। সংযোগ সকলের মধ্যে সদ্ভাব, সামঞ্জস্য এবং শান্তি স্থাপন করিয়া প্রত্যেকের অভাব সকলকে দিয়া এবং সকলের অভাব প্রত্যেককে দিয়া পূরণ করাইয়া লয়। আলোক, বর্ণবৈচিত্র্য এবং অন্ধকারের সুব্যবস্থামতো সংযোগ হইলে, বর্ণবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া অন্ধকার হইতে আলোকে এবং আলোক হইতে অন্ধকারে ওঠা-নাবার পথ সুগম এবং সুখাবহ হইয়া যায়, আর, সেইগতিকে তিনের (কিনা আলোক, বর্ণবৈচিত্র্য এবং অন্ধকারের) প্রকাশও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়,

* উত্তাপ, আলোক এবং তড়িৎ, তিনের একাধার। বস্তু-পক্ষে তিনের মধ্যে প্রভেদ নাই।

আর, প্রকাশের মধ্য দিয়া আনন্দও ফুটিয়া বাহির হইতে পথ পায়। আলোক এবং অন্ধকারের মধ্যে—প্রকাশ এবং অপ্রকাশের মধ্যে—প্রতিযোগের উপলব্ধি খুবই সহজ; কিন্তু দুয়ের মধ্যে সংযোগের উপলব্ধি সাধন-সাপেক্ষ। আলোক এবং অন্ধকার, অথবা অব্যক্ত এবং ব্যক্ত, দুইকে এক করিয়া দ্যাখা-ও যা, আর, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় দুইকে এক করিয়া দ্যাখ্যা-ও তা—একই কথা। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়কে এক দৃষ্টিতে দ্যাখ্যা প্রথম উদ্যমেই সাধকের পক্ষে সম্ভাবনীয় নহে; তাহার পূর্ব্বে জ্ঞেয়জগৎকে একীভূত করিয়া দেখিতে শেখা চাই। প্রথমে আত্মার জ্ঞেয়স্থানে (অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে) সার্ব্বাত্মিক একত্বের দর্শন পাওয়া চাই; তাহা হইলেই বৃক্ষানলে বৃক্ষানল মিশিয়া যেমন দাবানল হইয়া উঠে, তেমনি সম্মুখে বিরাজমান জ্ঞেয়স্থানের একত্ব এবং পশ্চাতে লুক্কায়িত জ্ঞাতৃস্থানের একত্ব, এই দুই একত্ব একত্রে মিলিয়া আত্মার সর্ব্বাঙ্গীণ একত্ব দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে। তাই বলিতেছি যে, প্রথম উপক্রমে আত্মার একত্ব জ্ঞেয়স্থানে অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে দেখিতে হইবে। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডকে একীভূত করিয়া দেখিতে হইবে। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডকে একীভূত করিয়া দেখিতে হইলে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থানে বা সমষ্টিস্থানে বা হিরণ্ময় কোষে লক্ষ্য নিবিষ্ট করা আবশ্যক। শেষের এই কথাগুলি অতীব সংক্ষেপে বলিলাম; বারান্তরে তাহা সবিস্তরে পর্য্যালোচনা করা যাইবে।

মহম্মদ।

মহম্মদের আবির্ভাব সময়ে আরব-দেশ, বিভিন্ন দল বিভিন্ন স্বাধীন সম্প্রদায়ের নিবাসভূমি ছিল। কৃষিকার্য্য ও ব্যবসা অনেকের উপজীব্য হইলেও এবং নগর গ্রামে অনেকের নিবাস নিকেতন থাকিলেও, আরবীয় বহুসংখ্যক লোক বেদিয়ার ন্যায় স্ত্রীপুত্র ও গো মেষাদি লইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। ঐ সমস্ত পর্য্যটনশীল জাতির মধ্যে বিবাদ-কলহজনিত রক্তপাতের অবধি ছিল না। ধনুর্বিদ্যা ও অস্ত্রচালনে তাহারা সিদ্ধহস্ত ছিল। কখন বা তাহারা বিদেশগামী বণিকগণকে পথপ্রদর্শক ও উষ্ট্র দিয়া সাহায্য করিত, কখন বা লুণ্ঠন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া অপরের সর্ব্বনাশ করিত। কঠোরতাময় হইলেও তাহাদের অন্তর একবারে কোমলতা বিবর্জ্জিত ছিল না। নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান অতিথি-সৎকার আশ্রয়প্রার্থী ঘোর শত্রুকেও বিশ্বস্ত চিত্তে তাঁবুর একপার্শ্বে স্থানদানে তাহারা কখন সঙ্কুচিত হইত না।

তৎকালে পৌত্তলিক-ধর্ম্ম আরবে রাজত্ব করিত। কেহ বা আকাশস্থ গ্রহ উপগ্রহকে কেহ বা গঠিত মূর্ত্তিতে উহাদের পূজা করিয়া শিশু কন্যাকে তৎসমীপে বলিদান দিত, কেহ বা সূর্য্য এবং অগ্নির উপাসনা করিয়া ও বিধর্ম্মীকে জীবন্ত আহুতি দিয়া অগ্নির জ্বালাময়ী ক্ষুধা শান্তি করিত। ইসরাএল ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম আরবে নিতান্ত অপরিজ্ঞাত ছিল না। জ্বলন্ত মরুভূমি মধ্যে থাকায় যেমন আরবের বিভিন্ন প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তেমনি সম্প্রদায়গত বিবাদ-বিসম্বাদ এবং ধর্ম্ম ও শাসনগত ঐক্যের অসদ্ভাব আরব্যগণকে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিয়াছিল; তাহাদের সকল শক্তিসামর্থ্য পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধব্যাপারে পর্য্যবসিত হইত; কখন তাহাদিগকে বিভিন্নদেশ অধিকার করিতে অবসর দেয় নাই।

কিন্তু ঈশ্বরের বিধান অন্যরূপ। ঠিক এই বিচ্ছেদ ও কলহের সময়ে অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন মহম্মদ আবির্ভূত হইলেন। চারি-দিকে অনৈক্য অসামঞ্জস্য, তাহার মধ্যে ঐক্যের বীজ রোপণ করিবার আবশ্যক হইয়াছিল; ফলতঃ মহম্মদের আগমনে আরবীয়গণের মধ্যে জলন্ত প্রাণের সঞ্চার হইল; তাহারা একত্বে মিলিয়া অচিরে বিদেশীয় রাজগণের রাজমুকুট হরণ করিতে সাহসী ও সমর্থ হইয়াছিল।

মহম্মদ তেজস্বী ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আব্দাল্লা, মাতা আমিনা। আবদাল্লা রূপে ও গুণে অতুলনীয় ছিলেন। কথিত আছে মহম্মদের জন্মরাত্রিতে সহস্রবর্ষব্যাপী সর্ব্বসেব্য জোরোষ্টার অগ্নি অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত এবং দেবপ্রতিমাসকল সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিল। মহম্মদ দুইমাস মাত্র বয়সে পিতৃহীন হইলেন। শোকে মাতার স্তন্য দুগ্ধ বিশুষ্ক হইল। হালেমার স্তন্য পানে তাহারই গৃহে মহম্মদ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যখন মহম্মদের বয়স তিন বৎসর, কথিত আছে দুইটি দেবদূত স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়েন; তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম গেব্রিয়াল মহম্মদের বক্ষ বিদারণপূর্ব্বক হৃদয় নিষ্কাশিত করিয়া আদম হইতে উদ্ভূত বংশপরম্পরাগত পাপরাশি বিধৌত করিয়া বিশ্বাস জ্ঞান ও আলোকে পূর্ণ করিয়া তাহা আবার মহম্মদে নিহিত করিয়াদেন। হালেমা ভীত হইল এবং নিজের অনিষ্টাশঙ্কায় মহম্মদকে তাঁহার মাতার নিকট ফিরাইয়া দিল। মহম্মদ মাতার নিকট ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রহিলেন; ক্রমে তাঁহার মাতারও মৃত্যু ঘটিল। অগত্যা মহম্মদ পিতামহের নিকট নীত হইলেন; কিন্তু দুইবৎসর পরে ঐ বৃদ্ধেরও লোকান্তর ঘটিল। জ্যেষ্ঠ তাত আবুতালেব মহম্মদকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধের মৃত্যুতে কাবা রক্ষার ভার আবুতালেবের উপর পড়িল। বালক মহম্মদ সেখানে থাকিয়া কাবার বিধি ব্যবস্থা দেখিতে লাগিলেন।

অনেকের মতে মূল্যবান কাবা প্রস্তর আদিম মনুষ্য আদমের সহিত স্বর্গ হইতে ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইয়াছিল। অন্যের মতে কাবা আদমের রক্ষী দেবদূত, স্বর্গ হইতে আদমের সহিত বিতাড়িত হইয়া এক্ষণে মক্কায় প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে। উহার বর্ণ পূর্ব্বে শুভ্র ছিল, তীর্থযাত্রী পাপী মনুষ্যের চুম্বনে অধুনা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে; পুনরুত্থানের সময় উহা আবার পূর্ব্বাকৃতি ধারণ করিয়া নিষ্ঠাবান তীর্থগামীর সুকৃতির সাক্ষ্য দান করিবে। এই কাবা ও তন্নিকটস্থ জেমজেম কূপ অতিপ্রাচীন সময় হইতে পুণ্যদর্শন মহাতীর্থরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। উহাদের রক্ষাভার ঐ সময়ে মহম্মদবংশে সংন্যস্ত থাকে।

মহম্মদের পূর্ব্ব হইতে আরবীয়গণ উপবাস ও প্রার্থনা নিরত ছিলেন। তৎসময়ে কাবার অভিমুখীন হইয়া ত্রিকাল উপাসনার বিধি ছিল। মহম্মদ বাল্যে লেখা পড়া না শিখিলেও বিশেষ বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ছিলেন। প্রতিবৎসর কাবাদর্শনার্থী ও শান্তভাবে মিলিত অসংখ্য তীর্থযাত্রীর যে জনতা হইত, তাহাদের মুখে বিভিন্ন স্থানের জ্ঞান ও ধর্ম্মের আভাস লাভে এবং তাহাদের ঔৎসুক্য ও ঐকান্তিকতা দর্শনে মহম্মদের ধর্ম্ম-জীবন ক্রমে বিকাশ পাইতেছিল।

মহম্মদ বার বৎসরে পড়িলেন, কিন্তু বুদ্ধির প্রাখর্য্য তাঁহার বয়সকে অতিক্রম

করিয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ তাত যে কেবল কাবারক্ষক ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার বিস্তৃত ব্যবসা ছিল। তিনি পুরুষানুক্রমে সিরিয়া ও জিমেন দেশে বাণিজ্য দ্রব্য পাঠাইতেন। বিদেশাগত পণ্যসম্ভার ও লোকের সমাগম মক্কা নগরের রাজপথ গুলিকে প্রায়ই কোলাহলময় করিয়া তুলিত। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ তাত ব্যবসা ব্যপদেশে পণ্য ও যানবাহন লইয়া সিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। পূর্ব্ব হইতে বিদেশ-দর্শনের ইচ্ছা মহম্মদে বলবতী হইয়াছিল। তিনি খুল্লতাতকে বলিলেন, আমাকে কাহার নিকট ফেলিয়া যাইবেন, আমি আপনার সহযাত্রী হইব; স্নেহ-প্রবণ আবু তালেব মহম্মদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না।

মহম্মদ নানা ঘটনার স্থানও নানা জনপদের মধ্য দিয়া পণ্যবাহীগণের সহিত যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সিরিয়ার সান্নিধ্যে আসিয়া উপস্থিত। জর্ডন নদীর অপর পারস্থিত লিভাইটস্‌দিগের নগরে বাণিজ্যের বেশ প্রসার ছিল। এই স্থানে নেষ্টোরিয়ান খ্রীষ্টিয়ানগণের বসতি ছিল। আবুতালেব মহম্মদের সহিত উপস্থিত হইলে উক্ত নেষ্টোরিয়ান মঙ্ক (উদাসীন) গণ তাঁহাদিগকে সাদরে আমন্ত্রণ করিলেন। বাহিরা (সার্জিয়াস) নামক জনৈক খ্রীষ্টীয় উদাসী কথোপকথনে মহম্মদের অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধি ও ধর্ম্মসম্বন্ধে জ্ঞানলিপ্সা দেখিয়া বিস্মিত হয়েন। উভয়ের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রায়ই আলাপ হইত। প্রতিমাপূজার প্রতি বিরাগ এমন কি ক্রুশচিহ্নের প্রতি বিদ্বেষ এইরূপে মহম্মদে ক্রমে দৃঢ় হইতে লাগিল। মহম্মদের স্কন্ধে একটি নাতিবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ দাগ (জড়ুল) ছিল। মহম্মদ যে ঈশ্বরের চিহ্নিত ও প্রেরিত ধর্ম্মবীর, ঐ কৃষ্ণরেখা দেখিয়া লোকে অনুমান করিত। অনেকে বলেন খ্রীউদাসীও ঐ কারণে বালক মহম্মদে অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

মহম্মদ বিদেশ-দর্শনে বিভিন্ন লোকের সহিত আলাপজাত বিচিত্র ভাব লইয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ তাতের সহিত এইরূপ নানা বাণিজ্য ব্যাপারে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিলেন। ষোড়শ বৎসর বয়সে দেখি তিনি পিতৃব্য জোবিয়ারের সহিত বাণিজ্যব্যপদেশে জেমিন যাইতেছেন কখন বা অস্ত্রধারী হইয়া আরবীয় সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে খুল্লতাতের সহিত যাত্রা করিতেছেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত অপরাপর ব্যবসায়ীগণের পণ্য সম্ভার লইয়া তিনি স্বাধীনভাবে সিরিয়া জিমেন প্রভৃতি দূরদেশে যাইতে লাগিলেন; মনুষ্য-চরিত্র-জ্ঞান এই উপায়ে তাঁহাতে স্ফুটতর হইতে লাগিল। মক্কার সান্নিধ্যে মধ্যে মধ্যে মেলা বসিত, তথায় কবিতা সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অর্থাৎ কবির লড়াই প্রায় ঘটিত; বিজয়ী কবিকে পুরস্কারও দেওয়া হইত। মহম্মদ এই সকল অবসর ত্যাগ করিতেন না। সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলি কখন কাবাতে কখন বা কোন ধনীর গৃহে স্থান পাইত।

এই সময়ে খাদিজা (কাদিজা) নাম্নী এক ধনবতী মক্কায় বাস করিতেন। তাঁহার পূর্ব্ব দুই স্বামী একে একে মৃত হয়েন। বিস্তৃত ব্যবসা স্বামীর মৃত্যুতে বিপন্ন দেখিয়া খাদিজা একজন বিশ্বাসী ও অভিজ্ঞ লোকের সন্ধান করিতেছিলেন। মহম্মদের সুনাম শুনিয়া তাঁহাকে ডাকাইলেন। মহম্মদের বয়স এক্ষণে পঁচিশ বৎসর; স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য যৌবনোদ্গমে আরও স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছিল। খাদিজা তাঁহার রূপে ও বিনয়ে

বিমুগ্ধ হইলেন এবং সিরিয়ায় পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিতে সম্মত হইলেন। মহম্মদ তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের অনুমতি লইয়া সিরিয়ায় চলিলেন। খাদিজা মহম্মদের কার্য্যনৈপুণ্যে বিশেষ প্রীত হইয়া তৎপরে তাঁহাকে আরবের দক্ষিণ দেশসমূহে পাঠাইলেন। সেখান হইতেও মহম্মদ কার্য্যসিদ্ধি করিয়া আসিলেন।

খাদিজার বয়স এই সময়ে ৪০ বৎসরে উপনীত হইয়াছিল। তিনি নিজেও বিশেষ বুদ্ধিমতী ছিলেন। মহম্মদের উপর তাঁহার গাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল; ফলে মহম্মদে নানা দৈব সৌভাগ্যের সূচনা দেখিয়া তাঁহাকে বিবাহসূত্রে গ্রথিত করিলেন। মহম্মদ বিবাহসূত্রে যেমন ধনীশ্রেষ্ঠ হইয়া পড়িলেন, তেমনি সততা বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যনিপুণতা গুণে জনসাধারণের বিশ্বাস ও প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

মহম্মদ আর এক্ষণে বালক নহেন। খাদিজার গর্ভে তাঁহার সন্তান সন্ততি হইল। তিনি ব্যবসাব্যপদেশে তখনও দেশবিদেশে যাইতেছেন। জীবিকার জন্য আর লালায়িত নহেন, প্রভূত ধনসম্পত্তির তিনি স্বামী। য়িহুদী ও খৃষ্টিয়ানদিগের সহিত আলাপে তাঁহার ধর্ম্মভাব বিকাশোন্মুখ। খাদিজার নিকট-ভ্রাতা ওরাকা পূর্ব্বে য়িহুদী এক্ষণে খৃষ্টধর্ম্ম লইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট মহম্মদ ধর্ম্মের নানা তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। মহম্মদের স্মরণশক্তিও অত্যাশ্চর্য্য ছিল।

ঐ সময়ে মক্কার মন্দির অসংখ্য প্রতিমায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি বৎসরের ৩৬০ দিনে বিভিন্ন ৩৬০ দেবদেবীর পূজা হইত। ঐসমস্ত দেবতা বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতি হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। মহম্মদ তদ্দর্শনে মনে মনে ক্রমিকই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। বলিতে কি ঈশ্বরের এই বহুত্ব দেখিয়া একত্বের ভাব তাঁহার অন্তরে জাগিতেছিল।

কথিত আছে মহম্মদ অবসর পাইলেই জনকোলাহল হইতে বিদায় লইয়া মক্কার উত্তর হারা পর্ব্বতের নির্জ্জন স্থানে যাইতেন। কখন কখন সমস্ত দিবসরাত্রিব্যাপী উপাসনা ও চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার বাহজ্ঞান বিলুপ্ত হইত, তিনি যেন স্বপ্ন দেখিতেন। খাদিজা লুকায়িত ভাবে তথায় যাইয়া স্বামীর এই সমস্ত অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ফিরিয়া আসিতেন। পরে মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার সদুত্তর পাইতেন না।

মহম্মদ ক্রমে চল্লিশ বৎসরে উপনীত হইলেন। রমজান মাস আসিল। অনশনব্রতাবলম্বী মহম্মদ প্রার্থনা ও ধ্যানে নিমগ্ন। সেই রজনী আসিয়া উপস্থিত, যে নিশায় কোরাণের মতে দেবদূতেরা মর্ত্ত্যে অবতরণ করেন। বস্ত্রাচ্ছাদিত ধ্যাননিমগ্ন মহম্মদ পড়িয়া রহিয়াছেন। জ্বলন্ত তীব্র আলোক চক্ষে আসিয়া পড়িল। মহম্মদের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। ক্রমে সংজ্ঞার ঈষৎ উন্মেষ, দেখিলেন দেবদূত মনুষ্যমূর্ত্তিতে অদূরে উপস্থিত। ঐ দেবদূত সম্মুখে অক্ষরখচিত কৌষেয় বস্ত্র অনাবৃত করিয়া বলিলেন "পাঠ কর"। মহম্মদ বলিলেন পড়িতে জানি না। দেবদূত পুনরায় বলিলেন বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের নামে "পড়", যিনি রক্তবিন্দু হইতে মনুষ্য রচনা করিতেছেন। ভূমা ঈশ্বরের নামে পড়, যিনি মনুষ্যকে লিখিতে শিক্ষা দেন, যিনি মনুষ্যের আত্মায় জ্ঞানরশ্মি বিকীর্ণ করেন। মহম্মদের জ্ঞানচক্ষু সেই দৈব আলোকে খুলিয়া গেল এবং সেই কৌষেয় বস্ত্রে খচিত বর্ণ পাঠ করিতে পারি-

লেন; দেখিলেন তাহা ঈশ্বরের আদেশ যাহা কোরাণে পরে নিবদ্ধ হইল। মহম্মদ কাঁপিতে কাঁপিতে খাদিজার নিকট ফিরিলেন। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, বুঝিতে পারিতেছেন না, যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা সত্য না ভ্রান্তি। খাদিজা সমস্তই শুনিলেন। খাদিজা স্নেহ ও প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া এবং মহম্মদে পূর্ব্ব সূচনা সমস্তই স্মরণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন তুমি প্রকৃতই ধর্ম্মবীর ও ভবিষ্যদ্বক্তা। ঈশ্বর কখনই তোমাকে লজ্জিত হইতে দিবেন না। ওরাকাও সেই কথায় সম্পূর্ণ সায় দিলেন।

ক্রমশঃ।

গত মাসে প্রকাশিত "মহম্মদ ও কোরাণ" নামক প্রবন্ধের বিরুদ্ধে সেখ জমিরদ্দীন সাহেবের প্রেরিত সমালোচনা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তিনি বলেন যে মহম্মদের স্ত্রী-সংখ্যা চতুর্দ্দশ, তদপেক্ষা অধিক ছিল না। অধিকসংখ্যক ধর্ম্মবীরের জন্মদান তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। স্ত্রী মিসনরী করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। মহম্মদবিবৃত কোরাণে সামান্য পরিবর্ত্তন কখনও ঘটে নাই। আসল কোরাণ মহম্মদের কণ্ঠস্থ থাকিত, এবং তাহাই তিনি অপরকে শিক্ষা দিতেন। আয়েসাকে তিনি অধিক ভালবাসিতেন না। পরিশেষে ইহাও বলিয়াছেন যে ব্রাহ্ম-ভ্রাতারা মহম্মদের উপর ভক্তিমান নহেন। তদুত্তরে বলিতে চাই যে হজরত মহম্মদের উপর আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা না থাকিলে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতাম না। আমাদের প্রবন্ধের ভিতরে মহম্মদ সম্বন্ধে একটি বিরুদ্ধ বাক্য দেখাইতে সমালোচক সাহস করেন নাই। মহম্মদের জীবন সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিয়াছি, সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ইংরাজি গ্রন্থ তাহার অবলম্বন। সমালোচক যদি পাঠ করিয়া না থাকেন তবে তাঁহাকে সেল সাহেব কৃত কোরাণের ভূমিকা এবং ওয়াসিংটন আরর্ভিং সাহেবের (১৮৫০ সালে প্রকাশিত Lives of mahomet and his successors) মহম্মদ-জীবনীর প্রথম খণ্ডের ৩১৪ পৃষ্ঠা হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উহা হইতেই সমালোচক বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের প্রবন্ধের কোন কথা ভিত্তিহীন বা অমূলক নহে।

লেখক।

আশ্রয়।

জননী তোমার সেই পুণ্যপথ খানি
কোথা যে তুমিই জান! লহ লহ টানি
তোমার কল্যাণ মাঝে উদার সুন্দর,
বিপথ-প্রস্থিতে এই! নিত্য নিরন্তর
দুর্ভর সন্দেহভারে জর্জ্জরিত হায়
দিগ্বিদিক নাহি জানে জন্ম অন্ধতায়
ব্যর্থচেষ্টা দুর্ব্বলের! তুমি যদি তারে
ভুলায়ে মঙ্গলপথে বারে বারে বারে
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ওগো নিত্য নিশিদিন
নাহি লয়ে যাও টানি, অনতি প্রবীণ
পথকোথা পাবে হায়? কেহ নাহি যার
বল নাই বুদ্ধি নাই নাহি আপনার
কিছুই নির্ভরযোগ্য, জাগ্রত-দুর্গতি
যে শুধু, ত্যজিবে তারে তুমি বিশ্বপতি?

ক্ষমা।

দুর্ব্বল দুশ্চেষ্টা যত, ক্ষণ অবসাদ
যত অশ্রু, যত তৃষ্ণা, মোহান্ধ প্রমাদ,
যতলোভ, গ্লানি যত, তার পরে, নাথ,
তারপরে ক্ষমা-স্নিগ্ধ কৃপাদৃষ্টি পাত
কর দান হে করুণ! ভাল যাহা কিছু
মনে করি, মনে হয়, ভয়ে ক্ষোভে নীচু
করি এ উদ্ধত শির, হে আশ্রয়, মাগি
তার তরে ক্ষমা তব; নিত্য রহি জাগি
সে মহা দানের হায় চাহি পথ পানে—
তারি তৃষ্ণা অপেক্ষায়—অনিদ্র নয়নে
আতুর সুদীর্ঘ ভিক্ষা রহুক বসিয়া
আবদ্ধ অঞ্জলিপুট! অতি-শূন্য হিয়া
ধূলি লিপ্ত অতি-লাজে পদান্তে লুণ্ঠিত;
অভয়-কণিকা দেহ স্নেহ অকুণ্ঠিত!

পুণ্যাহ।

বিগত ৭ আশ্বিন তারিখে পুণ্যশ্লোক পরম পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষিদেবের কটক জেলার অন্তর্গত তালুক পাণ্ডুয়ার শুভপুণ্যাহ উপলক্ষে তত্রত্য কাছারী-বাটীতে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। ব্রহ্মোপাসনার পর যে ও উপদেশ পঠিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আজ আমাদের কি সৌভাগ্য! সম্বৎসর পরে সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় পিতাকে ভক্তির সহিত পূজা করিবার জন্য আজ আমরা এ প্রদেশের নববর্ষের প্রথম দিনে, শুভ পুণ্যাহের উৎসব দিবসে, সকলে এখানে সমবেত হইয়াছি। যাঁহার নিয়মে সূর্য্য প্রতাপান্বিত হইয়া সমুদয় ভুবনে তেজ বিতরণ করিতেছে; যাঁহার নিয়মে সুধাকর

চন্দ্র উদয় হইয়া নির্ম্মল সুধা বর্ষণ করিতেছে; যাঁহা হইতে এই স্থাবর জঙ্গম সমুদয় বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে; এবং যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাহারা সকলে স্থিতি করিতেছে; যিনি পিতার ন্যায় আমাদিগকে সতত রক্ষা করিতেছেন; যিনি বন্ধুর ন্যায় আমাদিগকে নিয়ত সুপথে পরিচালিত করিতেছেন; যিনি সদা সর্ব্বদা আমাদিগের নিকট অভয়-মঙ্গল-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে অভয়দান করিতেছেন; যিনি নিয়ত আমাদিগের শারীরিক সুখ বিধান করিতেছেন ও আত্মাকে পোষণ করিতেছেন; যিনি আমাদিগকে পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিয়া অমৃতনিকেতনে লইয়া যাইতেছেন; যিনি সুখে দুঃখে, সম্পদে, বিপদে সৌভাগ্যে দুর্ভাগ্যে সর্ব্বদা আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন; যিনি আমাদের ইহকাল ও পরকালের নিয়ন্তা; আইস আজ আমরা এই নববর্ষের প্রারম্ভে তাঁহার পবিত্র চরণে প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি; তাঁহার চরণে প্রণিপাত করি। হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের হৃদয়ের প্রথম প্রীতি-পুষ্প গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর, আমাদের সকলের উপর তুমি এই আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর, যেন আমরা বর্ত্তমান বৎসর সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারি। হে প্রভো! সমবেত প্রজামণ্ডলীর উপর তোমার শুভ আশীর্ব্বাদ অবতীর্ণ হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউক, দীন হীন প্রজাগণের অন্নকষ্ট দুর হউক, অদ্যকার উৎসব সার্থক হউক, জগতে তোমার নাম ধন্য হউক।

এই বিশাল সম্পত্তির যিনি অধিপতি, যাঁহার শুভ পুণ্যাহোৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা করিবার জন্য আমরা সকলে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি; তিনি একজন সাধু মহাপুরুষ। তিনি পৈতৃক অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও, সত্যের সন্ধানে যুবা বয়সে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, বন, উপবন, পর্ব্বত, প্রান্তর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করতঃ সংযত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার একাগ্রতা, অচল ধর্ম্মনিষ্ঠা, ব্রহ্মযোগ ও তপশ্চর্য্যার ফলে তিনি মর্ত্ত্যভূমে থাকিয়া ঈশ্বরলাভ করিয়াছেন। "সর্ব্ব মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের আহ্বান শুনিয়া পরম পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষিদেব যখন জনসাধারণের সম্মুখে ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া উপস্থিত হন, তখন তাঁহার অন্তরে ব্রহ্মসাধনের প্রকৃষ্ট উপায় যাহা ঈশ্বর প্রসাদে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান স্বরূপ জ্বলন্ত ভাষায় সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই ব্যাখ্যান পাঠ করিয়া শত শত লোকের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইতেছে। তিনি যেমন একদিকে সাধু মহাপুরুষ, অন্য দিকে তিনি আশ্রিতবৎসল ও প্রজাপালক। তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া বিস্তর লোক প্রতিপালিত হইতেছে। তাঁহার অধীনে থাকিয়া প্রজাকুল অতুল সুখ সচ্ছন্দ ভোগ করিতেছে। গত বৎসর আমাদের ভক্তিভাজন ধর্ম্মপিতা এবং আশ্রিতবৎসল ও প্রজাপালক মহর্ষিদেবের সংকট রোগ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বরের অপার করুণা ও নিজের অতুল পুণ্যবলে তিনি আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এজন্য হে দয়াময় প্রভো! আজ আমরা তাঁহারই কাছারীতে বসিয়া, তোমাকে কোটিকণ্ঠে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। তুমি তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের দীর্ঘায়ু প্রদান কর, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

হে সমবেত প্রজাবর্গ! ধর্ম্মের তুল্য বন্ধু আর আমাদের কেহই নাই। ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের বল, ধর্ম্মই পুরুষদিগের পৌরুষ, ধর্ম্মই নারীগণের অলঙ্কার, ধর্ম্মই সুখ লাভের উপায়, ধর্ম্মই আত্মপ্রসাদের আকর। ধর্ম্ম ব্যতীত এই দুস্তর সংসার-অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই। অতএব তোমরা সর্ব্বপ্রযত্নে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর। ানে যদি আপাততঃ কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয়, তথাপি ভীত হইয়া তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হইও না। দ্বিগুণ অনুরাগের সহিত শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে সেই

মঙ্গলময় পিতার শরণাগত হইয়া পবিত্র হৃদয়ে ধর্ম্মপালন কর, তাহা হইলে ইহকালে তোমাদের সকল প্রকার কল্যাণ হইবে, তোমাদের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা, পাপতাপ দূরীভূত হইবে, তোমাদের হৃদয় পবিত্র হইবে, জীবন মধুময় হইবে, আত্মা উন্নত হইবে। ধর্ম্মাচরণ করিলে তোমাদের শরীর পুষ্ট হইবে, হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইবে, হৃদয়ে দেবভাব আসিয়া উপস্থিত হইবে, এবং পরকালে তোমাদের সৎগতি হইবে। তোমরা যদি ধর্ম্মকে সহায় কর, এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর কর, তাহা হইলে তোমাদের পরমগতি লাভ হইবে।

হে পরমাত্মন্! আমরা এই পৃথিবীর দারুণ কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি; আমরা নানা প্রকার ভয়ে, ক্লেশে ও গ্লানিতে সর্ব্বদাই শঙ্কিত ও ভীত হইয়া পড়িয়াছি। হে প্রভো! তুমি আমাদের অভয়দাতা পিতা, জ্ঞান-দাতা গুরু, স্নেহ-দাতা মাতা। তুমি আমাদিগকে সৎপথে লইয়া যাও, তুমি আমাদিগকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা কর। হে পিতঃ! এই পাপময় দুঃখময় সংসারে তুমি ভিন্ন আর আমাদের অন্য গতি নাই। আমরা তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি আমাদিগকে অধর্ম্ম হইতে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া সৎপথে সমুন্নত কর, আমাদিগকে অভয়দান কর, তোমার মঙ্গলভাব আমাদিগের নিকট প্রকাশ কর, সংসারের মোহ অন্ধকার হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া তোমার দিকে লইয়া যাও। তোমার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা ও ভিক্ষা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৭৫, ভাদ্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪৪৩৴০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৭৮৶০
সমষ্টি	...	১০২১।০
ব্যয়	...	৪০০৴৯
স্থিত	...	৬২১৵৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন একাকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ১২১৵৩

৬২১৵৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৮০॥৵০

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৮০৲

দানাধারে প্রাপ্ত ॥৴০

১৮০॥৵০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		২৪৲
পুস্তকালয়	...	১॥৶০
যন্ত্রালয়	...	২৩৫।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১॥০
সমষ্টি		৪৪৩৴০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৬৪ ৴৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৩১॥৴৬
পুস্তকালয়	৶৯
যন্ত্রালয়	১০৩॥৵০
	৪০০৴৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি। শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ ও ধনরক্ষক। সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের একপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩ টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২৬ শক, ২২ ভাদ্র বুধবার।

উপদেশ।

"যোবৈ ভূমা তৎ সুখন্নাল্পে সুখমস্তি।"

সম্মুখে অনন্ত বালুকাময় মরুভূমি ধূধূ করিতেছে, উপর হইতে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণ বর্ষণ করিতেছে। পথিক তাহার উপর দিয়া চলিতেছে। তৃষ্ণায় তাহার কণ্ঠ তালু শুষ্ক। দেখিল তাহার নিকট আর কিছু মাত্র জল নাই। কর্দ্দমাক্ত শেষ বারিবিন্দুও ফুরাইল। জল পাইতে যত চেষ্টা করে, যাতনা তত বৃদ্ধি হয়। তাহার চক্ষু কর্ণ মুখ মরুভূমির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকণায় পূরিয়া গেল। পরিশেষে বোধ হইতে লাগিল, এক পাত্র শীতল জলের পরিবর্ত্তে তৎসমপরিমাণ স্বর্ণ দিলেও ঠকা হয় না। এই অবসরে যখন পথিকের শরীর ক্লিষ্ট, মন ব্যাকুল, তখন সে অভূতপূর্ব্ব এক পদার্থ দেখিতে পাইল। দেখিল, দূরে বৃহৎ এক হ্রদ রহিয়াছে, ইহার তটপ্রদেশ সুন্দর সুন্দর তালবৃক্ষ দ্বারা শোভিত; হ্রদের মধ্যভাগ নয়নরঞ্জনকর হরিদ্বর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিপূর্ণ; উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্যে এই জলের দর্শণ আকর্ষণী-শক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই শোভনদৃশ্য দেখিয়া তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পথিক ব্যগ্র হইয়া, সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। যত অগ্রসর হয়, ততই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পায়। সে যত অগ্রসর হইতেছে, জল তত পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেছে। পরিশেষে ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিশ্রম ও নিরাশায় মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে পতিত হইল। বুঝিল সকলই ভ্রান্তি। সে মরুভূমির মরীচিকায় প্রতারিত হইয়াছে।

একদা আরটিক্ সমুদ্রে কয়েক জন ইংরাজ জাহাজে করিয়া যাইতেছিল, দেখিতে পাইল সমুদ্রের কূলে এক প্রকাণ্ড পুরাতন সহর রহিয়াছে। তন্মধ্যে দুর্গের ভগ্নাবশেষ, পর্ব্বতোপরি গির্জার চূড়া প্রভৃতি দৃষ্ট হইতেছে। আবার শত শত খিলান বিশিষ্ট একটা সেতু দৃষ্ট হইল, পরক্ষণে আর কিছুই নাই। তাহার স্থানে তৎক্ষণাৎ অন্য বস্তু আসিয়া উপস্থিত। ইহাও নিশ্চয় সেই মরীচিকার কার্য্য। এই মরীচিকা দৃষ্টে আমরা পৃথিবীর সুখ ও ইহার অনিত্য-

তার বিষয় শিক্ষা করিতে পারি। মরীচিকার সহিত সংসারসুখের কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! কোথায় সে মথুরা, কোথায় অযোধ্যা, কোথায় কারথেজ! ইহাদের ভগ্নাবশেষোপরি বসিয়া এখন পথিক পার্থিব গৌরব ও কীর্ত্তির নশ্বরতার বিষয় আলোচনা করিয়া বৈরাগ্য শিক্ষা করিতেছে। এখানে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যে সুখের আশা তাহা দুরাশা মাত্র। সে নিশার স্বপ্ন।

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে, বাড়ায় মাত্র আঁধার,
পথিক ধাঁধিতে।
মরীচিকা মরুদেশে নাশে প্রাণ তৃষ্ণাক্লেশে,
এ তিনের ছল সম, ছলয়ে এ কু-আশায়।

এই দুরাশার বশীভূত হইয়া এখানে কেহবা আমোদ, কেহবা উচ্চ অভিলাষ, কেহ বা অর্থের মরীচিকায় প্রতারিত হইতেছে। এখানে মনুষ্য যদি ন্যায়পথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহা দ্বারা আত্মরক্ষা করে, তবে তাহাতেই স্বর্গসুখ উপস্থিত হয়। কিন্তু মনুষ্য কি তাহাই করে? ইহার অসৎ ব্যবহার করিয়া, কুৎসিৎ আমোদে প্রবৃত্ত থাকিয়া, অহঙ্কার চরিতার্থ করিয়া, পরপীড়ন করিয়া, পরের অশ্রু আকর্ষণ করিয়া, মনুষ্য হইয়া পিশাচরূপ ধারণ করে। হায়! ধার্ম্মিকের হস্তে অর্থ স্বর্গের শিশির বিন্দুর ন্যায় কার্য্য করে। একবার অর্থের প্রকৃতি বিচার করিয়া দেখ, বহুকষ্টে ইহা উপার্জ্জিত হয়। আবার ভোগের সময় হয় ত উপার্জ্জনকারী পৃথিবী হইতে অপসৃত হইয়া যায়। কোন ধনী লোক চারিআনা বাঁচাইবার জন্য রাত্রিতে হাঁটিয়া বৃষ্টি বাদলে পথ চলিতেন। এইরূপে তিনি অর্থ সঞ্চয় করিয়া ছিলেন। মৃত্যুর পর সেই অর্থ তাঁহার শত্রুর হস্তগত হইল; পূর্ব্বে জানিতে পারিলে তিনি এরূপ করিয়া কখনই অর্থ সঞ্চয় করিতেন না। একদা স্কট্‌লণ্ড দেশীয় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া, কোন একটা ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর উঠিয়াছিলেন। তাহার উপর হইতে তাঁহার অধিকারস্থ সমস্ত ভূমিসম্পত্তি দেখা যাইতেছিল। তিনি তাহার সঙ্গীকে বলিলেন, দেখ, যতদূর চক্ষু চলে, ততদূর আমার অধিকার। তাহাতে তাঁহার সঙ্গী বলিলেন, নিশ্চয়ই আপনি সুখী। ইহা শুনিয়া ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উত্তর করিলেন, এই সমস্ত প্রদেশের মধ্যে আমার মত অসুখী আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাইবে না। আবার কোনও একজন বিরাগী পুরুষ বুঝিয়াছিলন, যে রাশীকৃত ধন শান্তিপূর্ণ নির্ম্মল হৃদয়ের নিকট কিছুই নহে। তিনি মৃত্যুকালে বলিয়া ছিলেন, যে, যে ব্যক্তি বিশেষ করিয়া তাঁহার প্রত্যয় জন্মাইতে পারিবেন, যে নরক নামে কোন স্থান সৃষ্টির মধ্যে নাই তিনি তাহাকে প্রভূত অর্থ দান করিবেন। প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়া ফণ্টহিলের বেকফোর্ড বৃথাই তাহা নষ্ট করিয়াছিলেন। সেই ধনের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে, বহুল পরিমাণে ধর্ম্মপ্রচার ও দুঃখীর দুঃখ মোচন হইতে পারিত। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। এখানে যাহা ফেলিয়া যাইতে হইবে, সেই দিকেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। এই গর্ব্বিত বেক্‌ফোর্ড জীবনের প্রকৃত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পর্টুগালে গমন করিলেন। যাইয়া আমোদের স্রোতে অঙ্গ ঢালিলেন। বহু ব্যয়ে প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা প্রস্তুত করিলেন। তাহার রন্ধনশালায় পয়ঃপ্রণালী ছিল। তাহাতে মৎস্য সকল ক্রীড়া করিত। চারিদিকে বিবিধ খাদ্য দ্রব্য এবং পৃথিবীর সকল দেশের ফল তথায় স্তূপাকারে থাকিত। এইরূপে তথায় তিনি ভোগ বিলাসের মধ্যে জীবন যাপন

করিতেন। পরে স্বদেশে ফিরিয়া তত্রস্থ বহুমূল্য পৈতৃক প্রকাণ্ড অট্টালিকা ভগ্ন করিয়া তাহার স্থানে বৃহৎ এক প্রাসাদ প্রস্তুত করিলেন। রাজমিস্ত্রিদের রাত্রি-কালেও বিরাম ছিল না। আলো জ্বালিয়া তখনও তাহারা কার্য্য করিত। তিনি উচ্চ ভূমির উপর উঠিয়া ঐ সকল আলোকমা-লার শোভা দর্শন করিতেন। বাটী প্রস্তুত হইলে, তাহা স্বর্ণ রৌপ্য ও হীরা দ্বারা খচিত হইল। তিনি বাহিরের কোনও লোককে তাহার ভিতরে যাইতে দিতেন না। এমন ঐশ্বর্য্য চলিয়া যাইবে তাহা কে জানিত? কিন্তু তাহাই ঘটিল। তাঁহার ব্যবসা বাণি-জ্যের ক্ষতি হইল। তিনি নানা মোকর্দ্দমায় হারিলেন। হায়! যে গৃহে রাজাও একদিন প্রবেশের অনুমতি পান নাই, সেই গৃহের দ্বার মহাজনেরা আসিয়া বলপূর্ব্বক খুলিয়া ফেলিল। পরিশেষে ঐ বহুমূল্য প্রাসাদ বিক্রীত হইয়া গেল। এ সংসারে এইরূপই সুখ।

রাজনীতিবিশারদ উইলিয়ম পিট, সুবক্তা সেরিডান প্রভৃতি অনেকেই এই মরীচিকায় প্রতারিত হইয়া, বহু দুঃখের মধ্য দিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন।

সম্রাট নেপোলিয়ন যুদ্ধমন্ত্রেই দীক্ষিত ছিলেন। জীবনে একদিনও শান্তিসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। রণবাদ্য বাজিলেই তিনি উৎসাহিত হইতেন। যেন এই বাদ্য ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য বাদ্য নাই। শয়নে স্বপ্নেও তিনি যুদ্ধবিষয়ের আলোচনা করি-তেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও বলিয়া-ছিলেন, "অভিযান—অভিযান—অভিযান" "শীঘ্র অভিযান"। হায় রাজার রাজা! বন্দী অবস্থায় নির্জ্জন সেণ্টহেলেনা দ্বীপে তাঁহার মৃত্যু হইল। কি শোচনীয় ব্যাপার! মৃত্যু সময়ে কোথা সেই আনন্দময়কে দেখিয়া আনন্দধামে যাইবেন, না সেই শাণিত তরবাল, বেয়ঁনেট ও আগ্নেয় অস্ত্র ধ্যান করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় নেপোলিয়নও তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়াছিলেন। সমস্ত য়ুরোপীয় রাজগণের শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য হইয়াও পরিশেষে সিডানের যুদ্ধে তিনি বন্দী হইলেন। যখন প্রুসীয়রাজের নিকট, তিনি ঐ অবস্থায় দণ্ডায়মান, সে মূর্ত্তি ছবিতে দেখিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইহাতেও কি সম্পদসুখ মরীচিকার অনুরূপ বোধ হয় না?

এখন রাজপ্রাসাদ হইতে চক্ষু ফিরা-ইয়া লও। গৃহস্থের গৃহের দিকে দৃষ্টি-পাত কর। ঐ যে একটি স্বর্ণপ্রদীপ উজ্জ্বলপ্রভায় জ্বলিতেছিল, তাহা আর নাই। সহসা ঐ গৃহ ঘন অন্ধকারে বিষাদ আঁধারে পূরিয়া গেল। "ভবন হয়েছে বন, দিনে অন্ধকার" "দুদিনের হাসি, দুদিনে ফুরায় দীপ নিভে যায় আঁধারে" এ সংসারে সুখ এই প্রকার। অতএব যিনি সুখস্বরূপ তাঁহাকে হৃদয়ে রাখ। সবই ভাঙ্গিয়া যাইবে। শেষে কিছুই থাকিবে না। তখন তিনি বিনা কে আর সান্ত্বনা দিবে।

"হায় কে দিবে আর সান্ত্বনা,
সকলি গিয়াছে, আর তুমি যেও না।
চারিদিকে চাই, হেরি না কাহারে
কেন গেলে ফেলে একেলা আঁধারে,
হের হে শূন্য ভবন মম ॥"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সার সত্যের আলোচনা।

ভিতর-মহলে প্রবেশের উদ্যোগ।

পূর্ব্ব প্রবন্ধের শেষভাগে সংক্ষেপে একটি কথা বলা হইয়াছিল এই যে, "আত্মার একত্ব জ্ঞেয়স্থানে অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে দেখিতে হইবে। বৃহৎব্রহ্মাণ্ডকে একীভূত করিয়া দেখিতে হইবে; বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডকে একীভূত করিয়া দেখিতে হইলে

হিরণ্ময় কোষে লক্ষ্য নিবিষ্ট করা আবশ্যক।" এই কথাটির আশপাশের পরিধি-মহলে ঘোরাফেরা হইয়াছে অনেক—এক্ষণে উহার ভিতর মহলের কপাট উদ্ঘাটন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই চেষ্টা দেখা যা'ক্।

পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি বাঁধিয়া যাত্রিগণ প্রয়াণ-পথে চলিয়াছেন—অতি উত্তম। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হ'চ্চে গম্যস্থানে যাওয়া। গম্যস্থান কোন্ স্থান? গম্যস্থান হ'চ্চে আনন্দ;—নির্ম্মল আনন্দ, সজাগ আনন্দ, প্রশান্ত আনন্দ, পরমানন্দ। যাওয়া হইতেছে কোন্ পথ দিয়া? তত্ত্বজ্ঞানের পথ দিয়া। তত্ত্বজ্ঞান-পথের পাথেয়-সম্বল কি? পাথেয়-সম্বল হ'চ্চে মূলতত্ত্ব। মূলতত্ত্ব কাহাকে বলে? মূলতত্ত্ব হ'চ্চে সেই তত্ত্ব, যাহা তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলনের সময় গোড়াতেই (অর্থাৎ পহিলা নম্বরেই) স্বীকার্য্য। দৃষ্টান্ত দেখাও। জ্ঞাতৃজ্ঞান-জ্ঞেয়ের ঐক্য আত্মজ্ঞানের মূলতত্ত্ব; কেন না, আত্মজ্ঞান বলিবামাত্রই বুঝায় যে, সে-জ্ঞানের জ্ঞাতাও আপনি—জ্ঞেয়ও আপনি। তবেই হইতেছে যে, আত্মজ্ঞানের অনুশীলনকালে জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের ঐক্য গোড়াতেই স্বীকার্য্য; এইজন্য বলিতেছি যে, জ্ঞাতৃ-জ্ঞানজ্ঞেয়ের ঐক্য আত্মজ্ঞানের মূলতত্ত্ব। আত্মজ্ঞানের মূল-তত্ত্ব—কিন্তু আর-আর জ্ঞানের কোন্ তত্ত্ব? যাহা আত্মজ্ঞানের মূলতত্ত্ব, তাহা সকল জ্ঞানেরই মূলতত্ত্ব। প্রমাণ কি! প্রণিধান করা হো'ক্ঃ—

জ্ঞানের কার্য্যই হ'চ্চে সত্যকে প্রকাশ করা। সত্য কি? না, যাহা "আছে" বলিয়া ধ্রুব প্রতীয়মান, তাহাই সত্য। কিন্তু "আছে" দেখা-কথা। দেখা কথা'র মূলে হওয়া-কথা থাকা চাই; আছে'র মূলে আছি' থাকা চাই; জগতের মূলে আত্মা থাকা চাই। অতএব এটা যখন সুনিশ্চিত যে, জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের ঐক্য আত্মার মূলতত্ত্ব, তখন সেইসঙ্গে এটাও সুনিশ্চিত যে, আত্মার ঐ যে মূলতত্ত্ব জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের ঐক্য, উহা সর্ব্বজগতেরই মূলতত্ত্ব; কেন না, সর্ব্ব-জগতেরই মূলে আত্মা জাগিতেছে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মাই সত্য এবং সত্যই আত্মা। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বস্তুসকলের উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়াইলে সত্যে পৌঁছানো যায় না—বস্তুসকলের আত্মাতে ডুব দিলেই সত্যের উপলব্ধি পাওয়া যায়।

এ কথা খুব ঠিক্ যে, জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের ঐক্য সর্ব্বজগতেরই মূলতত্ত্ব, কিন্তু ঐ মূল-তত্ত্বটি মস্তিষ্কের ভাণ্ডারে চাবি দিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই—কাজে খাটাইবার জন্যই হইয়াছে। কোন্ স্থানে খাটাইতে হইবে? ঐ মূলতত্ত্বটির প্রয়োগ-ক্ষেত্র দুইটি—

একটি হ'চ্চে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, আরেকটি হ'চ্চে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। কোন্ কাজে খাটাইতে হইবে? উহাকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে প্রয়োগ করিয়া ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সার্ব্বাত্মিক ঐক্য অবধারণ করিতে হইবে; বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে প্রয়োগ করিয়া বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সার্ব্বাত্মিক ঐক্য অবধারণ করিতে হইবে। এই স্থান-টিতে টিপ্পনীচ্ছলে একটি কথা বলিয়া রাখা নিতান্তই আবশ্যক মনে করিতেছি; কথাটি এইঃ—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডকে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড বলা হইতেছে শুদ্ধকেবল ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনার অনুরোধে; প্রকৃত কথা এই যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের নামই সর্ব্বজগৎ, এবং সর্ব্ব-জগতের নামই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। সর্ব্বজগতের বাহিরে তো আর দ্বিতীয় জগৎ থাকিতে পারে না—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড থাকিবে কেমন করিয়া? ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে নাই—কিন্তু

অগ্রহা ৭৭.১৮২৩

আছে তাহাতে আর ভুল নাই ; কেন না, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড আমরা আপনারাই। তবেই হইতেছে যে, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত।

এই যে কথাগুলি বলা হইল, ইহার অন্ধি-সন্ধি প্রদেশগুলা ভাল করিয়া পর্য্য-বেক্ষণ করিয়া দেখা যা'ক্।

বলিলাম যে, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে নাই—ভিতরে আছে ; এ যাহা বলিলাম, এটা এক হিসাবের কথা। আর-এক হিসাবের কথা এই যে, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডও ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে আছে। পুরাণে গল্পচ্ছলে কথিত হইয়াছে যে, বালক-কৃষ্ণকে মাটি খাইতে দেখিয়া যশোদা-মাতা তাঁহাকে যখন হাঁ করিতে বলিলেন, তখন বালক যেম্নি হাঁ করিল, যশোদা-মাতা কি দেখি-লেন? তিনি দেখিয়া অবাক্—যে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই ক্ষুদ্র বালকটির উদরের অভ্যন্তরে। একথার তাৎপর্য্য আর-কিছু না—সার্ব্বাত্মিক ঐক্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মনুষ্যশরীরে একই সার্ব্বাত্মিক ঐক্য মস্তকে যোগাসনে উপবিষ্ট, হৃদয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট, নাভিকেন্দ্রে কর্ম্মাসনে উপবিষ্ট। ইহাতে প্রকারান্তরে বুঝাইতেছে এই যে, শরীরের প্রত্যেক মর্ম্মস্থানে সমস্ত শরীর অন্তর্ভূত। তার সাক্ষী—যখন মাথা কাজ করে, তখন মাথার মধ্য দিয়া সমস্ত শরীর কাজ করে ; যখন হৃদয় কাজ করে, তখন হৃদয়ের মধ্য দিয়া সমস্ত শরীর কাজ করে ; যখন হস্তপদ কাজ করে, তখন হস্তপদের মধ্য দিয়া সমস্ত শরীর কাজ করে। তবেই হইল যে, শরীরের প্রত্যেক মর্ম্মগ্রন্থির অভ্য-ন্তরে সমস্ত শরীর জাগিতেছে। এই যে একটি লোকপ্রসিদ্ধ কথা যে, পরমাত্মা ঘটে-ঘটে বিরাজমান, এ কথার অর্থও তাই। সার্ব্বাত্মিক ঐক্যসূত্রে ক্ষুদ্রব্রহ্মা-ণ্ডের মর্ম্মে-মর্ম্মে বৃহৎব্রহ্মাণ্ড জাগিতেছে বলিলেই বুঝায় যে, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা জীবাত্মার অভ্যন্তরে বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের অধি-ষ্ঠাতা পরমাত্মা জাগিতেছেন। এখন জি-জ্ঞাস্য এই যে, তাহাই যদি হইল, পরমাত্মা যদি ঘটে-ঘটে বিরাজমান—তবে সাধনভজ-নের প্রয়োজন কি? পরমাত্মাকে লাভ করিবার জন্যই তো সাধনভজন ; তিনি যদি সাধকের হৃদয়ের অভ্যন্তরে আছেন—তবে তো তিনি সাধকের মুঠার মধ্যেই আছেন ; আবার কেন তবে সাধনভজন? তুমি যে রত্ন চাহিতেছ, তাহা তোমার আঁচলে বাঁধা রহিয়াছে—তবে কেন তাহার জন্য এতশত সাধ্যসাধনা? এ কথার একটা মীমাংসা করার নিতান্তই প্রয়োজন। ইহার মীমাংসা এইরূপ :—

তুমি যে বলিতেছ, পরমাত্মাকে লাভ করিবার জন্য সাধ্যসাধনার প্রয়োজন কি? "লাভ করা" বলিতেছ কাহাকে? লাভ করা অর্থাৎ পাওয়া। চাওয়া ব্যতিরেকে "পাওয়া" কথাটার কোনো অর্থ হইতে পারে কি না? মনে কর যে, ঝিন্‌কি-ঝিন্‌কি বৃষ্টি পড়িতেছে—আর সেই সময়ে অশাস্ত্রীয় কথার্ত্ত পথিক এক গণ্ডূষ জলের জ কথার অর্থ বাইল ; কিন্তু তাহার অঞ্জলি-পুটে । ঘৃণা-শব্দের অর্থ ক্ক েল পড়িল, আর, তাহার পরেই বৃষ্টি ধ অর্থ অে া গেল। পথিক বলিল—"জল পাইলাম না" ; তাহার কিয়ৎ পরে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল ; পথিক হাত পাতিবামাত্রই একগণ্ডূষ জল পাইল। তখন পথিক বলিল—"জল পাইয়া প্রাণ পাইলাম।" পূর্ব্বে তাহারই হস্তে এক-ফোঁটা জল নিপতিত হইয়াছিল এবং এক্ষণে তাহারই হস্তে এক-গণ্ডূষ জল নিপতিত হইল। অথচ সেবারে পথিক বলিয়াছিল—"জল পাইলাম না," এবারে বলিল—"জল

পাইয়া প্রাণ পাইলাম।” দুই বারের দুই-রকম কথার তাৎপর্য্য কি ? সেবারে পথিক যাহা চাহে নাই, তাহাই তাহার হস্তে পড়িয়াছিল ; এবারে পথিক যাহা চাহে, তাহাই তাহার হস্তে পড়িল ;—এই তাহার তাৎপর্য্য। পাওয়ার সহিত চাওয়ার এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। চাওয়া তিনরূপ ;—প্রাণের চাওয়া, মনের চাওয়া এবং বুদ্ধির চাওয়া। প্রাণের চাওয়া হ'চ্চে ব্যাকুলতা, মনের চাওয়া হ'চ্চে অনুসন্ধান, বুদ্ধির চাওয়া হ'চ্চে অবধারণ। মনে কর, ত্রিপান্তর মাঠের মাঝখানে পথিকের প্রাণ জলের জন্য ব্যাকুল হইল ; মন জলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সম্মুখে একটা নদীর মত দৃশ্য দেখিল, কিন্তু তাহা মরীচিকাও হইতে পারে, জলও হইতে পারে। মন বলিতেছে, উহা মরীচিকা কি জল, তাহা আমি জানিও না, জানিতে চাহিও না ; জলেই আমার প্রয়োজন—মরীচিকায় আমার প্রয়োজন নাই, অতএব উহা জলই। শেক্‌স্‌পিয়র্‌ এক স্থানে বলিয়াছেন “এটা তোমার মনের ইচ্ছানুযায়ী চিন্তা--তোমার Wish is father to thy thought, ইচ্ছাই তোমার চিন্তার জনয়িতা।” মন বাসনাকেই .) গোড়ায়েণ করিয়া সত্যাসত্যের দিকে .ওঁছি যে, জাহে না। বুদ্ধি কিন্তু মনের অজ্ঞানের মন্দকথায় সন্তোষ মানিতে পারে .কি বুদ্ধি বলে, “যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা সত্যসত্যই জল কি মরীচিকা, তাহা সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য।” এখন ব্যক্তব্য এই যে, ব্যাকুলতার ধাপ হইতে অনুসন্ধানের ধাপ এবং অনুসন্ধানের ধাপ হইতে অবধারণার ধাপে উঠিয়া যখন ইষ্টবস্তুকে হস্তে নাগাল পাওয়া যায়, তখন তাহারই নাম প্রকৃত পাওয়া। আপাতত ভক্তদিগের প্রাণের চাওয়া স্বভাবত কোন্‌ দিকে উন্মুখ হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্‌, তাহার পরে তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

দিঙ্‌নিরূপণ।

এটা একটা দেখা কথা যে, ভক্তগণের প্রাণের চাওয়া যখন তাঁহাদের ইষ্টদেবতার প্রতি উন্মুখ হয়, তখন তাঁহাদের চক্ষের চাওয়া স্বভাবতই আকাশের প্রতি নিবিষ্ট হয়। ভক্তেরা পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী জানিয়াও তাঁহাকে ডাকিবার সময়, বা স্মরণ করিবার সময়, বা ভজনা করিবার সময় করজোড়ে উপরে দৃষ্টিপাত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। তা ছাড়া, সৃষ্টির এক আশ্চর্য্য রহস্য দেখিতে পাওয়া যায় এই যে, বৃক্ষের মূল ভূতলে প্রোথিত ; সরীসৃপ জন্তুদিগের শরীর ভূপৃষ্ঠে অবলুণ্ঠিত ; গো-মেষাদির শরীর পৃথিবী হইতে অর্দ্ধোন্নত ; মনুষ্যের শরীর পূর্ণসমুন্নত। মনুষ্য বৃক্ষের ঠিক্‌ উল্টাপিট এবং অন্যান্য জন্তুরা দুয়ের মধ্যবর্ত্তী। তার সাক্ষী—বৃক্ষের মস্তক নিম্নমুখ, হস্তপদ বা ডালপালা ঊর্দ্ধমুখ, মনুষ্যের মস্তক ঊর্দ্ধমুখ, হস্তপদ নিম্নমুখ। মনুষ্যের মস্তক যেমন স্বভাবতই ঊর্দ্ধমুখ, ভক্তগণের প্রাণের চাওয়াও তেমনি স্বভাবতই ঊর্দ্ধমুখ। উপনিষৎশাস্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে যে, “তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্‌।” সেই বিষ্ণুর পরম স্থান সর্ব্বদা দেখেন সূরিগণ—গগনমণ্ডলে যেন চক্ষু আতত। অর্থাৎ গগনমণ্ডল যেন চক্ষুষ্মান্‌। *

* এখানে ভাষাসম্বন্ধে দুইটি কথা বক্তব্য। প্রথম কথা এই যে, আকাশশব্দের প্রকৃত অর্থ গগন নহে ; আকাশশব্দের প্রকৃত অর্থ ইংরাজিতে যাহাকে বলে space তেমনি দ্যৌ-শব্দের অর্থ space বা আকাশ নহে ; দ্যৌ-শব্দের অর্থ sky বা heaven। এইজন্য “দিবি”-শব্দের অর্থ আমি “আকাশে” না করিয়া, করিলাম “গগনমণ্ডলে”। দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গীয়

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী—অথচ আমরা তাঁহাকে প্রাণ ভরে' ডাকিবার সময় স্বভাবতই উপরে দৃষ্টিপাত করি, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ দুই-এক ছত্রে বলিয়া বুঝাইবার কথা নহে; অতএব এবারে এইখানেই বিশ্রাম করা বিধেয়।

বিবিধ শ্লোকসংগ্রহ।

প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ।
সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতাশয়াঃ॥ ১

এই শ্লোকটী ভগবদ্গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকের স্বামিকৃত টীকাধৃত। কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল ভোগ নিমিত্ত যিনি কর্ম্ম মাত্রই ত্যাগ করেন, অর্থাৎ সৎ বা অসৎ কোন কর্ম্মই করেন না তাঁহাকেই সন্ন্যাসী বলা যায়। এই সন্ন্যাসীদিগের মধ্যেও বহু ব্যক্তি দৈবদুর্ব্বিপাক বশত এমন আছেন যাঁহারা কর্ম্মত্যাগের প্রকৃত

খ্যাতনামা রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রের ইংরাজি অনুবাদ করিতে গিয়া স্বরচিত পুস্তকের স্থানে স্থানে আকাশ শব্দের অর্থ করিয়াছেন sky। ঘটাকাশ কি ঘটাবচ্ছিন্ন sky? ঘটাকাশ-শব্দের অর্থ ঘটাবচ্ছিন্ন space, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। শাস্ত্রীয় বচনসকলের ঐরূপ বিপরীত অর্থ ঘটাইলে শাস্ত্রের প্রাণে যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক আঘাত করা হয়, তাহা বলিবার কথা নহে। অতএব, শাস্ত্রের অনুবাদ করিবার পূর্ব্বে কোন্ শব্দের কোন্‌টি মুখ্য অর্থ—কোন্‌টি গৌণ অর্থ—কোন্‌টি আদিম অর্থ—কোন্‌টি আধুনিক অর্থ—কোন্‌টি বাঙালি অর্থ—কোন্‌টি সংস্কৃত অর্থ—এই সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ পরীক্ষা এবং অনুসন্ধান করিয়া দেখা অনুবাদকের নিতান্তই কর্ত্তব্য। সংস্কৃত-শব্দের বাঙালি অর্থ এবং সংস্কৃত অর্থের মধ্যে অনেক স্থলে প্রভেদ বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। উপন্যাস-শব্দের বাঙালি অর্থ উপকথা, সংস্কৃত অর্থ hypothesis। যদি বল "কোথা হইতে পাইলে?" তবে শ্রবণ কর;—ন্যাস-শব্দের অর্থ স্থাপন করা। ন্যস্ত ধন কি? না, যাহা আপাতত কোনো ব্যক্তির হস্তে স্থাপন করা যায়; সে ধন কাহার প্রকৃত প্রাপ্য, তাহা পরে বিচার্য্য। উপন্যাস কি? না, যে কথা উপস্থাপিত করা যায় অর্থাৎ আপাতত আনিয়া দাঁড় করানো হয়;—তাহার সত্যাসত্য পরে বিচার্য্য। hypo=উপ, thesis=স্থাপন বা ন্যাস। hypothesis=উপস্থাপন বা উপন্যাস। পুঁথিগত বিদ্যার প্রধান একটি দোষ এই যে, "যাহা পুঁথিতে-পাওয়া যায় না, তাহা মিথ্যা জল্পনা, সুতরাং উপকথারই সামিল" এইরূপ একটি ধারণা। বঙ্গীয় সাধুভাষার মূল-প্রণেতারা পুঁথিগত বিদ্যার বিদ্যাবাগীশ ছিলেন। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক hypothesis এর মূল্য কিছুই বুঝিতেন না। সুতরাং hypothesis বা উপন্যাস তাঁহাদের নিকটে মিথ্যা জল্পনা ছাড়া—উপকথা ছাড়া—আর কিছুই হইতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সংস্কৃতগ্রন্থে "যদেতৎ ত্বয়া উপন্যস্তম্" ইহার অর্থ "এই যাহা তুমি উপন্যাস করিলে বা উপস্থাপন করিলে বা আনিয়া দাঁড় করাইলে" এ ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। hypothesis তো আর গাছে ফলে না;—যাহা আনিয়া দাঁড় করানো হয় এবং যাহার সত্যাসত্য পরে বিচার্য্য—তাহারই নাম hypothesis। আমার জ্ঞানে আমি কোনো সংস্কৃতগ্রন্থে উপন্যাসশব্দ উপকথা অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখি নাই। আমাদের সেকালের আরব্য উপন্যাসের নাম কথাসরিৎসাগর; তা বই, তাহার নাম উপন্যাসসরিৎসাগর নহে। সংস্কৃতভাষার উপাখ্যান বটে উপকথারই সহোদর। কিন্তু উপন্যাস-কথাটা (হেতু, নিগমন, সিদ্ধান্ত, দৃষ্টান্ত প্রভৃতির ন্যায়) ন্যায়শাস্ত্রের নিজাধিকারের গণ্ডির ভিতরকার কথা, তাহার অর্থ উপকথা হইতেই পারে না। উপন্যাস তো ন্যায়শাস্ত্রীয় কথা; অনেকানেক লৌকিক ব্যবহার্য্য সংস্কৃতকথার অর্থ বাংলা ভাষায় উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘৃণা-শব্দের অর্থ কৃপা, নির্ঘৃণ-শব্দের অর্থ নির্দয়। নির্ঘৃণ-শব্দের অর্থ অনেকে বোঝেন এই যে, যাহার ঘেন্না নাই। ঘৃণিত-শব্দের গৌণ অর্থ নিন্দিত—তাহা তো হইতে পারে। ইংরাজিতেও বলা হইয়া থাকে pitiable case, miserable wretch ইত্যাদি। I pity you একথার ঠিক্ অর্থ এই যে, আমি তোমাকে ঘৃণা করি। কিন্তু I hate you এ কথার অর্থ স্বতন্ত্র। ঘৃণা এবং দ্বেষের মধ্যে বিশাল প্রভেদ। যাঁহারা তিন শ'কে এক শ করিয়াছেন, দুই ব'কে এক ব করিয়াছেন, দুই ন'কে এক ন করিয়াছেন, তাঁহারা যে, উপন্যাস এবং উপকথায় মিশাইয়া, ঘৃণা এবং দ্বেষে মিশাইয়া, আকাশে এবং গগনে মিশাইয়া খিচুড়ি পাকাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই।

ফল মোক্ষলাভ করিতে পারেন না। ইহাঁরা কিরূপ প্রকৃতির লোক তাহাই কহিতেছেন। অনেক সন্ন্যাসী প্রমাদী, বহিশ্চিত্ত, পিশুন ও কলহপ্রিয় হইয়া থাকেন। বহিশ্চিত্ততাই ইহাঁদিগের পতনের কারণ। বহিশ্চিত্ততার তাৎপর্য্যার্থ বিষয়াভিনিবেশ। বাহিরে সন্ন্যাসের বেশমাত্রধারী কিন্তু ভিতরে ঘোরতর বিষয়চিন্তায় অভিভূত। বিষয়াভিনিবেশ ত্যাগ করিতে পারিলে গৃহে থাকিয়াও মানুষ সন্ন্যাসী হইতে পারে। কিন্তু গৃহে নানাকারণে প্রায় মনঃক্ষোভ জন্মাইয়া দেয়। নিজের পরিবার, প্রতিবাসী, গ্রামবাসী সকলে একভাবাপন্ন না হইলে শান্তিলাভের সম্ভাবনা খুব অল্প। এ কারণ স্থল বিশেষে গৃহত্যাগের পরামর্শ আছে। বাস্তবিক গৃহাশ্রম দূষণীয় নহে।

দেবানাং পূর্ব্বে যুগেঽসতঃ সদজায়ত। ইত্যাদি।

[ঋগ্বেদ সংহিতা ১০ মণ্ডল ৭২ সূক্ত]

ইহার অর্থ এই যে, দেবতাদিগের পূর্ব্বে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইয়াছে। এস্থলে অসৎশব্দের অর্থ অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম, আর সৎশব্দের অর্থ ব্যক্ত বা স্থূল পদার্থ।

ভগবৎগীতাতে "নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ" যাহা লিখিত আছে তাহার সহিত ঋগ্বেদের স্থূল দৃষ্টিতে অনৈক্য বোধ হয় বটে কিন্তু ভগবদ্গীতার সৎ ও অসৎ শব্দের অর্থ অন্যরূপ। এস্থলে সৎ শব্দের অর্থ ভাব পদার্থ, আর অসৎশব্দের অর্থ অভাব পদার্থ।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলই পুরাণশাস্ত্রের প্রধান উপাদান। এই দশম মণ্ডলে পুরুষসূক্ত অর্থাৎ পুরাণের বিশ্বরূপ বর্ণনার মূল সূত্র। ইহাতে দক্ষ প্রজাপতি অদিতি ও অদিতির পুত্র দেবগণের কথা আছে। পরমেশ্বর যে সকলের একমাত্র স্রষ্টা ও অনাদি এ সকল কথা সুস্পষ্ট উক্ত আছে। ১০ সূক্তে যম ও যমীর রূপক বর্ণন আছে। পুরাণের রূপক বর্ণনও বেদেরই অনুকরণ মাত্র। ঋগ্বেদের বহু স্থলে রূপক বর্ণনা রহিয়াছে। আমাদের দেশের অল্পজ্ঞ, কুসংস্কারী পণ্ডিতেরা রূপক বর্ণনাকেও রূপক বলিতে চান না!

ঋষি শব্দের অর্থ।

ঋষতি, জ্ঞানেন সংসারপারং ইতি ঋষিঃ।
ঋষী হিংসাগতৌ ধাতু র্বিদ্যা সত্য তপঃ শ্রুতিঃ।
এষ সন্নিচয়ো যস্মাদ্ব্রাহ্মণশ্চ ততস্ত্বৃষিঃ॥

(বাচস্পত্য অভিধান)

ইত্যেতে ঋষয়ো প্রোক্তা স্তপসা ঋষিতাং গতাঃ।

(মৎস্য পুরাণ)

যে ব্রাহ্মণের বিদ্যা, সত্য, তপস্যা এবং বেদাধ্যয়ন থাকে তাঁহাকেই ঋষি বলা যায়। ব্রাহ্মণশব্দ এস্থলে উপলক্ষণ মাত্র। ফলতঃ ক্ষত্রিয়াদিও ঋষি হইতে পারেন। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিশ্বামিত্র ও শূদ্রের মধ্যে কবষ ঋষি ইহার প্রমাণ। পরন্তু বিশেষ জ্ঞাতব্য যে, ব্রাহ্মণ না হইলে ব্রহ্মর্ষি পদবাচ্য হইতে পারে না। প্রাগুক্ত দুই শ্লোক দ্বারা সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে যে, বিদ্যা অর্থাৎ বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্র জ্ঞান, সত্য অর্থাৎ অসত্য বাক্যাদি ত্যাগ, তপস্যা অর্থাৎ ভগবানের প্রীত্যর্থ বা প্রিয় কার্য্য সাধন নিমিত্ত ক্লেশ সহ্য করা এবং বেদাদি শাস্ত্রার্থ শ্রবণ এই চারিটি বিষয়ে যে ব্যক্তি নিপুণ তাঁহাকেই ঋষি বলা যায়।

দেবর্ষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষি সচরাচর এই চারিপ্রকার ঋষিই প্রসিদ্ধ। নারদাদিকে দেবর্ষি, ব্যাসাদিকে মহর্ষি, বশিষ্টাদিকে ব্রহ্মর্ষি এবং অম্বরীষাদি ক্ষত্রিয়রাজগণকে রাজর্ষি বলা যায়। ফল কথা বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতেন তাঁহারাই প্রকৃত ঋষি। বেদাচার্য্য ব্রাহ্মণ "ব্রহ্মর্ষি" নামে অভিহিত হইয়াছেন। বেদবিৎ ক্ষত্রিয় "রাজর্ষি"

শব্দের বাচ্য হন। মহামহিমান্বিত ঋষিকে "মহর্ষি" বলা যায়। যিনি দেবত্ব ও ঋষিত্ব উভয়ই প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনিই "দেবর্ষি"।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলং॥
(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ৯০ সূক্ত ১ম ঋক্)

এই প্রথম ঋক্ হইতে ১৬ ঋক্ পর্য্যন্ত পুরুষসূক্ত নামে বিখ্যাত। অর্থাৎ ৯০ সূক্তকেই পুরুষসূক্ত বলা যায়। এই সূক্তের ১২ ঋকে ব্রাহ্মণাদি চারিজাতির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা;—ব্রাহ্মণো-ঽস্য মুখমাসীৎ"—ইত্যাদি। পরমেশ্বরের মুখ হইতে কেবল ব্রাহ্মণের উৎপত্তিই উক্ত হয় নাই, ইন্দ্র ও অগ্নির উৎপত্তিও উক্ত আছে। বাস্তবিক ইহা রূপক বর্ণন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অগ্নি ও ইন্দ্র পরমেশ্বরের মুখস্বরূপ। ইহা আনুমানিক অর্থ নহে, মূলের প্রকৃত অর্থ। কোন কোন পুরাণে ব্রহ্মার মুখ হইতে যে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি লিখিত আছে তাহা বেদবিরুদ্ধ। পরন্তু পাদ হইতে কেবল শূদ্র নহে, পৃথিবী, দিক্-সকল এবং অন্যান্য ভুবর্লোকাদিও সমুৎ-পন্ন বা এই সমস্ত ব্রহ্মের পাদস্বরূপ। ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে এই পুরুষ-সূক্তানুসারে পরমেশ্বরের বিরাটরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আর পৌরাণিক জাতিভেদ নিরূপণের মূলই এই পুরুষসূক্ত। ১২১ সূক্তে পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা বর্ণিত আছে "হিরণ্যগর্ভ" ইত্যাদি। ঋগ্বেদের সর্ব্বশেষে আর্য্যজাতির প্রতি একমনপ্রাণ হইবার অতি আশ্চর্য্য উপদেশ আছে।

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥
ভাগবত ১ম স্কন্ধ, ১২ অধ্যায়।

ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই এই যে, প্রকৃতিতে বিদ্যমান থাকিয়াও প্রাকৃতিক গুণের অধীন হন না। জীবাত্মা দেহস্থ হইয়াও যে প্রকার দেহনাশে বিনষ্ট হন না, পরমাত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়াও সেইরূপ তৎবিকারে বিকার প্রাপ্ত হন না।

জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ।
দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছব্দলক্ষণঃ॥
ভাগবত ৩য় স্কন্ধ, ৩২ অধ্যায়।

ঈশ্বরনিষ্ঠ জ্ঞানযোগ এবং নির্গুণ ভক্তি-যোগ উভয়ই এক পদার্থ। এতদুভয়ে কোন বিশেষ নাই। এই কথায় আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, জ্ঞানযোগের ফল আত্মলাভ আর ভক্তিযোগের ফল ভজনীয় ঈশ্বরপ্রাপ্তি, অতএব এতদুভয়ের কিরূপে একার্থ হইতে পারে? ইহারই উত্তরে কথিত হইয়াছে—

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্দ্বারৈরর্থোবহুগুণাশ্রয়ঃ।
একোনানেয়তে তদ্বৎ ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥
৩য় স্কন্ধ, ৩২ অধ্যায়।

যে প্রকার পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়দ্বার-যোগে একমাত্র মন নানা বিষয় গ্রহণ করে সেই প্রকার শাস্ত্রপথ দ্বারা একমাত্র ভগ-বানও নানারূপে আরাধ্য হইয়া থাকেন। তৃতীয় স্কন্ধ ভাগবতের অন্যত্র এ সম্বন্ধে অতি সুন্দর মীমাংসা আছে। যাঁহারা এই তাৎপর্য্য বুঝিবেন তাঁহারা সম্প্রদায়বিদ্বেষ রূপ মহাপাপ হইতে রক্ষা পাইবেন। "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" বর্ত্তমানকালের কেহ কেহ গুহাকে নিজ নিজ হৃৎপ্রত্যয় বলেন, বাস্তবিক তাহা নহে। এ স্থানে সমগ্র কথার তাৎপর্য্যার্থ—ধর্ম্মতত্ত্ব দুরধিগম্য।

তদ্ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকং।
বিজ্ঞায়াত্মতয়া ধীরঃ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে॥
ভাগবত ১০ম স্কন্ধ, ৮৮ অধ্যায়।

অর্থ, পরমসূক্ষ্ম চিন্মাত্র, (বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ) সৎ ও অনন্ত সেই ব্রহ্মকে আত্মা-

রূপে জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন।

ব্রহ্মকে আত্মারূপে জানাকেই তত্ত্বজ্ঞান বলা যায়। তত্ত্বজ্ঞান অতি দুর্লভ পদার্থ।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেৎ বাক্যং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥

ভাগবত ১১ স্কন্ধ, ১৭ অধ্যায়।

অর্থাৎ বিশেষ রূপে দৃষ্টি পূর্ব্বক পথ চলিবে, বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া সেই পবিত্র জল পান করিবে, সত্য কথা বলিবে এবং যে কার্য্যে অন্তঃকরণ প্রসন্ন হয় তাহাই করিবে। অন্তঃকরণের প্রসন্নতা সাধু কার্য্যেই হইয়া থাকে, অসাধু কার্য্যে কখনই আত্ম-প্রসাদ লাভ হয় না। অসৎ কার্য্য করিয়া কেবল মানুষ উদ্বেগই প্রাপ্ত হয়। অতএব "মনঃপূতং সমাচরেৎ" এ কথার অর্থ ইহা নহে যে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে। স্বেচ্ছাচার নানা অনর্থের কারণ হইয়া থাকে। শাস্ত্র ও সদাচার বহুবিধ, তন্মধ্যে যে কার্য্যে অন্তঃকরণ প্রসন্ন হয় তাহাই করিবে। ইহাই "মনঃপূতং সমাচরেৎ" এই বাক্যের তাৎপর্য্য।

ন চৈবহি সুতরামায়ুর্ব্বেদস্য পারং তস্মাদপ্রমত্তঃ শশ্বদভিযোগমস্মিন্ গচ্ছেৎ। তদেবং কার্য্যমেবং বৃত্তস্য সৌষ্ঠবমনসূয়তা পরেভ্যোঽপ্যপগময়িতব্যং। কৃৎস্নো হি লোকো বুদ্ধিমতামাচার্য্যঃ। শত্রুশ্চাবুদ্ধিমেতচ্চাভিসমীক্ষ্য বুদ্ধিমতা অমিত্রস্যাপি ধন্যং যশস্যং আয়ুষ্যং লোক্যমিত্যুপদিশতো বচঃ শ্রোতব্যমনুবর্ত্তব্যং চেতি।

চরকসংহিতা, বিমানস্থানং।

আয়ুর্ব্বেদবিধির পার নাই, অতএব সাবধান হইয়া আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ে মনোযোগ কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত বিষয় যে প্রকার বলা গিয়াছে সেইরূপই করিবে। পরন্তু অপর লোকের নিকট হইতে চারিত্র্য ও অনসূয়তা বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সমুদায় মানুষকেই আচার্য্য (শিক্ষক) মনে করেন এবং তাহাদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। পরন্তু মূর্খেরা সকলকে শত্রু মনে করিয়া কাহারো নিকট কিছু শিক্ষা লাভ না করিয়া জড়বৎ অবস্থান করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা শত্রুর নিকটেও সদুপদেশ সকল মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্য করেন।

অধীয়ানোপি শাস্ত্রাণি তন্ত্রযুক্ত্যা বিচক্ষণঃ।
নাধিগচ্ছতি শাস্ত্রার্থানর্থান্ ভাগ্যক্ষয়ে যথা॥ ১
দুর্গৃহীতং ক্ষিণোত্যেব শাস্ত্রং শস্ত্রমিবাবুধং।
সুগৃহীতং তদেবজ্ঞং শাস্ত্র শস্ত্রঞ্চ রক্ষতি॥ ২

[চরক সংহিতা, সিদ্ধিস্থান।]

শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়াও দুর্ভাগ্য-বশতঃ কেহ কেহ শাস্ত্রার্থ পাইতে পারে না। দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইলে যেমন ধন পায় না তদ্রূপ। ১

অজ্ঞ ব্যক্তি অস্ত্রধারণ করিলে যেরূপ সেই অস্ত্র তাহাকে বিনাশ করে সেইরূপ শাস্ত্রার্থও বিপরীতভাবে গ্রহণ করিলে তাহা বিনাশের কারণ হয়। পরন্তু, অস্ত্র সুগৃহীত হইলে যেরূপ শস্ত্রজ্ঞকে রক্ষা করে সেইরূপ সুগৃহীত শাস্ত্রও রক্ষা করিয়া থাকে। ২

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসং॥

(ভাগবত, ১১ স্কন্ধ, ২ অধ্যায়)

আহারে প্রবৃত্ত ব্যক্তির যে রূপ প্রতি-গ্রাসেই তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তি এক-কালেই হয় ভগবৎভজনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির সেইরূপ প্রেমলক্ষণা ভক্তি, ভগবানের অনুভব এবং ভগবান ব্যতীত অন্যত্র অর্থাৎ অনিত্য বিষয় ব্যাপারে বিরক্তি এই তিন যুগপৎ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য অতি উপাদেয়

এবং নিগূঢ়, বিনা উপদেশে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। পরন্তু যে ব্যক্তি ভজনে প্রবৃত্ত হয় নাই তাহাকে বুঝাইলেও বুঝিতে সমর্থ হয় না। উক্ত শ্লোকের টীকাতে স্বামিপাদ প্রভৃতি বিশেষরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অতএব টীকা দেখা কর্ত্তব্য।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥
(ভগবদ্গীতা, ২য় অধ্যায়, ৪৬ শ্লোক।)

রামানুজকৃত ভাষ্য, যথা—

নচ বেদোদিতং সর্ব্বং সর্ব্বস্যোপাদেয়ং যথা সর্ব্বার্থপরিকল্পিতে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে উদপানে পিপাসোঃ যাবানর্থঃ যাবদেব প্রয়োজনং তাবদেব তেনোপাদীয়তে ন সর্ব্বং। এবং সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ব্রহ্মসম্বন্ধী ব্রাহ্মণঃ, বেদার্থং বিজানন্ মুমুক্ষুঃ বৈদিকস্য মুমুক্ষোর্যদেব মোক্ষসাধনং তদেবোপাদেয়ং নান্যৎ।

তাৎপর্য্যার্থ এই যে, বেদোক্ত সমস্ত ধর্ম্মই সকল ব্যক্তির পক্ষে উপাদেয় নহে, যে ব্যক্তির যে প্রকার অধিকার তাহার সেই প্রকার ধর্ম্মই উপাদেয়। বেদের কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে যে ব্যক্তি যে কাণ্ডের অধিকারী তাহার পক্ষে সেই কাণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। পরিপূর্ণ হ্রদ বা সমুদ্রে বহু জল থাকিলেও স্নান পানাদি নিমিত্ত যাহার যতটুকু জলের প্রয়োজন সে ততটুকুই গ্রহণ করিয়া থাকে, সমস্ত জলের প্রয়োজন হয় না, গ্রহণ করিবারও শক্তি নাই। কামনাপরায়ণ মূঢ় ব্যক্তি কর্ম্মী এবং ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞানীব্যক্তি মোক্ষ সাধনোপযোগী নিষ্কামকর্ম্ম ও শ্রবণ, মনন, নিধিধ্যাসনাদি পরায়ণ হইয়া থাকেন। যাঁহারা বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই তাঁহারা নিষ্কামকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া সুদূরপরাহত। এই কারণেই আর্য্যশাস্ত্রে অধিকারিভেদ স্বীকৃত হইয়াছে।

মহম্মদ।

তৃতীয় প্রস্তাব।

মহম্মদ সঙ্গোপনে প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। শত্রুপক্ষ হইতে নির্য্যাতনের ভয় তাঁহাকে সদাই শঙ্কিত রাখিত। তিন বৎসর চলিয়া গেল, কিন্তু তাঁহার শিষ্যসংখ্যা চল্লিশ জনের অধিক হইল না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আবার যুবা, কেহ বা বিদেশী; কেহ বা ক্রীতদাস। লুকায়িতভাবে মক্কার অনতিদূরে এক গুহার মধ্যে উপাসনা কার্য্য চলিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাদের প্রচ্ছন্নভাব অবিলম্বেই প্রকাশ পাইল। মহম্মদের খুল্লতাত আবু লাহাবের পুত্র ওথার সহিত মহম্মদের কন্যা রোকায়ার বিবাহ হইয়াছিল। ঐ আবু লাহাবই মহম্মদের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বিদ্রূপ ও শত্রুতাচরণে এবং রোকায়ার উপর নির্য্যাতনে মহম্মদের মানসিক স্থৈর্য্য শিথিল হইয়া আসিল। ঠিক এই সময়ে মহম্মদের উপর আর এক দৈব আদেশ হইল "উঠ, প্রচার কর, ঈশ্বরের নাম মহীয়ান কর।" উপর হইতে সাহস পাইয়া এই চতুর্থ বৎসরেই তিনি প্রকাশ্য ভাবে সকলকে আহ্বান করিলেন। সর্ব্বসমক্ষে নিজের কথা বলিতে না বলিতেই আবু লাহাবের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; প্রস্তরখণ্ড লইয়া মহম্মদের দিকে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। মহম্মদ ক্রোধে আবুলাহাব ও তাঁহার পত্নীকে অভিশাপ দিলেন। সভাগত লোক সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া গেল। ফলে আবু লাহাব পুত্রবধূকে বাটী হইতে বাহির

করিয়া দিলেন, রোকায় কাঁদিতে কাঁদিতে মহম্মদের বাটীতে চলিয়া আসিল।

মহম্মদ ইহাতে হতাশ হইলেন না। তিনি দ্বিতীয়বার নিজ বাটীতে অনেককে আহ্বান করিলেন; মাংস ও দুগ্ধে সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া স্বর্গ হইতে প্রাপ্ত সুসমাচার জানাইবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। বলিলেন ঈশ্বর কৃপা করিয়া মূল্যবান সত্য প্রেরণ করিয়াছেন; তাঁহার নামে আমি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, অপার আনন্দ তোমরা উপভোগ কর; তোমাদের মধ্যে কে সেই সত্যের ভাণ্ডার গ্রহণ করিতে চাও; কে আমার ভ্রাতা সঙ্গী ও বন্ধু হইতে চাও, অগ্রসর হও। সকলেই শুনিল, কেহ বা বিস্মিত হইল, কেহ বা অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। তাহাদের মধ্যে কেবল আলি যৌবনোচিত উদ্যমের সহিত সবিনয়ে মহম্মদের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। মহম্মদ তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন আলি আমার ভ্রাতা উজীর ও আমার সহকারী; সকলে ইহাঁকে সম্মান কর। ইহা দেখিয়া সকলে তখন ব্যঙ্গ করিতে লাগিল।

মহম্মদের ধর্ম্ম তাঁহার আত্মীয় স্বজনের ভিতরে স্থান পাইল না, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে অল্পে অল্পে প্রসার লাভ করিতে লাগিল। বিপন্ন মহম্মদ সহৃদয়া স্ত্রীজাতির সহানুভূতিও পাইতে লাগিলেন। মহম্মদের শিষ্যগণকে উষ্ট্র মাংস খাইতে দেখিয়া তাঁহার সহযাত্রী য়িহুদীগণও ক্রমে ক্রমে সরিয়া দাঁড়াইল।

মহম্মদের উৎসাহ ব্যর্থ হইল না। প্রকাশ্যভাবে তিনি প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। পৌত্তলিকতার বিলোপ সাধনের জন্য ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিলেন। মধ্যে মধ্যে হ'রা পর্ব্বতের নির্জ্জন স্থানে গিয়া সাধনালব্ধ ঈশ্বরাদেশ লইয়া নব বীর্য্যে বীর্য্যবান হইয়া আবার সকলের সহিত মিলিত হইতে লাগিলেন। প্রবাদ আছে মহম্মদের এই প্রচার সূচনায় খ্রীষ্টিয়ান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি কনষ্টাণ্টিনোপলে নানাবিধ দুর্নিমিত্ত দেখা দিল। ক্রুশ বিনা কারণে বিকম্পিত হইল। বিস্ময়ের প্রচীন জননী নাইল নদীতে দুইটি নৃসিংহমূর্ত্তি একবার আবির্ভূত হইয়া অনতিপরেই বিলীন হইয়া গেল। সূর্য্য বিকৃত ও খর্ব্ব হইয়া দিনব্যাপী ম্লান রশ্মি বিকীর্ণ করিতে লাগিল। অমানিশায় আকাশ তীব্র আলোকে ভরিয়া উঠিল, রক্তাক্ত ভল্ল শূন্যে দেখা দিল। তদ্দর্শনে প্রাচীন ধর্ম্মযাজকগণ খৃষ্টধর্ম্মের সমূহ বিপদ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন।

এ সকলই ঘটিল কিন্তু মহম্মদ বিদ্রূপ ও অবমাননা হইতে তখনও সুরক্ষিত নহেন। পথে বাহির হইলেই লোকে তাঁহাকে গঞ্জনা দেয়, প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেই কোলাহল তাঁহার কণ্ঠকে ডুবাইয়া তোলে, উপাসনা করিতে বসিলেই লোকে তাঁহার গাত্রে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করে। এ সময়ে আরব কবি আম্রু শ্লেষাত্মক কবিতাবাণে আরও মহম্মদকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। কেহ বা মুসা ও ঈশার ন্যায় অলৌকিক কার্য্য দেখাইবার জন্য মহম্মদকে ধরিয়া বসিলেন। মহম্মদ বলিলেন আমার মত নিরক্ষর লোকের মুখ দিয়া প্রখর যুক্তিপূর্ণ অতুল্য ভাষায় কোরাণ বাহির হইতেছে, ইহা অপেক্ষা সমধিক আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি দেখিতে চাও। লোকে তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিতে লাগিল যদি বধিরকে শুনাইতে পার, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিতে পার, মৃতকে জাগাইতে পার, তবে বুঝিব তুমি ঈশ্বরপ্রেরিত। শুষ্ক প্রান্তরে

যদি উৎস উৎসারিত করিতে পার, মরুভূমিকে যদি কাননে পরিণত করিতে পার, রত্নখচিত প্রাসাদ সহজে নির্ম্মাণ করিতে পার, বুঝিব তোমাতে দেবত্ব আছে। মহম্মদ বলিলেন আমি মনুষ্য, ঈশ্বরপ্রেরিত হইলেও আমাতে এ শক্তি নাই। যিনি আমার দ্বারা সত্য প্রচার করিতেছেন তিনি সেই সত্য এখানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দেবদূতের দ্বারা অলৌকিক কার্য্য দেখাইবার প্রয়াসী নহেন। অদ্ভুত কার্য্য দেখাইবার জন্য ঈশ্বর মুসাকে শক্তি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কি হইল। অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াও ফারো তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারিল না, সদলে নদীজলে নিমজ্জিত হইল।

এখন মহম্মদের অবলম্বন তাঁহার অদ্ভুত বাক্‌শক্তি ও তর্কজাল। তিনি ইহারই বলে প্রতিমাপূজার তেজ খর্ব্ব করিতেছিলেন। চেষ্টা ফলোম্মুখ দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক দুরীভূত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুবর্গ তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইল। মহম্মদ তখনও বলিতেছেন, প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার তথাপি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব না। তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া খুল্লতাত আবুতালেব স্তম্ভিত হইলেন ও বলিয়া উঠিলেন, মহম্মদ যাহাই প্রচার করুন না তিনি শত্রুহস্তে কদাপি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন না।

মহম্মদ একদিন কাবার সান্নিধ্যে খোরেসাইতগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার জীবন সংশয়াপন্ন হইল। আবুবেকার নিজে আঘাত সহ্য করিয়া মহম্মদকে রক্ষা করিল। তাঁহার শিষ্যগণের জীবনও বিপন্ন হইয়া উঠিল। প্রাণের দারুণ আশঙ্কা বুঝিয়া মহম্মদ তাহাদিগকে কিছু দিনের জন্য আবিসিনিয়ায় যাইতে পরামর্শ দিলেন, এবং স্বীয় কন্যাকেও তাহাদের সহিত পাঠাইয়া দিলেন।

আবিসিনিয়া যাইয়া তাহারা সদয় ব্যবহার প্রাপ্ত হইল। এই ঘটনা মহম্মদের প্রচার কালের পঞ্চম বৎসরে ঘটে ও ইহা প্রথম হিজিরা বা পলায়ন বলিয়া অভিহিত। দ্বিতীয় হিজিরায় উত্তরকালে মহম্মদকে মক্কা হইতে মেদিনায় পালায়ন করিতে হইয়াছিল।

পরাক্রান্ত খোরেসাইতগণ যখন দেখিল মহম্মদ নিবৃত্ত হইবার লোক নহেন, তখন তাহারা তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত জনগণকে নির্ব্বাসন দিবার ব্যবস্থা করিল। মহম্মদ এই প্রবল ঝটিকার আবর্ত্ত হইতে দূরে থাকিবার জন্য সাফা পর্ব্বতে শিষ্য অরথামের বাটীতে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু শত্রুগণ সেখানেও তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিল। আবুজাল তাঁহার উপর অত্যাচার করিতেছে শুনিয়া মহম্মদের বীর খুল্লতাত হামজা ধনুর্হস্তে বহির্গত হইলেন এবং আবুজালকে বিশেষরূপ শিক্ষা দিলেন। গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, শুদ্ধ মহম্মদ কেন, আমিও তোমাদের এই প্রস্তরের দেবতাকে মানি না; তোমরা কি আমাকে জড়পূজায় বাধ্য করিতে চাও। এই বলিয়া সরোষে মহম্মদধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। যুক্তি তর্ক এতদিন ফিরাইতে পারে নাই, ক্রোধ আসিয়া সহজে তাঁহাকে এই নবধর্ম্মে টানিয়া আনিল।

আবুজাল হামজার হস্তে শিক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ক্রোধবহ্নি ধুমায়মান হইতে লাগিল। ওমার ইবু বলিয়া ২৬বৎসর বয়স্ক ভয়ঙ্করশক্তিসম্পন্ন তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। সে প্রলুব্ধ হইয়া মহম্মদকে হত্যা করিবার জন্য প্রেরিত হইল। পথে এক খোরেসাইতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ

ঘটিল। তাহার নিকট ওমার নিজ সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া ফেলিল। ঐ খোরসাইত মহম্মদের একজন প্রচ্ছন্ন শিষ্য ছিলেন। তিনি ওমারকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, মহম্মদকে বিনাশ করিবার পূর্ব্বে দেখ তোমার আত্মীয়ের মধ্যে কেহ ধর্ম্মত্যাগদোষে অপরাধী কি না। আমার আত্মীয়গণ? হাঁ তোমার ভগিনী আমিনা ও ভগিনীপতি সায়েদ। ইহা শুনিয়া সে ভগিনীপতির বাটীর উদ্দেশে গমন করিল ও দেখিল তাঁহারা উভয়ে কোরাণ পাঠ করিতেছেন। ওমারকে দেখিয়া তাঁহারা কোরাণ লুকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ওমার কোরাণ দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সায়দকে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিয়া তাহার বক্ষের উপর চড়িয়া বসিল, আমিনা স্বামীকে রক্ষা করিতে গিয়া রক্তাক্ত হইল। আমিনা সেই অসহ্য যন্ত্রণার ভিতরও বলিয়া উঠিল, আমাকে হত্যা কর তথাপি আমি বলিব ঈশ্বর এক, তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই, মহম্মদই তাঁহার প্রেরিত। ওমার ভগিনীর বিশ্বাসের সেই দৃঢ়তা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। সায়েদের বক্ষ হইতে পাদদেশ উঠাইয়া লইল। ঈষৎ অনুতপ্ত হইয়া বলিল, আচ্ছা, তোমাদের কোরাণ একবার দেখি। কোরাণ পাইয়া কতক অংশ পড়িল, ভাবান্তর ঘটিল, আবার পড়িল, মুগ্ধ হইল। কোরাণে পুনরুত্থান বার্ত্তা পড়িয়া মহম্মদের দিকে ছুটিল, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল আমি তোমাকে হত্যা করিতে আসি নাই। আমি তোমার অনুগত ভক্ত। প্রকাশ্য ভাবে আমাকে দীক্ষা দাও। মহম্মদ দীক্ষা দিতে আসিলেন। বামে ও দক্ষিণে ওমার ও হামজা মহম্মদকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ৪০ জন শিষ্য মহম্মদের সঙ্গে। খোরসাইতগণ সে দৃশ্য দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। সিংহোপম ঐ দুই বীরের প্রতিকূলে কে দাঁড়াইবে। মহম্মদ কাবায় গিয়া তাহাকে যথাবিহিত দীক্ষা দিলেন। খোরসাইতগণ মূক সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

Sermons of Maharshi Debendranath Tagore.

(Translated from Bengalee.)

SERMON XLIX.

Divine Guidance.

O Spirit Supreme, Thou dwellest in our soul and rulest it as Thou dwellest in and rulest the universe. Thou art the Soul that was never born. Thou art the Soul that is supremely great. Every creature living under thy protection is devoted to its vocation. It is holy work that one who loveth to do thy work doeth. He who hath seen thy hand everywhere, he who hath examined thy work in all places and found it perfect, never wishes to act by dissociating himself from thee; the littleness of his own self, so addicted to sin, becomes repulsive to him, and the lofty sublimity of thy being reveals its beauty to his eyes, and becomes attractive to him. I look at my soul, so prone to sin, and my heart is filled with penitence, but when I contemplate thy holiness, my heart is sanctified. Our soul is mortified when it thinks of the sorrows and miseries to which we are subject, but our heart rejoiceth when it beholds the joy that pervades thy being. O Supreme Spirit, thou art our all. When we discern thy hand and uuderstand thy work, we follow thee; if we can imitate thy goodness even to a minute degree we feel exceeding joy. Everlasting is the union of the soul with

thee. Remaining in our hearts, Thou impartest to us sweet injunctions. Ceaselessly dost Thou impart to us such precepts as, when carried out, may turn into good all that belongs to us and all that will happen to us. What better fortune con befall us than this that although we are of the earth earthy and afflicted by disease and mortified by the pang of bereavement, we are daily advancing on the path of progress. What need have we to obey any other voice than thine when we can hear Thy voice and obey it ? Why should we not listen, rapt in silence, those words of truth and unalloyed goodness, when it is Thee who utterest them and instillest them into our understanding ? Why should we not keep our ears turned to the direction from which comes Thy voice. Why should we not strive to know truth from Thy lips when we know that whenever we shall strive to do so, we shall not be disappointed. Ceaselessly dost thou impart to us thy injunctions, ceaselessly dost thou send the strength of righteousness to our souls and thereby we are enabled to stand erect, else, like a stick unsupported, we must have fallen flat on the ground. Whatever be the injunctions that thou impartest to us, are to be laid to heart, and whatever be the work which Thou commandest us to engage ourselves in, has to be performed by us. Forsake us not, O Great Lord. In this terrible world, abandon us not. We seek thy shelter, we place ourselves under thy protection, take us into thy lap which is to us what the mother's lap is to the infant. Dangers and difficulties of a portentous character and the din of the world endeavour to estrange us from Thee. Dost thou, who art pervaded with mercy, protect us and so ordain that nothing can dissociate us from Thee, but that knowing Thee as our Father and our Mother, we may ever do Thy work.

Sermon L.

The Bliss of Union with God.

No sooner have we prayed to God to reveal Himself to our vision than we find Him manifested here. He has answered our call as our father or mother would do. The Lord is now before us and biddeth us to be fearless. Just at this moment He perfectly refreshes our souls, consumed as they are by the fire of the world, by sprinkling over them the nectar of spiritual felicity, even as this morning He cooled this earth, after the fierce heat of the last few days, by a shower of rain. We were agitated by fear, but God has bidden us to be fearless, and we are now without fear. He reveals Himself in our hearts in solitude ; He does not approach us when we are in the midst of the din, caused by the infatuation which the world exercises over man. As we can not see the sun when it is shrouded by clouds, so we can not behold God when we are separated from Him by the din, caused by the infatuation which the world exercises over man. We have known by experience that when we sit before the Lord with a peaceful heart, He—the Being who is peace itself reveals Himself to us. At times vast congregations had gathered in this Hall, and it might be that on those occasions of enthusiastic religious worship, we could not obtain a glimpse of God, but to day, in this cool, calm hour of the morning, how intensely we feel His holy presence near us, how peacefully and holily do we-a small congregation of few souls—are worshipping Him, how brightly does He now shine over our hearts as the Being who is joy itself and immor-

tality itself, how steadfastly are His eyes, full of motherly love, fixed on our eyes, how calmly there flows at this sacred moment through our heart, like a hidden current under a sandy bed, that divine joy which dispels the infatuation of the world, and how strongly do we now feel tne heavenliness of this joy; this joy is the joy that belongs to eternity, this union between our soul and our God Is the union that will never die. That which deprives us of our life is poison, but that which deprives us of the Life of our life is infatuation. The infatuation of sin is, therefore, amore deadly enemy than poison. O Supreme Spirit, save us from this dreadful bane—the infatuation of sin, and let the joy that comes from our union with Thee, from our love for Thee, grow for ever, so that we might obtain immortality.

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৫, আশ্বিন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১১১১।৶৹
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬২১ ৵৩
সমষ্টি	...	১৭৩২॥/৩
ব্যয়	...	১০৭৯৸৹
স্থিত	...	৬৫২৸/৩

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
একক্তেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

১৫২৸/৩

৬৫২৸/৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	..	৭০৮৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৲

শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী চন্দ্র

২৲

পরলোকগত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
প্রদত্ত বেঙ্গল বণ্ডেড্ অয়ার হাউসের
সেয়ারের ডিবিডেণ্ট
মাঃ শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়

৩৩৬৲

৭০৮৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৮৮৵৹
পুস্তকালয়	...	১৬॥/৹
যন্ত্রালয়	...	২৯৬৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		২৸৹
সমষ্টি	...	১১১১।৶৹

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৭৯১ ৫৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫০।/৩
পুস্তকালয়	...	৫৵৬
যন্ত্রালয়	...	২২৯।৶৬
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৩৸৹
	...	১০৭৯৸৹

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি সম্পাদক।
কার্য্যাধ্যক্ষ ও ধনরক্ষক

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

উপদেশ।

চারিদিকে অন্ধকার। অজ্ঞান-অন্ধকার, পাপতাপের অন্ধকার, বিষাদ ও শোকের অন্ধকার। তাহার মধ্যে এই ব্রহ্মাগ্নি এখানে জ্বলিতেছে। চারিদিকে মরুভূমি, তাহার মধ্যে এই সিরাজের গোলাপের উদ্যান শোভা পাইতেছে। ঈশ্বরের কৃপারূপ পদ্ম এখানে বিরাজমান। এ কি মনোহর দৃশ্য! কি আশ্চর্য্য শোভা! সকলে সদ্ভাবে সুহৃদ্-ভাবে ব্রহ্মোপাসনার জন্য এখানে মিলিত হইয়াছেন। দেখিলে কার না নয়ন, হৃদয় ও মন জুড়ায়? কিন্তু এ দৃশ্য ক্ষণস্থায়ী, গৃহে গৃহে নিত্য বিরাজ করে না ইহাই দারুণ দুঃখের বিষয়। এ দৃশ্য রঙ্গ-ভূমির আলোকের ন্যায়, ক্ষণেক পরেই নির্ব্বাণ হইবে। আমি দেখিতেছি, গৃহস্থের গৃহ সকল শ্মশানতুল্য হইয়াছে। একে শ্মশান তাহাতে অজ্ঞানের ঘোর অমানিশি, তাহার মধ্যে পাপ-পিশাচীর পৈশাচিক হুঙ্কার। কি দারুণ বিভীষিকাময় স্থান। আমি ইহাকে শ্মশান বলিয়াছি কিন্তু ইহা শ্মশান অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর স্থান। কারণ শ্মশানে শৃগাল কুক্কুর মৃত মনুষ্যকে চর্ব্বণ করে, এখানে অপবিত্রতারূপ পিশাচ জীবন্ত মনুষ্যকে চর্ব্বণ করিতেছে। মনুষ্যের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ইহা আলোড়িত। মনুষ্যের শোকাশ্রু ইহার উপর দিয়া বহিতেছে। এখানে কোথায় সুখ-শান্তি, কোথায় ব্রহ্মোপাসনা, কোথায় সদ্ভাব, কোথায় দয়া। এখানে মনুষ্য নিজ হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, পরনিন্দায় নিযুক্ত। কেহ আত্ম-সংশোধনে প্রবৃত্ত হয় না। পরের হৃদয়ে আঘাত করিয়া পৈশাচিক হাস্য হাসিতে হাসিতে গৃহে চলিয়া যায়। হায়! শূন্য এ দেশ, শূন্য এখানকার পরিবার, শূন্য এখানকার হৃদয়। যেন জলশূন্য মহাসমুদ্র, প্রাণশূন্য কলেবর। তাহা হইতেও শ্রীহীন কিন্তু ছিল এক সময়, যখন আমাদের ভারতভূমি স্বর্গতুল্য শোভমান্ ছিল। ছিল একদিন, যখন ঋষিরা সরস্বতীর কূলে বসিয়া তাহার তরঙ্গতালের সহিত স্বীয় স্বীয় হৃদয়োদ্বেলিত তরঙ্গ মিলিত করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। আর বলিতেন,—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ-পরস্তাৎ।"

আমি যেন সেই বেদমন্ত্র এখানে শ্রবণ করিতেছি। আমি যেন দেখিতেছি, তথাকার পর্ণকুটীরে—পবিত্র কুটীরের চারি পার্শ্বে সুগন্ধি পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে তাঁহাদের হৃদয়পদ্ম সকল ফুটিয়া—আত্মপ্রসাদের সমীরণে বাহিত হইয়া ঈশ্বরের চরণে গন্ধ দান করিতেছে। হায়! আমাদের সৌধমালার সঙ্গে সে সকল পর্ণকুটীরের কি বিসদৃশ ভাব! কোথায় মনুষ্যের জন্য হীরকখচিত সিংহাসন, আর কোথায় প্রেমাশ্রুবিধৌত পরমেশ্বরের শত শত সিংহাসন! কোথায় মণিমুক্তা রত্নহার—আর কোথায় অত্যুজ্জ্বল অখণ্ড পুণ্যরাশি! কোথায় ঋষিকন্যাদিগের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম—আর কোথায় এখনকার কুলবালাদিগের সভ্যতাপ্রসূত নূতনতর স্বামিভক্তি। হায়! কোথায় সে সীতা সাবিত্রীর স্বামিভক্তি—কোথায় সে নচিকেতার পিতৃভক্তি। সকলি অস্তমিত হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম বঙ্গভূমি—ভারতভূমি শ্মশান হইতেও অধিক। কবে সে শুভদিন উপস্থিত হইবে, যখন আমরা হৃত রত্ন পুনঃপ্রাপ্ত হইব! কবে সে ব্রহ্মরত্ন বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত হইব! উঠ—জাগ, আজ হইতেই আত্মোন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হও। আত্মা যে পাপরাক্ষসীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ তাহা দেখিতেছ, তথাপি জান না, কাহার শরণাপন্ন হইলে মুক্ত হইবে? পরাধীনতা ও অপবিত্রতার অধীনতা যে কি যন্ত্রণাদায়ক, তাহা এখনও বুঝিতে কি বাকি আছে? দেখ বুয়রজাতি বাহিরের স্বাধীনতার জন্য—স্বদেশরক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিল—আর আমরা স্বদেশ হইতে প্রিয়তর অন্তরের স্বাধীনতার জন্য—আত্মার শান্তির জন্য, কেননা কুপ্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিব? যদি আপনাদের বলে না কুলায়, তবে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অথচ দয়াময় ঈশ্বরের নিকট হইতে কেন না বল ভিক্ষা করিব? ডাক তাঁকে, হৃদয়ের সহিত ডাক। বল আমি দুর্ব্বল। আমাকে বল দাও। যদি যথার্থ ডাকিতে পার, দেখিবে, যে হৃদয়াবদ্ধ পাপরূপ প্রস্তরখণ্ড যাহা তুমি সহস্রবার টানাটানি করিয়া তুলিতে পার নাই—তাহা তাঁহার করুণার প্রবল স্রোতে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে। ছাড় রসনার অকথ্য কথা—ছাড় বিদ্রূপ—ছাড় পরনিন্দা—বল তাহাতে ব্রহ্মনাম।

"এস ভাই সবে মিলে,
ডাকি দয়াল পিতাবোলে।
হোক্‌না কেন পাষাণ হৃদয়,
নামের গুণে যাবে গোলে" ॥

অদ্য শুভরজনীতে তাঁহাকে ভাল[illegible]য়া হৃদয়ে ধারণ কর, আর তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিও না। চক্ষুঃবিহীন দেহ, আর ঈশ্বরবিহীন আত্মা দুই সমান। অদ্য উপাসনান্তে প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞা কর, আর আমি তোমা হইতে দূরে যাইব না। রজনীতে সুখে সেই জগন্মাতার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও, বল যেন স্বপ্নেও আমি তোমাকে দেখিতে পাই—তোমার মধুময় কথা শুনিতে পাই। প্রভাতে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার শরণাপন্ন হইও।

"তাঁহার শরণ লইয়া রহিও।
যাঁহার কৃপায় তুমি খুলিলে নয়ন,
তাঁরে আগে দেখিও" ॥

প্রভাতে মধুকর যেমন অনন্যমনে পদ্মে বসিয়া মধুপান করে, তুমি তেমনি তৎকালে হৃদয়-সরোবরের সহস্রদলে বসিয়া ব্রহ্মামৃতরস পান করিও।

থাকে দুঃখ, থাকে বিষাদ, থাকে পাপতাপ তাঁহার নিকটে খুলিয়া বল। তিনি

তোমার হৃদয়ের ব্যথা দূর করিবেন। ব্যথিত অন্তঃকরণের তিনি যেমন সখা, এমন আর কে? যে কখন ব্যথিত অন্তঃকরণ তাঁহার নিকটে লইয়া গিয়াছে, সেই জানে, তিনি কেমন ব্যথার ব্যথী। নবোদিত সূর্য্য-কিরণে গঙ্গাবক্ষ প্রাতে যেমন শোভা ধারণ করে, আমাদের হৃদয়-সরোবরও যেন প্রতিপ্রাতে এবং অনুক্ষণ সেই জ্যোতিম্ময়ের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়। এস আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার চরণামৃত ভিক্ষা করি। মলিনতারূপ মহাব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার আর অন্য উপায় নাই।

কোথায় দয়াময় প্রেমময়! তোমার প্রেমমূর্ত্তি আমাদিগকে দেখিতে দাও। তুমি তোমার কৃপাবারি এই শ্মশানসমান বঙ্গভূমি ও ভারতভূমিতে এমন করিয়া বর্ষণ কর, যাহাতে এখানকার মলিনতা বহু দূরে চলিয়া যায়—তোমার আশীর্ব্বাদে ইহা যেন নন্দন-কাননে পরিণত হয়। এখানকার হৃদয়-পদ্মের সুগন্ধ যেন নিয়ত তোমার পাদপদ্মের নিকট উত্থিত হয়—এই আমাদের প্রার্থনা। দেব! অনুকূল হইয়া আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

সার সত্যের আলোচনা

আলোচ্য বিষয়।

বিগত প্রবন্ধের শেষভাগে এ[illegible] উঠিয়াছিল এই যে, কাতরভাবে পরমে[illegible]রকে ডাকিবার সময় লোকে করযো[illegible] ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করে, অথচ সর্ব্বসাধার[illegible] ইহা ধ্রুব বিশ্বাস যে, পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বান্তর্যামী; ইহার তাৎপর্য্য কি?

আমাদের দেশের শাস্ত্রে তো আছেই— "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"—সেই বিষ্ণুর পরম স্থান সর্ব্বদা দেখেন সূরিগণ [illegible]কে যেন চক্ষু আতত"; তা ছাড়া, অন্যা[illegible] কথার প্রতিধ্বনি যত্র-তত্র শুনিতে যায়—যেমন এই একটি কথা—"Heart within and God o'erhead"। ইহার কারণ কি? কারণ হ'চ্চে এই:—

মনে কর, তোমার আত্মার [illegible] বাক্যালাপ করিতে [illegible] কোথায় আমি তো [illegible] পাইব? তুমি হয় [illegible] মধ্যে যেমন পাখী [illegible] মধ্যে তেমনি আত্মা আ[illegible] কথা হইতে পারে না এইজন্য ভিতর বাহির দূর-নিকট প্রভৃতি কোনো-প্রকার আকাশঘটিত সম্বন্ধ নিরাকার আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না; আত্মাকে নাগালই পায় না—স্পর্শ করিবে কেমন করিয়া? আকাশঘটিত কোনোপ্রকার সম্বন্ধ আত্মাকে স্পর্শ করিতে না পারুক্, তথাপি তোমার সহিত আমি যখন বাক্যালাপ করিতেছি তখন কাজের গতিকে আমাকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তোমার আত্মা আমার ডাহিনেও নহে—বামেও নহে—উপরেও নহে—নীচেও নহে—[illegible] সম্মুখে বর্ত্তমান; কেন না, তোমার [illegible] বাক্যালাপের সময় তোমার আত্মা [illegible] মুখ-চক্ষুর অভ্যন্তর হইতে উঁকি [illegible]ই ভাবে আমি তোমার আত্মাকে [illegible]করি। এক-তো আত্মা অনাকাশে [illegible] করেন, আর সেইজন্য ভিতর-[illegible] দূর-নিকট প্রভৃতি আকাশঘটিত [illegible]লগ্নই হয় না; তাহাতে [illegible] পাঁচজনের মতে মত দিয়া

মোটামুটি মানিয়া লওয়া যায় যে, আত্মা শরীরের ভিতরে আছেন, তাহা হইলে আর-এক দিকে গোল বাধে এই যে, আত্মা তো মনুষ্যের সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন; আমরা তবে মনুষ্যের প্রতি প্রণিধান করিবার সময় মনুষ্যের মুখমণ্ডলেরই প্রতি লক্ষ্য করি কেন? পদাঙ্গুলির প্রতি লক্ষ্য করি না কেন?

উপরে যাহা ইঙ্গিত করা হইল, তাহাতে সহজ-বুদ্ধিতে সহজেই এইরূপ প্রতীয়মান হইতে পারে যে, যে-কারণে লোকে মনুষ্যের প্রতি প্রণিধান করিবার সময় মনুষ্যের মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপ্রেরণ করে, সেই কারণে ঈশ্বরের প্রতি প্রণিধান করিবার সময় ঊর্দ্ধ আকাশে দৃষ্টিপ্রেরণ করে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সে কারণ কি?

ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থা।

সে কারণ যে কি, তাহার সন্ধান পাইতে হইলে চারিটি বিষয় আনুপূর্ব্বিক বুঝিয়া দেখা আবশ্যক—

(১) ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থা।

(২) বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থা।

(৩) দুয়ের সৌসাদৃশ্য।

(৪) সমস্তের সার্ব্বাত্মিক ঐক্য।

আপাতত মনে হইতে পারে যে, মনুষ্য-শরীরে রক্তবাহিনী নাড়ীর নদী-নালা, বায়ু-বাহিনী নাড়ীর ডালপালা, তৈজসতন্তুর মাকড়সার জাল, অস্থি'র ইষ্টক-গাঁথুনি, মাংসপেশীর কব্জা-বন্ধন, মেদের প্রলেপ এবং মাংসের ছাউনি, এই সকল নানাবিধ উপকরণের একটা পরিপাটি-রকমের ব্যবস্থা আছে; সেই ব্যবস্থার পশ্চাৎ ধরিয়া প্রাণ-মন-বুদ্ধি অনাহূতভাবে একে একে শরীরের মধ্যে আসিয়া জোটে; পক্ষান্তরে, বহির্জগতে সকলই এলোমেলো কাণ্ড;—সেখানে প্রাণ-মন-বুদ্ধির বাসের উপযোগী না আছে বসিবার আসন, না আছে শোবার বিছানা, না আছে ব্যবহার্য্য-দ্রব্যাদির আ-য়োজন;—সেখানে কেহ কাহাকেও চেনে না—কেহ কাহারো খোঁজ লয় না—কেবল একএকটা বিশাল বিশাল কাণ্ড (সমুদ্র—পর্ব্বত—মরুভূমি—অরণ্য—ইত্যাকার বৃহৎ বৃহৎ অসাড় অচেতন ভূত-নিচয়) শত শত-যোজন জায়গা জুড়িয়া পড়িয়া আছে।

বলিতেছ কি? বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে ব্যবস্থা নাই—না তোমার চক্ষু নাই? বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যদি ব্যবস্থা না থাকিবে, তবে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে ব্যবস্থা আসিবে কোথা হইতে? (১) পৃ-থিবীর স্তরসজ্জা; (২) বায়ুমণ্ডলের স্তর-সজ্জা; (৩) অভ্রভেদী পর্ব্বত এবং পাতাল-স্পর্শী সমুদ্রের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের বোঝাপড়া;—তুষার-মুকুটের বাষ্পরূপী কাঁচামাল বায়ু-বোঝাই করিয়া পর্ব্বতসমীপে পাঠাইবেন সমুদ্র, আর, নানা দেশের নানা-জাতীয় মৃত্তিকাস্তরণ নদনদী-বোঝাই করিয়া সমুদ্রসমীপে পাঠাইবেন পর্ব্বত, উভয়ত এইরূপ আমদানি-রপ্তানির বন্দোবস্ত; (৪) বিস্পষ্ট আলোক লইয়া সূর্য্য উঠি-বেন দিবাভাগে, নিদ্রারসার্দ্র সুমধুর আ-লোক লইয়া চন্দ্রমা উঠিবেন রাত্রিকালে, এইরূপ রকমওয়ারি আলোকের উদয়াস্তের পালাবিভাগ;—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের এ কি কম ব্যবস্থা? বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ইত্যাকার অনি-র্ব্বচনীয় মহা-মহা ব্যবস্থার কোনো একটা'র একচুল এদিক্-ওদিক্ হউক্ দেখি—তৎ-ক্ষণাৎ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থার বিপর্য্যয়দশা উপস্থিত হইবে। অতএব ব্যবস্থাপারিপাট্য ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও যেমন, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও তেমনি; অণুবীক্ষণের চক্ষেও যেমন তাহা প্রকাশমান, দূরবীক্ষণের চক্ষেও তেমনি তাহা প্রকাশমান। এখন

কথা হ'চ্চে এই যে, কে আগে, কে পিছে? কে বড়, কে ছোটো? কে দাতা, কে গ্রহীতা? কে কাহার খাইয়া মানুষ? এ কথার উত্তর স্পষ্টই পড়িয়া আছে;—ধান্যক্ষেত্রের মৃত্তিকাতেই মনুষ্যের শরীর গঠিত, সমুদ্রের নোন্‌তা জলেই মনুষ্যের রক্ত রসায়িত, সূর্য্যের আলোকেই মনুষ্যের চক্ষু আলোকিত; মনুষ্যের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আকাশের বায়ুমণ্ডলেরই জোয়ার ভাঁটা। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড পদার্থটা কি? না, সেদিনকার আমি বা তুমি বা তিনি। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড কি? না, যেখানে যত আমি বা তুমি বা তিনি আছেন বা ছিলেন বা থাকিবেন, সমস্ত লইয়া বৃহৎ এক ব্যাপার। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, তাহা তো বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আছেই; তা ছাড়া, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে যাহা নাই, তাহাও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আছে; দশবৎসর পরে যে বালক ভূমিষ্ঠ হইবে, সেই অজাত-বালকও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আছে (বালকরূপে না থাকুক্—আর কোনোরূপে আছে); আর, একশত বৎসর পূর্ব্বে যে মহাত্মারা বঙ্গদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেই স্বর্গীয় মহাত্মারাও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আছেন; কি বেশে এবং কি ভাবে আছেন, সে কথা স্বতন্ত্র। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে জ্ঞান, প্রাণ, মন প্রভৃতি যেখানে যত-কিছু ব্যাপার আছে, সমস্তেরই আকরভূমি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। অতএব এটা স্থির যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড বড়, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ছোটো; বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড দাতা, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড গ্রহীতা; বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড চিরযৌবনসম্পন্ন কত-কালের বৃদ্ধপ্রপিতামহ বলা যায় না, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডগুলি সেদিনকার অভিনব বালক, তাহার মধ্যে অনেকে অকালবৃদ্ধ।

দুই পক্ষের নাম তুমি যাহাই দেও না কেন—সমষ্টি-ব্যষ্টি নামই দেও, বড়-ছোটো নামই দেও, আর দাতা-গ্রহীতা নামই দেও—নাম যাহা দিতে হয় দেও, কেবল এইটি মনে রাখিও যে, দুই পক্ষ একসূত্রে গাঁথা। সে সূত্র হ'চ্চে সার্ব্বাত্মিক ঐক্য। কাজেই দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অবশ্যম্ভাবী। সম্বন্ধ যখন অবশ্যম্ভাবী—তখন সম্বন্ধানুযায়ী কার্য্যও অবশ্যম্ভাবী। সে কার্য্য কি? না, অভাবের পূরণ। অভাব কাহার? যে ছোটো, যে গ্রহীতা, যে ব্যষ্টি, তাহার;—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের। অভাবের পূরণকর্ত্তা কে? না, যিনি বড়, যিনি দাতা, যিনি সমষ্টি, তিনি;—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড, দোঁহার মধ্যে ব্যাপার যাহা চলিতেছে, তাহা সংক্ষেপে এই ঃ—

(১) ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড চা'ন।

(২) বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড দ্যান।

(৩) ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড পা'ন।

চাওয়ার সহিত পাওয়ার সংযোগের নামই আনন্দ। চাওয়ার পূরণচেষ্টার নামই কর্ম্মচেষ্টা এবং চাওয়ার পূরণের নামই ভোগ। একাকী কেবল আমি নহি বা তুমি নহ, পরন্তু জগৎশুদ্ধ সমস্ত লোকই চাহিতেছে, চেষ্টা করিতেছে, পাইতেছে; কাজেই, চাওয়া'র সহিত চাওয়া'র সুর-মিলানো চাই, চেষ্টার সহিত চেষ্টার সুর-মিলানো চাই, পাওয়ার সহিত পাওয়ার সুর-মিলানো চাই; লোকমধ্যে একটা ব্যবস্থা চাই। চাহিবারও একটা ব্যবস্থা আছে, চেষ্টা করিবারও একটা ব্যবস্থা আছে, পাইবারও একটা ব্যবস্থা আছে। ব্যবস্থাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া চাহিলে চাওয়াও নিষ্ফল হয়, ব্যবস্থাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া চেষ্টা করিলে চেষ্টাও নিষ্ফল হয়, ব্যবস্থাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া পাইলে পাওয়াও নিষ্ফল হয়। দৈত্যদানবেরা যখন দেবতাদিগের যজ্ঞের ভাগ হরণ করিয়া "পাই-

য়াছি" বলিয়া আহ্লাদে নৃত্য করে, তখন তাহাদের জানা উচিত যে,—

"অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥"

"অধর্ম্মের দ্বারা লোকে একপ্রকার বৃদ্ধি পায়, তাহার পরে কল্যাণ দ্যাখে, তাহার পরে শত্রুদিগকে জয় করে, সমূলে কিন্তু বিনাশ পায়।" ব্যবস্থা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যেও যেমন—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যেও তেমনি, ইহা পূর্ব্বে দেখা হইয়াছে। তা ছাড়া, দুই ব্রহ্মাণ্ডের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের যোগাযোগেরও একটা ব্যবস্থা আছে; সে ব্যবস্থার একটা যৎসামান্য নমুনা এই:—

ক্ষুধা হ'চ্চে চাওয়া; ক্ষেত্রকর্ষণ হ'চ্চে কর্ম্মচেষ্টা; বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রজাত অন্ন দ্বারা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের উদরপূরণ হ'চ্চে ভোগ। ক্ষুদ্‌বোধ করিতে হইবে, কর্ম্মচেষ্টা করিতে হইবে, অন্নভোজন করিতে হইবে, এই হ'চ্চে ব্যবস্থা। তুমি হয় তো বলিবে যে, "এ যে ব্যবস্থা তুমি দেখাইতেছ—এটা বড্ড-একটা নীচশ্রেণীর ব্যবস্থা; উহার নাম করিতে লজ্জাবোধ হয়। মনুষ্য দেবতুল্য জীব—সে কিনা পেটের জ্বালায় লাঙল ধরিবে! ধিক্!" মুখে বলিতেছ—"নীচের শ্রেণীর ব্যবস্থা"—কিন্তু সেই নীচশ্রেণীর ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া উচ্চশ্রেণীর ব্যবস্থায় ওঠো দেখি—কেমন তুমি বীরপুরুষ! তোমার উদরে একদিন অন্ন না পড়িলে তোমার সাধের মস্তিষ্ক চতুর্দ্দিক্ ভোঁভাঁ দেখিতে থাকিবে! কি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড কি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড, দুয়েরই ব্যবস্থা এমনি কড়াকড় যে, মস্তক যে মাথা উঁচু করিয়া উদরকে বলিবেন—"তুমি কোনো কাজের নহ, তোমাকে চাহি না"; অথবা উদর যে পিত্তবমন করিয়া মস্তককে বলিবেন—"তুমি কোন কাজের নহ, তোমাকে চাহি না"; সূর্য্য যে চোখ রাঙাইয়া পৃথিবীকে বলিবেন—"দূর হও, তোমাকে চাহি না"; অথবা পৃথিবী যে মুখ বাঁকাইয়া সূর্য্যকে বলিবেন—"তুমি যাও, তোমাকে চাহি না"; তাহার জো নাই। সকলেরই সকলকে চাহিতে হইবে—তবে কিনা ব্যবস্থা অনুসারে। উদর যদি চায় যে, "মস্তক আমার কাজ করুন্, আমি মস্তকের কাজ করিব," তবে সেরূপ চাওয়া ব্যবস্থাবিরুদ্ধ, সুতরাং নিতান্তই নিস্ফল।

এখন দেখিতে হইবে এই যে, ব্যবস্থা প্রধানত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেরই ব্যবস্থা—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থা সেই মূল ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি; কেন না, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত। কথাটার ভাব এই:—

সমস্ত-শরীরের যেমন মস্তিষ্ক আছে—বাহুরও তেমনি মস্তিষ্ক আছে; বাহুর মস্তিষ্ক বাহুমূলে অবস্থিতি করে। কিন্তু "মস্তিষ্ক" বলিতে প্রধানত মাথার মস্তিষ্ক বুঝায়—বাহুর মস্তিষ্ক বুঝায় না। অঙ্গুলী যদি বলে যে, "মাথার মস্তিষ্কের খবরে আমার কি কাজ—আদা'র ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কি কাজ? আমার কাছে বাহুর মস্তিষ্কই মস্তিষ্ক!" তবে অঙ্গুলীর মুখে সে কথা শোভা পাইলেও মস্তকের মস্তিষ্ক সে কথায় কখনই সায় দিতে পারে না; মস্তকের মস্তিষ্ক হাসিয়া বলে যে, "আমি যদি শক্তিসংহার করি—তবে বাহুর মস্তিষ্ক সেই দণ্ডে আড়ষ্ট হইয়া মৃতবৎ হইয়া পড়িবে, তাহা সে জানে না।" ফল কথা এই যে, সমষ্টির কাছে ব্যষ্টির প্রভুত্ব খাটে না। বাহুমূলের প্রভুত্ব অঙ্গুলীর কাছেই খাটে—মস্তকের কাছে খাটে না। বাহুর মস্তিষ্ক এবং মস্তকের মস্তিষ্কের মধ্যে যেমন ব্যষ্টি-সমষ্টি-সম্বন্ধ, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের

হিরণ্ময় কোষ এবং বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষের মধ্যেও তেমনি ব্যষ্টি-সমষ্টি-সম্বন্ধ। কাজেই বলিতে হয় যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষই মুখ্য হিরণ্ময় কোষ, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময়-কোষ তাহার একটা চুম্বক অনুলিপি বা প্রতিলিপি। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ যেমন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে আত্মার সহস্রদল আসন, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ তেমনি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আত্মার সহস্রাংশু আসন। অতএব সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের প্রতি প্রণিধান করিবার সময় লোকের চক্ষের চাওয়া এবং প্রাণের চাওয়া দুইই স্বভাবতই ঊর্দ্ধে—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষের দিকে—প্রত্যাবর্ত্তন করিবারই কথা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সূর্য্যের এক নাম সবিতা কিনা প্রসবিতা। সূর্য্য এক সময়ে পৃথিবী ছাড়াইয়া আরো অনেকদূর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। "কে বলিল?" বলিয়াছেন—জ্যোতির্ব্বিদ্যা! জ্যোতিবিদ্যার কথার ভাবে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে, আদিম কালে মহৎ এক তৈজস পদার্থ—অতীব সূক্ষ্ম তৈজস পদার্থ—নিখিল আকাশে পরিব্যাপ্ত ছিল; সেই সুসূক্ষ্ম তৈজস পদার্থ হইতে পৃথিব্যাদি লোকমণ্ডল প্রসূত হইল। পৃথিবী সূর্য্য হইতে নীচে নাবিয়া আসিয়াছে অনেক দুর পর্য্যন্ত;—সূর্য্য পৃথিবীর প্রাণকে উপরের দিকে অর্থাৎ আপনার দিকে টানিতেছে। তা'র সাক্ষী—বৃক্ষদের মূল বা মস্তক যদিচ ভূগর্ব্তে প্রোথিত রহিয়াছে, তথাপি বৃক্ষেরা ঊর্দ্ধে হাত-পা ছুঁড়িয়া আকাশের অভিমুখে ডালপালা বিকীর্ণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। বৃক্ষেরা ভূগর্ভ হইতে মূল বা মাথা বাহির করিতে পারে না—সর্পেরা কিন্তু তাহা পারে। তবে কিনা সর্পেরা পৃথিবীর সঙ্গে লপ্টা-লপ্টি-ভাবে চলাফেরা করে। পশ্বাদি জন্তুরা কেহ বা সরু-সরু দুই স্তম্ভে ভর করিয়া পৃথিবী হইতে অলগ্ হইয়া দাঁড়ায়—যেমন সারসপক্ষী; কেহ বা মোটামোটা চারি স্তম্ভে ভর করিয়া পৃথিবী হইতে অলগ্ হইয়া দাঁড়ায়—যেমন হস্তী। জীবগণের মধ্যে মনুষ্যই কেবল একাকী পূর্ণমাত্রায় পৃথিবী হইতে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়। মনুষ্যের মস্তক যেমন পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মনুষ্যের অপার্থিব বিশেষত্বের পরিচয় প্রদান করে, মনুষ্যের চাওয়াও তেমনি পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধে উন্মুখ হইয়া মনুষ্যের অপার্থিব বিশেষত্বের পরিচয় প্রদান করে।

মনুষ্যের আধ্যাত্মিক প্রাণের চাওয়া স্বভাবতই দুই দিকে দৌড়ে—মনুষ্যের দিকে এবং পরমেশ্বরের দিকে। মনুষ্যের চক্ষের চাওয়াও তাহার সঙ্গে গোড় দিয়া সম্মুখে মনুষ্যের চক্ষুর প্রতি এবং ঊর্দ্ধমুখে ঈশ্বরের চক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর, ঐ দুই দিকের দৃষ্টি-চালনা-কার্য্য যাহাতে সুনির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহার মতো একটা দীপ-ব্যবস্থাও মনুষ্যশরীরে আছে। অশ্ব-গবাদির দুই চক্ষু তাহাদের ললাটের দুই পার্শ্বে আড়াআড়ি ভাবে বসানো রহিয়াছে—ইহা সকলেরই দেখা কথা। কেবল মনুষ্যের এবং মনুষ্যাকৃতি জীবের দুই চক্ষু ললাটের সম্মুখে একপংক্তিতে বসানো রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। জাতি-ভাইদিগের পরস্পরকে পরস্পরের চক্ষের চাওয়ার মধ্য দিয়া মনের চাওয়া জানানো চাই—তাই মনুষ্য এবং মনুষ্যাকৃতি জীবদিগের দুই চক্ষু সম্মুখদৃষ্টির উপযোগী করিয়া ললাটের মধ্যস্থলে একপংক্তিতে বসানো রহিয়াছে। তাহার মধ্যে বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এই যে, জাতিভাইদিগের সহিত

সম্মুখদৃষ্টি চালাচালি করিতে বানরদিগকেও দেখা যায়; কিন্তু ঈশ্বরোদ্দেশে উর্দ্ধে দৃষ্টি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরকোনো জীবকেই দেখা যায় না—সওয়ায় মনুষ্য। কাজেই বলিতে হয় যে, ভ্রূমধ্যস্থিত তৃতীয় চক্ষুর ঊর্দ্ধদৃষ্টি মনুষ্যের একটি স্বজাতীয় বিশেষত্ব। তবে কিনা, মনুষ্য সবেকেবল হামাগুড়ি ছাড়িয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে—এখনো মনুষ্যের তৃতীয় চক্ষু ভাল করিয়া ফোটে নাই। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যের চাওয়ার যতটা টান মনুষ্যের চক্ষুর প্রতি, তার সিকির সিকি টানও ঈশ্বরের চক্ষুর প্রতি এখনো লোকসমাজে জন্মে নাই। মনুষ্যের চক্ষুর প্রতি চাহিয়া মনুষ্য কি না করে? মনুষ্যের চক্ষুর প্রতি চাহিয়া যোদ্ধা হেলায় প্রাণ দ্যায়, নাবিক ভেলায় সমুদ্র পার হয়, কবির কণ্ঠের ফোয়ারা খুলিয়া যায়, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের সূক্ষ্মদৃষ্টি পাষাণভেদী হইয়া উঠে। কোনো দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষের চতুর্দ্দিক্ হইতে যদি মনুষ্যমণ্ডলীর চক্ষু সুদূরে সরাইয়া রাখা যায়, তবে তাঁহার মহাপ্রতাপান্বিত শৌর্য্যবীর্য্য-প্রভাবপরাক্রম সমস্তই একমুহূর্ত্তে মাটি হইয়া যায়! দেশশুদ্ধ লোকের প্রাণের চাওয়া এবং চক্ষের চাওয়া, দুইই মনুষ্যের চক্ষুর দিকেই দিবানিশি উন্মুখ; তা বই, বর্ত্তমান-কালের কৃতবিদ্যসমাজে কয়জনের প্রাণের এবং চক্ষের চাওয়া ঈশ্বরের চক্ষুর প্রতি দিনের মধ্যে একবারও প্রত্যাবর্ত্তন করে? কিন্তু যাহাই হউক্ না কেন—মনুষ্য সত্য সত্যই কিছু আর পশু নহে—মনুষ্য মনুষ্য।

এটা যখন স্থির যে, তৃতীয় চক্ষুর ঊর্দ্ধদৃষ্টি মনুষ্যের একটি স্বজাতীয় বিশেষত্ব, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে এই যে, সম্মুখদৃষ্টিই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব নহে। কিন্তু তথাপি সম্মুখদৃষ্টি এবং ঊর্দ্ধদৃষ্টি, দুয়ের মধ্যে এমনি একটা ক্রমান্বয়িতা-সম্বন্ধ আছে—যাহা কোনো অংশেই উপেক্ষণীয় নহে; সে সম্বন্ধ এইরূপ ঃ—

মনে কর, একটা অরণ্যের মধ্যে শাখায় শাখায় ঘর্ষাঘর্ষি হইয়া এক স্থানে অগ্নি উত্থিত হইল। প্রথমে সে অগ্নি বায়ুদ্বারা তাড়িত হইয়া সম্মুখে বিস্তৃত হইতে লাগিল, এবং পরিশেষে সমস্ত অরণ্যটা কবলিত করিয়া আকাশাভিমুখে উদ্ধূত হইয়া উঠিল। একটি এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, যে দাবানলের নীচের বিস্তার যত বেশী, তাহার উপরের শিখাগ্র ততই উচ্চে উত্থান করে। আর-একটি দ্রষ্টব্য এই যে, অগ্নির শিখাগ্র বিন্দু-পরিমাণ; অথচ সেই স্থানটিতে অগ্নির সমস্ত উত্তাপ যেন কেন্দ্রীভুত হইয়া রহিয়াছে—এমনি তাহার প্রবল দাহিকা শক্তি। তৃতায় দ্রষ্টব্য এই যে, অগ্নির নীচের বিস্তার, শিখার ঊর্দ্ধগামিতা এবং শিখাগ্রের প্রাখর্য্য, তিনের পরিমাণ পরস্পরের সদৃশ। এই উপমার সাহায্যে মোটামুটি এইরূপ একটা ভাবের উপলব্ধি সহজেই হইতে পারে যে, সম্মুখদৃষ্টির বিস্তার ঊর্দ্ধদৃষ্টির একতানতা, এবং লক্ষ্য কেন্দ্রের প্রভাবমাহাত্ম্য, তিনের মধ্যে সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে।

এবারকার প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়গুলি মোটামুটি লৌকিকভাবে বলিয়া চোকা হইল। যাহা বলা হইল—কথাগুলি মোটামুটি-ধরণের বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে অনেকগুলি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক তত্ত্ব চাপা দেওয়া রহিয়াছে। শেষোক্ত তত্ত্বগুলি খোলসা করিয়া ভাঙিয়া না বলিলে—পাঠকবর্গের মনের ধন্দ কিছুতেই মিটিবে না, তাহা আমি জানি। সেই সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি অবশ্য প্রকাশ্য—কিন্তু শনৈঃশনৈঃ ক্রমশঃ।

রাজনীতি সংগ্রহ।

উপায় পূর্ব্বক লাভের ইচ্ছা করিবে। প্রকৃত অবসর বুঝিয়া আক্রমণ করাই উচিত। কেবল বিক্রম প্রকাশেই যাহার দৃষ্টি তাহার কার্য্য পশ্চাত্তাপের জন্য হইয়া থাকে। সুপ্রসন্ন বুদ্ধি দ্বারা সাধ্যাসাধ্যের পরিচ্ছেদ করিবে, যাহারা এই বিষয়ে বিমুখ হস্তীর পর্ব্বতবিদারণের চেষ্টা যেমন দন্তভঙ্গের জন্য হয় তাহাদের উদ্যমও সেইরূপ হইয়া থাকে। যাহারা অসাধ্য বুঝিয়াও কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় কেবল ক্লেশ ব্যতীত আর তাহাদের কি ফল হইতে পারে। ফলত কর্ম্মবিপত্তি স্পষ্টই পরিতাপের কারণ হয়। জ্ঞানানুগত বুদ্ধিদ্বারা সম্পদের পদে উঠিবার চেষ্টা করিবে, যাহারা সাবধানে পদন্যাস করে তাহারাই উন্নত শৈলশিখরে উঠিতে পারে। রাজপদ অতিদুরারোহ ও সকল লোকেরই পূজ্য, ব্রাহ্মণত্বের ন্যায় অল্প অপচারেই তাহা দুষিত হইয়া যায়। সকল কাজই স্থির বুদ্ধিতে করিবে, স্থিরবুদ্ধিকৃত কার্য্য অচিরাৎ মনোহর বনের ন্যায় ফলপ্রদান করিয়া থাকে। বুদ্ধিবিচার সহকারে কার্য্য আরম্ভ করিলেও যদি তাহা নিষ্ফল হয় তাহা তদ্রূপ পরিতাপের কারণ হয় না যেমন মোহকৃত কার্য্য পরিতাপের জন্য হইয়া থাকে।

আপনাকে ও শত্রুপক্ষকে সম্যক বুঝিয়া বিগ্রহাদি করিবে, এই আত্মপরজ্ঞানই সম্যকবিজ্ঞান। যে কার্য্যে ফল কিছুই নাই অথবা যাহা সন্দিগ্ধফল এবং যাহার অনুষ্ঠানে কেবল ক্লেশবাহুল্য বুদ্ধিমান লোক কদাচ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। যাহার উত্তর কাল শুভপ্রদ ও হিতকর সাধুগণের সেই কার্য্যই সুসম্মত। যে কার্য্য হিতানুবন্ধি, যাহার অনুষ্ঠানে কোনরূপে নিন্দনীয় হইতে হয় না সেই কার্য্য আপাতত দৃষ্টিতে কটুকষায় বোধ হইলেও তাহা করিবে। ফল লাভের জন্য বুদ্ধি পূর্ব্বকই কর্ম্ম করা উচিত, অবিচারে কর্ম্মারম্ভ করিয়া সম্পদ অর্জন করা বড় কঠিন, সিংহ উপায় সহকারেই মত্ত হস্তীর মস্তকে পদার্পণ করিয়া থাকে। যাহারা প্রকৃত বিচক্ষণ তাহাদের কুত্রাপি কিছুই অসাধ্য নাই, অভেদ্য লৌহকেও লোকে উপায় অবলম্বন করিয়া দ্রবীভূত করিয়া থাকে। একটা লৌহখণ্ড বহন কর তদ্দ্বারা তোমার স্কন্ধচ্ছেদ হইবে না কিন্তু উহাই অল্প হইলেও যদি ধারাবৎ হয় কার্য্য সাধন করিবে। জল যে অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া থাকে ইহা লোকপ্রসিদ্ধ কথা কিন্তু উপায় যোজিত ঐ অগ্নিই আবার জল শোষণের কারণ হয়। অবিজ্ঞাতের বিজ্ঞান,বিজ্ঞাতের নিশ্চয়তা, কার্য্যদ্বৈধের সন্দেহচ্ছেদন ইহাই সম্যকদর্শন। পণ্ডিতের পরামর্শ শুনিবে, কাহারই অবমাননা করিবে না এবং সুকথা পাইবার জন্য আদর সহকারে সকলেরই বাক্যে কর্ণপাত করা আবশ্যক। যে রাজা গর্ব্বিত কার্য্যাকার্য্য বিচারে বিমূঢ় এবং যিনি মন্ত্রীকে অতিক্রম করেন শত্রুরা তাঁহাকে অচিরাৎ পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। সর্ব্বতোভাবে মন্ত্রবীজ রক্ষা করিতে চেষ্টিত থাকিবে, রাজপদের তাহাই বীজ, যাহা ভেদ হইলে নিজের ভেদ হয় এবং যাহা রক্ষিত হইলে নিজেই সুরক্ষিত হইয়া থাকে। যাহাতে পশ্চাৎতাপ জন্মে না, লোকানুরাগ যাহার ফল সেই মন্ত্রই অভীষ্ট মন্ত্র। এই মন্ত্রের পাঁচটী অঙ্গ—সহায়, সাধন, উপায়,দেশকাল বিভাগ ও বিপাত্তর প্রতীকার। উদযুক্ত কার্য্যে যত্নপর এবং অনুদযুক্ত কার্য্যে চেষ্টাপর হইবে, সদ্বৃত্তি দ্বারা এই সমস্ত কার্য্য প্রযুক্ত হইলে অবশ্য ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

কার্য্যে মনের অনুমাত্র আশঙ্কা হয় না সেইখানেই বুঝিবে মন্ত্রিমনের সহিত নিজের সাম্য। যে কার্য্য দ্বারা সাধুগণের নিন্দাভাজন হইতে হয় না তাহাই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মন্ত্রীরা কোন বিষয় মন্ত্রণা করিয়া দিলেও রাজা নিজে ভূয়োভূয়ঃ তাহার বিচার করিবেন এবং সেই বিষয়েই প্রবৃত্ত হইবেন যাহাতে স্বার্থের কোন ব্যাঘাত না হয়। স্বার্থপর মন্ত্রীরা যুদ্ধ দীর্ঘ-কালস্থায়ী করিবার চেষ্টা করে, যে রাজা সুদীর্ঘকালসাধ্য কার্য্যে আকুল থাকে তিনি মন্ত্রীদিগের প্রকৃত রূপে ভোগ্য হইয়া থাকেন। মনঃপ্রসাদ শ্রদ্ধা ও ইন্দ্রিয়পটুতা থাকিলেই বুঝিবে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে।

মন্ত্রণা যাহা স্থির হইবে পুনঃপুনঃ তাহার পরিবর্ত্তন করিবে না, প্রত্যুত তৎপ্রতি শ্রদ্ধা স্থাপন পূর্ব্বক তৎসংরক্ষণে যত্নবান থাকিবে, দৃঢ়তা না থাকিলে নিজেরই অনিষ্ট হয়। মদ, প্রমাদ, কাম, স্বপ্নপ্রলাপ এবং প্রচ্ছন্ন কামিনীগণ মন্ত্রভেদ করিয়া থাকে। যে গৃহে স্তম্ভ ও গবাক্ষ নাই সেই গৃহে এবং প্রাসাদের উপর ও অরণ্যে প্রচ্ছন্নভাবে মন্ত্রণা করিবে। মনু মন্ত্রগৃহ দ্বাদশ, বৃহস্পতি ষোড়শ ও শুক্র বিংশতি প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপরে বলেন মন্ত্রগৃহ যথাসম্ভব নির্ম্মাণ করিবে। রাজা মন্ত্রণাগারে প্রবেশ করিয়া সমাহিত চিত্তে কার্য্য সিদ্ধির জন্য মন্ত্রিগণের সহিত পরা-মর্শ করিবেন। তিনি ইঁহাদের প্রত্যেকে-রই কথা শুনিবেন কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে যিনি দৃষ্টকর্ম্মা হিতকারী ও সুবোধ তাঁহা-রই মতস্থ হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করা আব-শ্যক। কোন বিষয় স্থির করিয়া কার্য্য-কাল অতিক্রম করিবে না, কার্য্যযোগ নিতান্ত দুর্লভ, ইহা কদাচই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং যে সময় যাহা করিতে হইবে তাহা কিছুতেই কদাচ উপেক্ষা করা উচিত নহে, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই বিষয়ে সাধুসম্মত পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন। যিনি যথা-কালে অনুষ্ঠান করেন তিনিই তাহার স্বাদু-ফল ভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপে রাজা দেশকাল ও সহায় সম্পদ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পররাষ্ট্র আক্রমণ করিবেন। এই বিষয়ে যেন কিছুতেই অস্থিরতা প্রকাশ না পায়। যে রাজার অহিতকর কার্য্যে হিতবুদ্ধি, যিনি মন্ত্রীর মতে অনাস্থা দেখান সেই নির্বোধ নিশ্চয়ই পতন লাভ করেন, তাঁহার আর পুনরুত্থান হয় না।

মন্ত্রণা স্থির হইলেই প্রয়াণের জন্য অগ্রে দূত পাঠাইবে। যিনি প্রশান্ত, স্মরণ-শক্তিমৎ, বাগ্মী, শাস্ত্র ও শস্ত্রে নিপুণ, এবং যাহার বিশেষরূপ কার্য্যপটুতা আছে সেই-রূপ লোকই রাজার দূত হইবে। দূত তিন প্রকার—নিসৃষ্টার্থ, মিতার্থ ও শাসনবাহক। এই সমস্ত দূত ভর্ত্তৃনিদেশে স্বরাষ্ট্রে ও পররাষ্ট্রে বিচরণ পূর্ব্বক সমস্ত জ্ঞাত হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্তঃপাল, মিত্র, আটবিকগণকে জলস্থল পরীক্ষার জন্য অগ্রে পাঠাইবে। রাজা সম্যক না জানিয়া শত্রুপুরী ও শত্রু-সভায় যাইবেন না, কার্য্যের নিমিত্ত কাল প্রতীক্ষা করিবেন। আক্রমণের পূর্ব্বে শত্রুর সাররত্তা, দুর্গ, দুর্গরক্ষা, শত্রুর ছিদ্র, কোষ, মিত্র ও বল প্রভৃতি সম্যক জানিবে। প্রজারা তাঁহার প্রতি অনুরক্ত কি বিরক্ত তাহাও জ্ঞাত হইবে।

ক্রমশঃ।

Sermons of Maharshi Debendranath Tagore.

(Translated from Bengalee.)

SERMON LI.

The relation Between God and Man.

No sooner have we prayed to the Lord to manifest Himself to us than we behold Him—Our Divine Father and Mother—before us. His goodness is brightly revealed here. We behold His immortal light ascending from here to the heavens and overspreading all space. Immersed in that Light of knowledge which is like unto a sea of nectar lies the whole universe. The universe is centred in God, who is knowledge itself, even as a coral island is centred in the ocean. The boundless sky, bespangled with numberless stars, lies, as it were, in the lap of the Lord who is full of the light of infinite goodness and infinite knowledge. Not one person only, not one creature only, not one soul only, but innumerable creatures and souls, inhabiting the numberless worlds, exist with all their desires in that ocean of infinite Love; and remaining there do all sentient beings obtain the objects of their desires, derive meat and drink that nourish them, and grow in knowledge and righteousness. Only from that One Supreme Spirit do all creatures obtain the objects of their desires. What is the name of that Supreme Spirit? He has no name. What is the form of that great Lord? He is without any form. He is beyond name and form. If for the reason that He is boundless we call Him 'the space' which is boundless, that would not mean that his name is 'space', for He is beyond all name and form and is the creator of all names and forms. Then who is He? He is the truth, He is Brahma, He is the omnipresent Spirit, He is the utmost extension of largeness, and the perfection of greatness; none is there who is greater than Him, none is there who is superior to Him. Some call Him 'Om,' some call Him 'Hu,' but He has in reality no name. The Rishis of ancient India called Him 'Om', the Arabs called Him 'Hu,' but his name is neither "Om" nor "Hu". He has no name, He has no form; He is beyond name and form, He is the dispenser of names and forms. God is beyond all space, and beyond all name and form, yet, pervading the space, He preserves this name-and-form-bound universe. The soul that is in the human body is superior to space, and God, though infinitely transcending the finite human soul, sustains it by being its constant friend and companion. Although God is beyond this world and beyond time, He stoops to be the Father and Mother of this world and to preserve it. He is greater than our father and mother, for He sendeth affection into the hearts of our father and mother. God has no name, no form, and no limitation to His perfection; He never lets any thing to impair his own being; He never shows himself to be what He is in truth not; He always exists in the full glory of his own real being. He is not subject to change. He always manifests himself uniformly; He always stands revealed in this universe; He exists, illumining the whole universe. He is not what is little; He is the great omnipresent Spirit. Cherish in your heart the desire to know this great

Being, seek this great Being, and place yourselves under the protection of this great Being. If our little soul had not obtained the shelter of the great God, if He had not been the strength of the weak, then there would have been no end to our misery in this world, then we must have been weighed down by sorrow and must have had to mourn ceaselessly, and nothing would have mitigated the agony of our soul. Having made God our anchor, we have become fearless, and found solace for our afflicted hearts. We have obtained as our refuge Him who is the Strength above all strength, who is the Love above all love, and who is the Good above all good. He is sending righteous aspirations into every soul. He is repressing the crooked designs that we form in our hearts and is distributing in a way unknown to others the rewards for righteousness. If men caluminate an innocent fellow man, God saves him from calummy ; if men abondon him, God receives him into His protection and sends peace to his heart. Our ideal is God ; we realize His nature and endeavour to bring the spirit of it down to this world ; if in this great endeavour we do not find satisfaction for all our aspirations, God does not deny us ample reward for that holy endeavour. If God had not been the support of our souls, who among us could have borne the misery and afflictions of life in order to perform its duties ? How could we have saved ourselves from the evil machinations of the world if God had not existed as the refuge of our souls ? We mingle with people in a righteous spirit with the object of propagating the truths of religion, but they try to dissude us from good fellowship, from righteousness, and from God. Making God our mainstay, we endeavour to shun quarrels and disputes, but people interpose to deprive us of the peace achievable in that condition ; they come and deafen our ears by raising the din and noise that proceed from world-infatuation, and thus they wrest us from the Lord's feet that give us fearlessness. God is our sole refuge ; eager to obtain salvation, we seek His protection. May He protect us !

O Supreme Spirit, we come to Thee not as beings who have attained to a high degree of progress, but as those who are lowly that thou mayest elevate us. We approach Thee not as saints but as sinners, that thou mayest deliver us from sin and save us from ignorance and frailty. We come to Thee as poor afflicted souls, that our days of misery may be brought to a termination. We come to Thee not puffed up by pride which prosperity generates, but as ugly, filthy creatures, that thou mayest wash away our filth and fill our heart with a holy, righteous spirit and clothe it with beauty. We seek Thy shelter as evil-disposed beings, that Thou mayest lift us up to the rank and position of the good and the pure. Frightened by the darkness around us we seek Thee, that Thou mayest lead us to Thy light which is self-manifest. Entangled in the snare of death we call unto Thee that thou mayest conduct us to Thee who art immortality itself. All that pertains to us is but the road to evil destiny or to a condition of utter misery, but thou art our only good and only prosperity. Depending on Thee, we await the reality, the light and that which is immortal. We know it with all certainty that the faith that Thou hast planted in our breast will not be foiled. O Spirit Supreme, lead us from unreality to reality, from darkness to light, from death to immortality. O Thou that art self-manifest, dost thou reveal thyself to me. O Thou that now showest thyself to

be of ungraceful mien, dost thou reveal to me thy benignant face and ever protect us thereby.

১৮২৬ শকের বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্য ও মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	১২৲
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন রায়	,,	১২৲
শ্রীযুক্ত বাবু পদ্মনাথ নারায়ণ দেও	পারলাকেমিডি	৩৶৹
,, ,, সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩৲
,, ,, গোপালচন্দ্র দে	,,	১৲
,, ,, সুরেন্দ্রনাথ কবিরত্ন	,,	১৲
,, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	কাসিমবাজার	১২।৶৹
,, বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার	লাহোর	৩।৹
,, ,, এস্ পি সিংহ এস্কোয়ার	কলিকাতা	৩৶৹
,, ,, প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী	বালীগঞ্জ	৩৲
,, ,, সতীশচন্দ্র মল্লিক	কলিকাতা	৬৲
,, ,, হরনাথ রায়	,,	৩৲
,, ,, সাতকড়ি মিত্র	,,	৩৲
,, ,, লালবিহারী বসাক	,,	৩৲
,, ,, দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত	দেবানন্দপুর	৬৸৹
,, ,, জে, সি, ঘোষ	নাগপুর	৩৶৹
,, ,, দ্বারকানাথ রায়	কলিকাতা	৩৲
,, ,, রামচরণ মিত্র	,,	৩৲
,, ,, বেহারীলাল মল্লিক	,,	৩৲
,, ,, কেদারনাথ রায়	,,	৩৲
শ্রীমতী রাণী হেমন্তকুমারী দেবী	পুঁটিয়া	৩৶৹
শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	৩৲
,, ,, গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়	,,	৩৲
,, ,, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র	,,	৩৲
,, ,, চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	পাণ্ডুয়া	৩৶৹
,, রায় বলাইচাঁদ পাইন বাহাদুর	কলিকাতা	৩৲
,, বাবু চন্দ্রশেখর বসু	,,	৩৲
,, ,, অঘোরনাথ শেঠ	,,	৩৲
,, ,, যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী	কুমিল্লা	৩৶৹
,, ,, নিমাইচাঁদ মল্লিক	কলিকাতা	৩৲
,, ,, হরিমোহন দত্ত	,,	১।৹
,, ,, প্রসাদ দাস মল্লিক	,,	৩৲
,, ,, বৃন্দাবন দাস	কাণ্টাই	২৲
,, ,, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	৩৲
,, ,, রামচন্দ্র সিং	,,	৩৲
,, পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	,,	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	,,	৩৲
,, কুমার হৃষীকেশ লাহা বাহাদুর	,,	৩৲
,, রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর	,,	৩৲
,, বাবু গোবিন্দলাল দাস	,,	৩৲
,, মৌলভি বিলাইত হোঁসেন সাহেব	,,	৩৲
Mr. M. Ramkristo Dass	Bangalore	৩৶৹
শ্রীযুক্ত বাবু গোবর্দ্ধন শীল	চন্দননগর	২।৶৹
Dr. D, N. Chaterjee,	কলিকাতা	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার সরকার	রাজসাহী	৩৶৹
,, ,, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়	হালিসহর	৬৸৹
,, ,, বনমালী চন্দ্র	কলিকাতা	৩৲
,, সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	নোয়াখালী	১০৲
,, বাবু শ্রীনাথ রায় বাহাদুর	কলিকাতা	৩৲
,, ,, অক্ষয়কুমার ঠাকুর	,,	৫৲
,, ,, গোপালচন্দ্র বড়াল	পাহাড়পুর	১০৸৶৹
,, ,, আশুতোষ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	২৲
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	সইদাবাদ	৬৸৹
,, ,, মহেশচন্দ্র ঘোষ	বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজ	৫৲
,, ,, কীর্ত্তিরাম বড়ুয়া	শিলং	৫৲
,, ,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	৩৲
,, ,, গণেশপ্রসাদ লালা	দ্বারভাঙ্গা	৩৶৹
,, সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	কাকিনা	৬৸৹
,, বাবু জগৎচন্দ্র নাথ	গোয়াড়ী	১৩।৹

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৫, কার্ত্তিক মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫৩৮৴০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬৫২৮৵৩
সমষ্টি	...	৭০৬৷৵৩
ব্যয়	...	৪১৷৵৩
স্থিত	...	৬৬৫৷০

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
একেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

১৬৫৷০

৬৬৫৷০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	১৫৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রায় বলাইচাঁদ পাইন বাহাদুর

১৫৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৫৷৵০
পুস্তকালয়	...	১০৷৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	১৷০
গচ্ছিত	...	১৷৷০
সমষ্টি	...	৫৩৮৴০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৮৴০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৫৷৵৩
পুস্তকালয়	...	৷৵০
যন্ত্রালয়	...	৬৷৷৵০
সমষ্টি	...	৪১৷৵৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি সম্পাদক।

কার্য্যাধ্যক্ষ ও ধনরক্ষক।

বিজ্ঞাপন।

পঞ্চসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

ষোড়শ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

৭৩৮ সংখ্যা

১৮২৬ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্

সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া

পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শান্তিনিকেতনে চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

গত ৭ই পৌষে শান্তিনিকেতনের উৎসব যথাবিধি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে স্থানীয় জনসাধারণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভিন্ন প্রদেশীয় লোকের তাদৃশ সমাগম হয় নাই। এই উৎসবে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাতে ও সন্ধ্যায় আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ অতিমাত্র মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। কি জন্য এই ৭ই পৌষের মহোৎসব, কেনই বা নানাস্থান হইতে শান্তিনিকেতনে এত লোকসমাগম হয় রবীন্দ্র বাবু শ্রোতৃগণের মনে সুমিষ্ট ও সরল ভাষায় তাহা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। দ্বিপ্রহরে মেলা হইয়াছিল। এই মেলার কোলাহলে সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর পূর্ণ হইয়া উঠে এবং স্থানীয় দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয়ও যথেষ্ট হয়। দীনহীন দরিদ্রেরা অন্ন বস্ত্রাদি পাইয়া এই উৎসবে পূর্ব্ববৎ যোগ দিয়া আনন্দ ও উল্লাস প্রদর্শন করিয়াছিল এবং রাত্রিতে বিপুল বহ্ন্যুৎসব সর্ব্বসাধারণকে পুলকিত করে। ফলত ৭ই পৌষের এই মেলা স্থানীয় লোকদিগের যে ক্রমশঃ অধিকতর আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কালে যে ইহা অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রের মেলার ন্যায় সর্ব্বসাধারণের একটা আকর্ষণের বস্তু হইবে তাহার পূর্ণ সম্ভাবনা। এই স্থলে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা আছে। অন্যান্য তীর্থের মেলা দোষসম্পর্কশূন্য নহে। তথায় অনেক আপত্তিজনক বস্তু অবাধে ব্যবহৃত হয় এবং পতিত ও অপবিত্র স্ত্রীলোকের নৃত্যগীতাদিও যথেষ্ট প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। কিন্তু এই মেলা ব্রাহ্মের মেলা, ব্রহ্ম ইহার অধিষ্ঠাতা, ইহা সর্ব্বাংশে পবিত্র। ইহাতে এমন কিছুই নাই যাহাতে লোকের মন কুপথে আকৃষ্ট হয়। যে উদ্যান মেলাভূমি তন্মধ্যে স্তম্ভে স্তম্ভে বেদমন্ত্র খোদিত। যিনি জ্ঞানী তিনি তাহাতে অনেক চিন্তা করিবার বিষয় পান এবং যিনি ভক্ত তিনি ভক্তিপথের পরিপোষক অনেক কথা পাইয়া থাকেন। উদ্যানের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেদি বৃক্ষতল শোভিত করিয়া আছে। যাঁহার ইচ্ছা তদুপরি ধ্যানস্থ

হইয়া বসুন সুপ্রশস্ত প্রান্তরের সুনির্ম্মল বায়ু, বিহঙ্গকুলের মধুর কোলাহল, প্রকৃতির রমণীয় সৌন্দর্য্য তাঁহার ধ্যানের সহায়তা করিবে। তিনি গৃহে ঈশ্বরচিন্তায় যে স্থৈর্য্য ও আরাম লাভ করিতে পারেন না তথায় নিশ্চয়ই সেই স্থৈর্য্য ও আরাম পাইবেন। ফলত এই উদ্যান—মেলাভূমি শিক্ষা ও দীক্ষাপ্রদ গুরুর ন্যায় জ্ঞানী ও ভক্তের বিশেষ আদরের ও গৌরবের বস্তু। এই মেলার ইহাই বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বে ইহা অন্যান্য প্রদেশীয় মেলাকে অতিক্রম করিয়াছে। এই গুণে ইহা ভারতবর্ষের উদাসী সন্ন্যাসী—যাঁহারা এই জ্ঞানের জন্য—ঈশ্বরের জন্য প্রলোভনপূর্ণ সংসারের মায়ামোহ ছাড়াইয়া পর্য্যটন প্রসঙ্গে কালক্ষেপ করিতেছেন ভবিষ্যতে এই স্থান যে তাঁহাদেরই একটা আশ্রয় স্থান হইবে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাও আশা করি। এক্ষণে যাঁহার কৃপায় লোকস্থিতি অব্যাঘাতে চলিতেছে তিনি ইহার স্থায়িতা সম্পাদন করুন আমাদের এই প্রার্থনা।

প্রাতঃকালের উদ্বোধন।

শান্তিনিকেতনের মহোৎসবের পূতগন্ধ আবার দিক্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অদ্যকার স্নিগ্ধ প্রভাতে এই শান্ত তপোবনের পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে আমরাও এই উৎসরের যাহা সার সম্পত্তি তাহা সঞ্চয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। রাত্রির অবসানে মোহনিদ্রা পরিহার করিয়া এক্ষণে প্রভাতের সূর্য্যালোকে যাঁহার মঙ্গল সত্তা চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতেছি, যিনি এই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, যিনি পিতা, যিনি মাতা, যিনি গুরু জ্ঞানদাতা, যিনি প্রতি নিমেষে অজস্রধারে করুণাবারি বর্ষণ করিয়া আমাদিগকে প্রতিনিয়ত রক্ষণ ও পালন করিতেছেন, যিনি প্রত্যেকের আত্মাতে সমাসীন থাকিয়া তাঁহার অমৃতময় মঙ্গলময় পথে প্রত্যেককে আকর্ষণ করিতেছেন, যিনি প্রতি আত্মাকে এমন করিয়া তাঁহার প্রেমসুধা বিতরণ করিতেছেন, এমন করিয়া প্রতি আত্মার মোহান্ধকার দূরীভূত করিতেছেন, যে, জগতে সেই আত্মাটীই যেন তাঁহার একমাত্র যত্নের ধন, যিনি আত্মার রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু, যিনি ভিন্ন আত্মার প্রেমক্ষুধা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না, যিনি এখনও যেমন আছেন অনন্তকাল তেমনি থাকিবেন এই প্রশান্ত প্রাতঃকালে আমরা সম্বৎসর পরে সেই প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, অশেষ মঙ্গলময় দয়াময় প্রেমময় পরমেশ্বরের উপাসনা করিবার জন্য এখানে সকলে সমবেত হইয়াছি। তিনি আমাদের স্নেহময় পিতা, করুণাময়ী মাতা, এমন যে পিতা তাঁহার করুণা, এমন যে মাতা তাঁহার বাৎসল্যভাব হৃদয়ে অনুভব করিয়া, আইস আমরা অনন্যমনে শ্রদ্ধাভক্তিপ্রীতিযোগে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই। তিনি কৃপা করিয়া আমাদের পূজা গ্রহণ করুন।

সায়ংকালের উদ্বোধন।

আজ শান্তিনিকেতনের মঙ্গল মহোৎসবের পুণ্যগন্ধ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আজ "মধু বাতা ঋতায়তে" বায়ু মধুক্ষরণ করিতেছে, "মধুমৎপার্থিবং রজঃ" পৃথিবীর ধূলিকণা মধুময় হইয়া উঠিয়াছে;আজ অতীত যুগের বিশ্বপ্রেমিক পূজনীয় ঋষিগণ আমাদিগকে দিব্যকণ্ঠে বলিতেছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" উঠ, জাগো, মোহনিদ্রা পরিহার কর। পূজ্যপাদ বর্ত্তমান মহর্ষি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেছেন—"স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ" এই মধুরাহ্বান—এই শুভাশীর্ব্বচন কি নিষ্ফল হইবে? এই পুণ্য-

দিনের পুণ্য মহোৎসব কি মিথ্যা কোলাহলে—বাহ্য আড়ম্বরে আর তুচ্ছ বিলাসচর্চ্চায় আমরা ব্যর্থ করিয়া যাইব? এই বহুদূরপ্রসারিত প্রান্তরে—এই নির্ম্মল আকাশের পূর্ণচন্দ্রের বিমল কিরণের শুভ্র সুন্দর আলোকে—পূজনীয় সিদ্ধমহাপুরুষের সাধনপূত সিদ্ধাশ্রমে—এই সুরম্য পবিত্র মন্দিরে বসিয়া আমরা কি শুধু শ্রুতিধর বিহঙ্গের মত বেদবচন পাঠ ও শ্রবণ করিয়াই ক্ষান্ত হইব? যদি তাহাই হয়, তবে আমরা এই পুণ্য মহোৎসবের সম্পূর্ণ অযোগ্য!

অদ্য আমরা এই প্রান্তরের স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যে দিগন্তব্যাপ্ত আকাশে তাঁহার শান্ত মঙ্গলভাব প্রত্যক্ষ করিব। আজ উৎসবের আনন্দ-কোলাহলে সঙ্গীতে বাদ্যে মন্ত্রে যন্ত্রে তাঁহার আনন্দরূপ প্রত্যক্ষ করিব। আজ আমরা নির্ম্মল গগনের অমল ধবল চন্দ্রকিরণে ও তারকাপুঞ্জে তাঁহার অনন্ত মহিমা পরিস্ফুট দেখিব। ইহা পবিত্র সন্ধ্যাকাল, সূর্য্যকিরণের দুর্ভেদ্য যবনিকা এখন উত্তোলিত হইয়াছে, আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে অগণ্য গ্রহ তারকা লোকলোকান্তর এখন সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই পুণ্যদিনে এই উপযুক্ত সময়ে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তাঁহার অখণ্ড প্রভাব অনুভব করিয়া আমরা ধন্য হইব! সংসার এখানকার বহু দূরে; সংসারের কলুষিত চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া কামনার দুর্ম্মন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া পবিত্র হৃদয়ে একান্ত প্রাণে আসুন—আমরা সকলে অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মের মঙ্গলসত্তা যথার্থরূপে অনুভব করিয়া তাঁহার আনন্দরূপ বাহিরে ভিতরে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার উপাসনায় ধন্য হই।

সার সত্যের আলোচনা।

বিগত প্রবন্ধে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধসূত্রের পথ ধরিয়া চলিয়া—দুয়েরই উচ্চশিখরে সার্ব্বাত্মিক ঐক্যের কেন্দ্রস্থান রহিয়াছে, আর, সেই কেন্দ্রস্থান বা হিরণ্ময় কোষ পৃথিবীর মধ্যে কেবল মনুষ্যেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এই তত্ত্বটির দ্বারোপান্তে উপনীত হইয়া থামিয়া দাঁড়ানো হইয়াছিল; অতঃপর শাস্ত্র এবং যুক্তির মসাল ধরিয়া ঐ সাক্ষাৎলব্ধ তত্ত্বটির ভিতর-মহলের অন্ধিসন্ধিগুলা পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

পঞ্চকোষ।

বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কেমন যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মিল, তাহার সন্ধান পাইতে হইলে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড হইতেই যাত্রারম্ভ করা বিধেয়; কেন না, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড আমাদের হাতের কাছে। শাস্ত্রে লেখে (বিজ্ঞান-পুস্তকেও না লেখে, তাহা নহে, তবে কিনা প্রকারান্তরে) যে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চকোষের সমষ্টি। পঞ্চকোষ হ'চ্চে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় এই পাঁচটি কুটুরীর-ভিতর-কুটুরী। পঞ্চকোষের ল্যাজা-মুড়া বাদ দিয়া মাঝের তিনটি কোষ হ'চ্চে প্রাণময়, মনোময় এবং বিজ্ঞানময়। এই তিনটি কোষের পুঁটুলিবন্ধি'র নাম সূক্ষ্মশরীর। অবশিষ্ট রহিল অন্নময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ। এই দুইটি কোষ সূক্ষ্মশরীরের দুই মুড়ার অন্তঃপাতী। অন্নময় কোষের আর-এক নাম স্থূলশরীর; আনন্দময় কোষের আর-এক নাম কারণ-শরীর। নিম্নে দৃষ্টিপাত কর ঃ—

(১) অন্নময় কোষ ... (১) স্থূলশরীর

(২) প্রাণময় কোষ
(৩) মনোময় কোষ } (২) সূক্ষ্মশরীর
(৪) বিজ্ঞানময় কোষ
(৫) আনন্দময় কোষ ... (৩) কারণ-শরীর

স্থূলশরীরের শিকড়জাল।

যিনিই যাহা বলুন, আর, যিনিই যাহা লিখুন—স্নায়ুশব্দের অর্থ Nerve নহে; স্নায়ু-শব্দে বুঝায় আর-কিছু না—একপ্রকার অস্থিবন্ধনী রজ্জু (সুশ্রুত দেখ)। Sinew শব্দেও তাহাই বুঝায়। কলিকাতা যখন Calcutta হইতে পারিয়াছে, হৃৎ Heart হ-ইতে পারিয়াছে, নাসা Nose হইতে পারি-য়াছে, সংস্কৃতের স্নেহ যখন প্রাকৃতের সিনেহ হইতে পারিয়াছে, তখন স্নায়ু যে Sinew হ-ইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই—বরং তাহা না হওয়াই আশ্চর্য্য। এই গেল একটা কথা; আর-একটা কথা এই যে, নাড়ী এবং নালী'র মধ্যে "ডলয়োরভেদঃ"। দেশের মধ্যে যেমন নদী, নালা, খাল, পুষ্ক-রিণী, ডোবা, কূপ প্রভৃতি জলাশয় নানা-বিধ, দেহের মধ্যে তেমনি নাড়ী নানাবিধ। নিম্নে দেখ:—

Blood vessel রক্তবহা নাড়ী { ধমনী Artery
শিরা Vein }
Lymphatic vessel মেদোবহা নাড়ী
Lungs (ফুস্‌ফুস্) নাদবহা নাড়ী
Intestine মলবহা নাড়ী
ইত্যাদি।

তা যেন হইল—পরন্তু Nerve-এরও তো একটা প্রতিশব্দ চাই; তাহার উপায় কি করিলে? Sinew'র বাঙ্‌লা নাম বলিতেছ স্নায়ু; Nerve-এর বাঙ্‌লা নাম তবে কি? ডাক্তারি-বিদ্যা অতি অল্পই যাহা আমার জানা আছে, তাহা না জানারই মধ্যে; তবে কিনা "কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ"—জি-জ্ঞাসিত প্রশ্নের একটা সমুচিত মীমাংসা আশু প্রয়োজনীয়;—কাজেই তাহা আমা-কর্তৃক যতদূর সম্ভাবনীয়, তাহা একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যা'ক্:—

আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি আণব (Molecular) গতিক্রিয়াসকলের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ কি প্রকার, তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বিজ্ঞান তাহার উত্তর দ্যা'ন এই যে, সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা'র পরস্পরের প্রভেদ যেমন বায়বীয় কম্পনের প্রকারভেদ মাত্র, তেমনি আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি আণব (Molecular) গতিক্রিয়াসক-লের পরস্পরের প্রভেদ ঐথরীয় কম্পন-ক্রিয়ার প্রকারভেদ বই আর-কিছুই নহে। তবেই হইতেছে যে, আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আণব (Molecular) গতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন তালের নৃত্যলীলা। নৃত্য করে যে, সে কে? নৃত্য করে ঈথর! সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা'র সাধারণ নাম নাদ, তাহা কাহারো অবিদিত নাই; আ-লোক-উত্তাপাদি'র তেমনি-তরো কোনো-একটা সাধারণ নাম খুঁজিয়া বাহির করা চাই। আমি বলিতেছি তেজ। বিলাতি বীণাযন্ত্রের এক সপ্তকের মধ্যে যেমন সাত সুরের সাত দাঁত পংক্তি-সাজানো রহি-য়াছে—প্রজ্বলিত অগ্নির তেজের মধ্যে তেমনি আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ (এবং আর যদি কিছু থাকে, তাহাও) সারি-সারি পংক্তি-সাজানো রহিয়াছে—এটা খুব আ-শ্চর্য্য, কিন্তু সত্য! বিজ্ঞান তাহা চক্ষে দেখিয়াছে। ময়ূরপক্ষীর পাখা-বিস্তারের ন্যায় তেজ যখন ছটা বিস্তার করে, তখন তাহার মধ্যে আলোকাদি আণবী গতিক্রিয়া-দের কে মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে—কে পার্শ্বে লুকাইয়া আছে, সমস্তই বিজ্ঞানের মর্ম্মভেদী চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়ে। তবেই হইতেছে যে, তেজ বলিলে আলোক,

উত্তাপ এবং আর আর যতপ্রকার আণবী গতিক্রিয়া আছে, সবই একসঙ্গে বুঝাইয়া যায়। তেজ হ'চ্চে একপ্রকার নৃত্য; নর্ত্তক হ'চ্চেন ঈথর। তেজোরূপিণী শক্তিস্ফূর্ত্তির মধ্যে বস্তু যাহা, তাহা ঈথর। "তেজের আধারবস্তু" এই অর্থে ঈথরকে আমি বলিতেছি তৈজস পদার্থ। Nerve এর খোলসের ভিতরে একটা কোনো কিছু লুকাইয়া আছে, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে; কিন্তু কে যে সে লুকাইয়া আছে—তাহা যে বস্তুটা কি, তাহার সটীক * সমাচার বিজ্ঞানের লেখনী দিয়া এখনো বাহির হয় নাই; তাহা না হো'ক্—কিন্তু এটা স্থির যে, Nerve 'একপ্রকার সূক্ষ্ম নাড়ী বা নালী; আর সেই সূক্ষ্ম নালীপথের মধ্য দিয়া আলোকাদি আণব (Molecular) কম্পনক্রিয়াসকল যাতায়াত করে। খুব সম্ভব যে Nerveএর সূক্ষ্মনালীর অন্তরালে ঈথর বা ঈথর অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর আর-কোনো তৈজস পদার্থ ঘাটি মারিয়া লুকাইয়া আছে; আর সেই তৈজস প্রহরীই অভ্যাগত আলোকাদিকে শরীর-মন্দিরের তেতালা-মহলে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া চেতনার সহিত ছ্যাখাসাক্ষাৎ করাইয়া ছ্যায়। এই সকল বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া আপাতত এখনকার মতো Nerveএর আমি নাম দিলাম তৈজস-নাড়ী।

দেহতত্ত্ব-বিজ্ঞানে (Physiologyতে) দুই শ্রেণীর তৈজস-নাড়ীর উল্লেখ আছে। এক শ্রেণীর তৈজস-নাড়ী হ'চ্চে অগ্রমস্তিষ্কভবা মেরুপথগা † (cerebro-spinal) তৈজস-নাড়ী, আর-এক শ্রেণীর তৈজস-নাড়ী হ'চ্চে মর্ম্মভবা * (sympathetic) তৈজস-নাড়ী। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে "অগ্রমস্তিকভবা মেরুপথগা" জায়গা জুড়িয়া বসিলে, ছোটোখাটো কথাগুলির নড়ন চড়নের ব্যাপার বন্ধ হইয়া যাইবে, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। তাই তাহার অর্থের গুরুভার "চৈতস" এই ক্ষুদ্র বিশেষণটির স্কন্ধের উপর দিয়া জোশো করিয়া চালাইয়া দেওয়া শ্রেয় বোধ করিতেছি। এই যে দুই শ্রেণীর তৈজস-নাড়ী—চৈতস এবং মর্ম্মভবা,উভয়েই দুই দুই অবান্তর শ্রেণীতে বিভক্ত;—(১) Afferent কেন্দ্রমুখী, (২) Efferent বহির্ম্মুখী। কেন্দ্রমুখী তৈজস-নাড়ীর কার্য্য হ'চ্চে বার্ত্তাবহন, বহির্ম্মুখী তৈজস-নাড়ী'র কার্য্য হ'চ্চে আজ্ঞাবহন। বুদ্ধির সমীপে বার্ত্তাবহন করে চৈতস cerebro-spinal কেন্দ্রমুখী, প্রাণের সমীপে বার্ত্তাবহন করে মর্ম্মভবা sympathetic কেন্দ্রমুখী। তেমনি আবার, ইচ্ছার বা মনের আজ্ঞাবহন করে চৈতস বহির্ম্মুখী; প্রাণের আজ্ঞাবহন করে মর্ম্মভবা বহির্ম্মুখী। চৈতস কেন্দ্রমুখীরা বুদ্ধির সমীপে বার্ত্তাবহন করিয়া বুদ্ধিকে চেতিত করে অর্থাৎ চেয়ায়, তাই চৈতস কেন্দ্রমুখীর নাম দিতেছি চেতোবহা তৈজস-নাড়ী (Sensory)। চৈতস বহির্ম্মুখীরা ইচ্ছার বা মনের আজ্ঞাবহন করিয়া ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রে কার্য্যারম্ভ করে, তাই চৈতস বহির্ম্মুখীর নাম দিতেছি কর্ম্মবহা তৈজস-নাড়ী (Motor)। ইচ্ছাধীন (Voluntary) কর্ম্মকেই আমি এখানে কর্ম্ম বলিতেছি, এটা যেন মনে থাকে। পক্ষান্তরে, মর্ম্মভবা sympathetic কেন্দ্রমুখীরা প্রাণের সমীপে বার্ত্তাবহন করিবার মধ্যে করে শুধু দ্বারে আঘাত; কিন্তু সে আঘাতে জ্ঞানের ঘুম ভাঙে না,

* অনেকে লেখেন সঠিক্। সঠিক্-শব্দের অর্থ বুঝা ভার। সটীক-শব্দে বুঝায়—টীকাসহকৃত অর্থাৎ ঝর্‌ঝরে পরিষ্কার।

† অর্থাৎ মেরুদণ্ডাশ্রিতা।

* অর্থাৎ শরীরের বিশেষ বিশেষ মর্ম্মস্থান হইতে প্রসূত।

যেহেতু মনোবুদ্ধির ন্যায় প্রাণ চেতনাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি নহে। এইজন্য মর্ম্মভবা sympathetic কেন্দ্রমুখী তৈজস-নাড়ীকে আমি চেতোবহা না বলিয়া বলিতে চাই ঘাতবহা। ঘাত-শব্দের অর্থ এখানে প্রাণে আঘাত; তবে কিনা অব্যক্ত রকমের আঘাত —বেদনার সহিত তাহার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নাই। আহার্য্য দ্রব্যের সংস্পর্শমাত্রে জিহ্বার তারে অর্থাৎ প্রাণতন্ত্রীতে এক-প্রকার সূক্ষ্মরকমের আঘাত পড়ে, আর তাহারই প্রতিঘাতে বা তাড়সে জিহ্বাতে রসের উদ্রেক হয়। আঘাত সংক্রামণ করে মর্ম্মভবা কেন্দ্রমুখী, প্রতিঘাত বহন করে মর্ম্মভবা বহির্ম্মুখী। প্রাণ-মহলের এই যে আঘাত-প্রতিঘাত, তাহার বিশেষত্ব এই যে, সে আঘাত বেদনাত্মক নহে, অথচ এক-রকমের বেদনাত্মক; সে প্রতিঘাত ইচ্ছা-ধীন নহে, অথচ এক-রকমের ইচ্ছাধীন। পূর্ব্বেকার এক প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে—যে, প্রাণ মন এবং বুদ্ধির পরস্পরের সহিত পরস্পরের তলে-তলে একাত্মভাব রহিয়াছে, আর, সেই-গতিকে পরস্পরের গাত্রে পরস্পরের ছায়া সংক্রমিত হয়। প্রাণেতে বুদ্ধির ছায়া পড়াতে ফল হয় এই যে, মর্ম্মভবা কেন্দ্রমুখীর পথ দিয়া প্রাণেতে আঘাত যাহা পৌঁছে—তাহা চেতনাত্মক না হইলেও চেতনা'র ভান বা নাট্যাভিনয় করিতে ছাড়ে না। তেমনি আবার, প্রাণেতে মনের ছায়া পড়াতে তাহার ফল হয় এই যে, মর্ম্মভবা বহির্ম্মুখীর পথ দিয়া প্রতিঘাত যাহা বাহির হয়, তাহা ইচ্ছাধীন না হইলেও ইচ্ছার ভান করিতে ছাড়ে না। প্রাণতন্ত্রীতে আঘাত পড়িলে বহির্ম্মুখীর পথ দিয়া প্রতিঘাত যাহা বাহির হয়, তাহাকে কর্ম্ম বলিতে পারা যায় না এইজন্য—যেহেতু তাহা স্পষ্ট রকমের ইচ্ছাধীন নহে। তাই মর্ম্মভবা (sympathetic) বহির্ম্মুখী তৈজস-নাড়ীকে আমি কর্ম্মবহা না বলিয়া বলিতে চাই প্রতিঘাতবহা। এখানে বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এই যে, মর্ম্মভবা শ্রেণীর ঘাতপ্রতিঘাতবহা নাড়ী যুগল মাণিকজোড়ের ন্যায় এরূপ একা-ধারে ঘাঁ্যাসাঘেঁসি করিয়া অবস্থিতি করে যে, কেন্দ্রমুখীর পথ দিয়া আঘাত সংক্রামিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ বহির্ম্মুখীর পথ দিয়া তাহার প্রতিঘাত বাহির হয়—প্রতিঘাত বাহির হইতে একমুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না। ফলে, প্রাণমহলের ঘাতপ্রতিঘাত একই ক্রিয়াচক্রের দুই অর্দ্ধাঙ্গ। নিশ্বাসের আ-কর্ষণ এবং প্রশ্বাসের বিসর্জ্জন, এ দুই ক্রিয়াকে আমরা যেমন একসঙ্গে জড়াইয়া মোটের উপর বলি শ্বাসক্রিয়া, তেমনি মর্ম্মভবা তৈজস-নাড়ী-মহলের কেন্দ্রমুখীদের ঘাতবাহিতা এবং বহির্ম্মুখীদের প্রতিঘাত-বাহিতা, এ দুই ব্যাপারকে একসঙ্গে জড়া-ইয়া মোটের উপর বলা যাইতে পারে মর্ম্মবাহিতা। বলিবও আমি তাই। "মর্ম্ম-ভবা তৈজস-নাড়ী ঘাতপ্রতিঘাতবহা," এই অর্থে মর্ম্মভবা তৈজস-নাড়ীকে বলিব মর্ম্মবহা নাড়ী। এতক্ষণ ধরিয়া যাহা বলা হইল, তাহাতে তৈজস-নাড়ীর নিম্নলিখিত শ্রেণী-বিভাগের সৌসঙ্গত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে ভরসা করি পাঠকবর্গের বিশেষ কোনো বাধা ঠেকিবে না—

তৈজস-নাড়ী Nerve {
চেতোবহা (Sensory)
কর্ম্মবহা (ইচ্ছাধীন Motor)
মর্ম্মবহা (Sympathetic)
}

সূক্ষ্মশরীরের।

স্থূলশরীরের সহিত সূক্ষ্মশরীরের মিল রহিয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য; কেন না তাহা থাকিবারই কথা। "মিল আছে" জানিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না; মিল কোন্‌খানে কিরূপ, তাহা খুঁজিয়া-পাতিয়া

বাহির করা চাই। আমরা দেখিতেছি মিল আপাদ-মস্তক খাপেখাপে। এইমাত্র আমরা দেখিলাম যে, স্থূলশরীরের মূলপ্রদেশে শিকড় ফাঁদিয়া রহিয়াছে (১) চেতোবহা, (২) কর্ম্মবহা, (৩) মর্ম্মবহা, এই তিন শ্রেণীর তৈজস-নাড়ী। ঐ তিন শ্রেণীর নাড়ীর মধ্য দিয়া তিনপ্রকার শক্তি স্ব স্ব গন্তব্যপথে চলা ফেরা করে; চেতোবহা'র মধ্য দিয়া যাতায়াত করে ধীশক্তি, কর্ম্মবহা'র মধ্য দিয়া ইচ্ছাশক্তি, মর্ম্মবহা'র মধ্য দিয়া জীবনী শক্তি। ঐ তিনপ্রকার শক্তির কর্ম্মস্থান হ'চ্চে দশেন্দ্রিয়; নিলয় হ'চ্চে বুদ্ধি, মন, প্রাণ। দশেন্দ্রিয় বলিতে দশেন্দ্রিয়ের স্থূল আবরণ বুঝিলে চলিবে না—দৃশ্যমান চক্ষুকর্ণাদি বুঝিলে চলিবে না। এটা দেখা চাই যে, দর্শনশ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গণ জাগ্রৎকালেও যেমন, স্বপ্নকালেও তেমনি, দুই কালেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হয়; আর সেই সঙ্গে এটাও দেখা চাই যে, চক্ষুঃশ্রোত্রাদির বহির্দ্বার জাগ্রৎকালেই খোলা থাকে; স্বপ্নকালে বন্ধ থাকে। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, চক্ষুঃশ্রোত্রাদির বহির্দ্বার খোলা থাক্ বা না থাক্—এটা স্বীকার করিতেই হইবে যে, উভয় অবস্থাতেই শ্রবণকার্য্য শ্রবণেন্দ্রিয়েরই কার্য্য, দর্শনকার্য্য দর্শনেন্দ্রিয়েরই কার্য্য। ফল কথা এই যে, চক্ষুঃশ্রোত্রাদি কেবল দর্শনশ্রবণাদির স্থূল আবরণ, তা বই তাহারা সাক্ষাৎ দর্শনশ্রবণাদি নহে। দর্শনশ্রবণাদি হ'চ্চে তলোয়ার, চক্ষুঃশ্রোত্রাদি হ'চ্চে খাপ। ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই (শাস্ত্রেও লেখে তাই) যে, দশেন্দ্রিয় সূক্ষ্মশরীরেরই অঙ্গ—তবে কিনা বহিরঙ্গ; অন্তরঙ্গ হ'চ্চে প্রাণ, মন, বুদ্ধি; আর, দুয়ের মধ্যবর্ত্তী বন্ধনরজ্জু হ'চ্চে জীবনী শক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং ধীশক্তি। সূক্ষ্মশরীরের বহিরঙ্গের এ-মুড়া হইতে অন্তরঙ্গের ও-মুড়া পর্য্যন্ত জ্ঞানপরিস্ফুটনের কেমন যে সুচারু সোপানব্যবস্থা, তাহার একটা নমুনা দেখাই; তাহা হইলেই সূক্ষ্মশরীরের কলকারখানার কার্য্যনির্ব্বাহপদ্ধতির কতকটা সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিবে।

দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য হ'চ্চে দ্যাখা। কিন্তু মনুষ্যের দ্যাখা একরকমের দ্যাখা; অপরাপর জন্তুদিগের দ্যাখা আরেক রকমের দ্যাখা; দুই রকমের এই দুই দ্যাখার মধ্যে প্রভেদ রহিয়াছে খুবই স্পষ্ট। বহুরূপিনামক জন্তুরা অষ্টপ্রহর অমনস্কভাবে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া চাহিয়া থাকে, কিন্তু দ্যাখে যে কি, তাহা তাহারাই জানে। নিদ্রিত ব্যক্তির নেত্র দৈবক্রমে অর্দ্ধোন্মীলিত হইলে তাহা যেমন পলকশূন্য অচল-ভাবে চাহিয়া থাকে মাত্র—বহুরূপীদের পলকশূন্য চক্ষের দ্যাখা অনেকটা সেই রকমের দ্যাখা। বহুরূপী জন্তুর চক্ষের চাহনি'র ভাব দেখিলে এটা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাহার নিকটে সম্মুখস্থিত দৃশ্যের কোনো খবরই নাই। শিকারান্বেষী ব্যাঘ্রের দ্যাখা আবার আর-একরকম। শিকারান্বেষী ব্যাঘ্র যখন সম্মুখস্থিত মৃগের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন তাহার দ্যাখা লোভে এবং ক্রোধে দিগ্বিদিক্‌শূন্য হইয়া উঠে। ব্যাঘ্রী আবার যখন শাবকের গাত্রলেহন করে, তখন তাহার দ্যাখা স্নেহমমতায় গলিয়া পড়িতে থাকে। ও তিনরকমের দ্যাখা'র কোনোটারই সঙ্গে মনুষ্যের দ্যাখার মিল খায় না। মনুষ্যের দ্যাখা প্রবুদ্ধরকমের দ্যাখা—সে দ্যাখা'র উপরে মূঢ়তা মত্ততা এবং বিক্ষেপের অধিকার কম, বুদ্ধির অধিকার বেশী। সে দ্যাখা'র কর্ম্মক্ষেত্রে প্রাণমনকে নীচে দাবিয়া-রাখিয়া বুদ্ধি আপনার উচ্চ পদবীতে ভর দিয়া দাঁড়ায়। মনে কর, রাত্রি আগতপ্রায়—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—এমন সময়ে দেবদত্তনামক জনৈক

পথিক মাঠের মাঝখান দিয়া চলিতে চলিতে অনতিদূরে নিবিড় বট-অশ্বত্থের আড়ালে চাহিয়া দেখিল—প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই প্রদীপের রশ্মিচ্ছটা দেবদত্তের চক্ষুর ভিতরে তৈজসী কম্পনক্রিয়া উৎপাদন করিল। তৈজসী কম্পনক্রিয়া চলিতে লাগিল প্রাণে। প্রাণের তৈজসকম্পনে মনের দ্বারে ঘনঘন আঘাত পড়িতে লাগিল। প্রাণের ডাক শুনিয়া মন দৌড়িয়া আসিল। প্রাণের তৈজসকম্পনে মনের সংযোগ হইবামাত্র প্রাণমনের সম্মিলনক্ষেত্রে আলোকদর্শনরূপিণী চেতনা (sensation) উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রেলগাড়ির প্রহরী যেমন নিশান ঘুরাইয়া বাষ্পযন্ত্রীকে (এঞ্জিন-চালককে) গাড়ী চালাইতে সঙ্কেত করে, চেতনা'র উদ্ভাসন তেমনিতরো একপ্রকার নিশান-ঘুরানো। তদ্দৃষ্টে বুদ্ধির এইরূপ জ্ঞান হয় যে, দৃশ্যমান অবভাসের (phenomenonএর) মধ্যে বস্তু একটা-কিছু আছে। "একটা কিছু আছে" এটা হ'চ্চে সামান্য জ্ঞান। "সে বস্তু না জানি কি ?" এইটি হ'চ্চে বিশেষের জিজ্ঞাসা। "দেখি রোসো ভাবিয়া;—মাঠের চরমসীমায় গাছপালায় ঘেরা গ্রাম থাকিবারই কথা; গ্রামের প্রান্তভাগে চাসাদের বাসস্থান অবশ্যই আছে।" ইহার নাম ভাবনা। "বুঝিয়াছি—কোনো চাসা'র কুটীরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহারই আলো গাছপালার ফাঁকের মধ্য দিয়া ছট্‌কিয়া বাহির হইতেছে।" ইহার নাম বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান। চেতনার সঙ্কেত শিরোধার্য্য করিয়া বুদ্ধি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াতে হইল যাহা, তাহা এই ঃ—

(১) বুদ্ধির মূলে দেখা দিল—"বস্তু একটা আছে" এই সামান্য জ্ঞান।

(২) ফলে দেখা দিল—"চাসার কুটীরে প্রদীপ জ্বলিতেছে" এই বিশেষ জ্ঞান।

(৩) দুই মুড়া'র মাঝখানে দেখা দিল—ভাবনা-ক্রিয়া বা ধীশক্তির পরিচালনা। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, "একটা কোনো বস্তু আছে" এইপ্রকার সামান্যজ্ঞানের দ্বার দিয়া আমরা আত্মসত্তা উপলব্ধি করি এবং "ঐ খানটিতে প্রদীপ জ্বলিতেছে"এইপ্রকার বিশেষ জ্ঞানের দ্বার দিয়া আমরা বস্তুসত্তা উপলব্ধি করি। শেষের এই কথাটির আদ্যোপান্ত রীতিমত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। এইজন্য উহার পর্য্যালোচনাকার্য্য আগামিবারের জন্য হাতে রাখিয়া দেওয়া হইল।

মহম্মদ।

৪র্থ প্রস্তাব।

উমারকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দেখিয়া কোরেসাইতগণ এতই কোপান্বিত হইয়া উঠিল, যে আবুতালেব স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদের জীবনের জন্য ভীত হইয়া নগরের সান্নিধ্যে তাঁহারই এক সুরক্ষিত দুর্গে মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যবর্গের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ইহাতে আবুতালেব ও তাঁহার দলস্থদিগের সহিত কোরেসাইতগণের বিচ্ছেদ ঘটিল। পরস্পরের মধ্যে বিবাহ আদান প্রদান এমন কি ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। মহম্মদ দুর্গে থাকিয়া কোরেসাইতগণের সাময়িক আক্রমণ সহ্য করিতে লাগিলেন, এমন কি তাঁহার খাদ্য সামগ্রীরও দারুণ অভাব ঘটিয়া উঠিল।

ক্রমে সেই পবিত্র মাস আসিয়া উপস্থিত। বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক সর্ব্ববিধ শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া প্রতিবৎসর এই সময়ে কাবা দর্শনার্থে মকায় সমবেত হইত। মহম্মদ

আপনাকে নিরাপদ জানিয়া এই অবসরে দুর্গ হইতে সশিষ্যে বহির্গত হইলেন ও আপনার ধর্ম্মমত সর্ব্ব সমক্ষে নির্ভয়ে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। মহম্মদের সে উদ্যম নিষ্ফল হইল না; অনেকে সে ধর্ম্ম গ্রহণ করিল ও সেই ধর্ম্মবীজ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। হালিব নামা জনৈক অধিপতি তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য এই সময়ে বিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি তাঁহার জন্মান্ধ ও মূক কন্যা সাতিহার কল্যাণকামনায় এই সময়ে মকায় আসিয়াছিলেন। মহম্মদ দৈববলে সাতিহারকে আরোগ্য দান করায় হালিব এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন এবং আরও ৪৭০ জন লোক মহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

মহম্মদ ঐ দুর্গে আবার ফিরিলেন। তাঁহাকে ঐস্থানে তিন বৎসর কাটাইতে হইল। লোকের নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও মহম্মদের শিষ্যবর্গ অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মহম্মদ পরে মকায় আসিলেন। ক্রমে আবুতালেবের আসন্নকাল উপস্থিত হইল। অশীতিবর্ষ বয়সে আবুতালেব দেহ ত্যাগ করিলেন। আবুতালেবের মৃত্যুর তিন দিবস পরে মহম্মদের প্রাণপ্রিয়া সহধর্ম্মিণী সকল অবস্থার সঙ্গিনী ও বিপদের সময় একমাত্র উৎসাহদাত্রী খাদিজা ৬৫ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিল। যতদিন খাদিজা জীবিত ছিল, মহম্মদ আর দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই; কিন্তু খাদিজার মৃত্যুর পরে অনেকগুলি বিবাহ করিলেন; অপরের জন্য চারিটি ধর্ম্ম্য বিবাহের ব্যবস্থা থাকিলেও বলিতেন আমি নিজে এই নিয়মের বাধ্য নহি।

খাদিজার মৃত্যুর পরে প্রথম বিবাহ আবুবেকারের সুন্দরী বালিকা কন্যা আয়েসার সহিত ঘটে। বীর ও সম্রান্ত আবুবেকারের আশ্রয়লাভ মহম্মদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মহম্মদ তথাপি আবুতালেবের অভাব বিশেষ রূপ অনুভব করিতে লাগিলেন; উপায়ান্তর না দেখিয়া মকা হইতে ৭০ মাইল দূরে তাএফ নামক প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু এই তাএফ নগরে ঈশ্বরদুহিতা এল্‌লাত নামক অলঙ্কারবিভূষিতা এক প্রস্তরমূর্ত্তির পূজা হইত। মহম্মদ এখানে একমাস থাকিয়া প্রচারের চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তাঁহার স্বর লোককোলাহলে ডুবিয়া যাইল; লোকে তাঁহার উপরে প্রস্তর বর্ষণ করিল; তিনি ক্ষতবিক্ষত হইয়া এস্থান হইতে বিদায় লইলেন। মকা অভিমুখে যাইতেছেন, সান্ধ্য উপাসনার সময় উপস্থিত। মহম্মদ কোরাণ আবৃত্তি করিতেছেন। প্রেতাত্মা সকল উপরে থাকিয়া তাহা শুনিল। মহম্মদ শুনিলেন, তাহারা অন্তরীক্ষ হইতে যেন বলিতেছে আহা কি শুনিলাম, সুপথে যাইবার বাণী, আমরা কোরাণের বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। মহম্মদ বুঝিলেন কোরাণ যে কেবল মনুষ্যদিগের জন্য তাহা নহে, উহা প্রেতলোকের পক্ষেও; এবং ইহাও বুঝিলেন যে তিনি নিজে উভয় লোকের দীক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছেন।

মহম্মদের জনৈক শিষ্য মকাতেই মহম্মদের জন্য স্থাননির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল; মহম্মদ সেই খানেই রহিলেন। এই সময়ে মহম্মদের সপ্ত স্বর্গ পরিভ্রমণের উল্লেখ আছে। কোরাণে উহার যথাযথ বর্ণনা না থাকিলেও এতৎসম্বন্ধে জনশ্রুতি বড়ই প্রবল; প্রকৃত পক্ষে উহা বড়ই সরস। কথিত আছে, অন্ধকারময়ী রাত্রি, চারিদিক নিস্তব্ধ, পশুপক্ষীর কলরব আদৌ শ্রুত হয় না, কল্লোলিনীর গতি মন্থর, কুলুকুলু ধ্বনি উপশান্ত। মহম্মদ নিদ্রা

গাইতেছেন। মধ্য রাত্রিতে গেব্রিয়াল মহম্মদের সম্মুখীন হইয়া বলিতেছেন, জাগ্রত হও। গেব্রিয়ালের ললাটদেশ স্থির ও গম্ভীর, মূর্ত্তি তুষারধবল, শুভ্র কেশ পৃষ্ঠের উপর ঝুলিতেছে, পক্ষদ্বয় বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বসন স্বর্ণ ও মুক্তাখচিত। গেব্রিয়াল মহম্মদের জন্য একটি আশ্চর্য্য ঘোটকী আনিয়াছেন; উহার মুখ মনুষ্যের ন্যায়, চক্ষুর্দ্বয় হইতে মরকতের প্রভা নিক্রান্ত হইতেছে, গতি অতি প্রবল, নাম আল বোরাক অর্থাৎ বিদ্যুল্লতা। ঘোটকী পক্ষসমন্বিতা ও বাক্‌শক্তিসম্পন্না। মহম্মদ গেব্রিয়ালের আদেশে উহার পৃষ্ঠে উঠিলেন। ঘোটকী আকাশে উঠিল, ক্রমে সিনাই পর্ব্বতে উপস্থিত। গেব্রিয়াল বলিলেন, অবতরণ কর ও প্রার্থনা কর; ইহা সেই পবিত্র স্থান যেখানে ঈশ্বর মুসার সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। মহম্মদ তাহাই করিলেন। আবার ঘোটকীতে উঠিলেন, অচিরে বেথলহামে আসিয়া উপস্থিত। গেব্রিয়ালের আদেশে মহম্মদ নামিলেন এবং ঈষার এই পুণ্য জন্মস্থানে আবার প্রার্থনা করিলেন। ঘোটকীতে উঠিয়া আবার চলিলেন। অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতেছেন, কে যেন বলিল মহম্মদ এখানে একটু বিশ্রাম কর, আমি তোমারই অনুরাগী। অশ্ব থামিল না। বামে আবার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল, কে যেন বলিতেছে, মহম্মদ একটু অপেক্ষা কর। অশ্ব থামিল না। সম্মুখে দেখিলেন পৃথিবীর সৌন্দর্য্যে শোভমানা অদ্ভুতলাবণ্যবতী কুমারী, তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিতেছে ও তাঁহার প্রতি স্বীয় অনুরাগ প্রকাশ করিতেছে। অশ্ব তথাপি থামিল না। মহম্মদ গেব্রিয়ালকে বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কে? গেব্রিয়াল বলিলেন প্রথম বাণী জনৈক য়িহুদির; তুমি যদি তাহার কথা শুনিতে, সে তোমাকে য়িহুদি ধর্ম্মে আকর্ষণ করিত। দ্বিতীয় বাণী জনৈক খ্রীষ্টিয়ানের; যদি তুমি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতে সে তোমাকে খ্রীষ্টধর্ম্মের দিকে লইয়া যাইত। তৃতীয় স্ত্রীমূর্ত্তি অর্থ-প্রলোভন ও অহঙ্কারসঙ্কুল পৃথিবী; যদি তুমি তাঁহার কথায় ভুলিতে, তাহা হইলে তোমার জাতি অনন্ত অপার স্বর্গীয় সুখ পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর ক্ষণভঙ্গুর সুখের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া আপনাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিত। অশ্ব ত্বরিতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, এক্ষণে তাঁহারা জেরুজেলামের পবিত্র মন্দিরদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ঘোটকী হইতে অবতরণ করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে দেখিলেন আব্রাহাম মুষা ঈশা ও অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবক্তা সেখানে বিরাজমান। মহম্মদ তাঁহাদের সহিত সমস্বরে ঈশ্বরের স্তুতিবন্দনা করিয়া দেখিলেন স্বর্গ হইতে আলোকময় সোপানাবলী আলম্বিত হইয়াছে। গেব্রিয়ালের সাহায্যে ত্বরিতবেগে মহম্মদ উহাতে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

প্রথম স্বর্গে পৌছিয়া গেব্রিয়াল স্বর্গদ্বারে আঘাত করিলেন। ভিতর হইতে প্রশ্ন আসিল, তুমি কে? আমি গেব্রিয়াল। সঙ্গে কাহাকে আনিয়াছ? মহম্মদ, যিনি ধর্ম্মপ্রচারের জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন। উত্তর আসিল আচ্ছা, ভিতরে আইস। এই প্রথম স্বর্গ রৌপ্যময়, মস্তকের উপরে সুবর্ণরজ্জুতে তারকামালা ঝুলিতেছে। প্রত্যেক তারকায় এক একজন দেবদূত প্রহরীরূপে বিরাজ করিতেছে, দেখিতেছে পাছে অপবিত্র মানব পবিত্র স্বর্গলোকে প্রবেশ করে। এক বয়োবৃদ্ধ লোক সম্মুখে আসিল, গেব্রিয়াল মহম্মদকে বলিলেন ইহাঁকে প্রণাম কর, ইনি আদম। আদম মহম্

স্মরকে আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন তুমি আমার সন্তানসন্ততির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তুমিই প্রধান ধর্ম্মপ্রবক্তা। ক্রমে তাঁহারা দ্বিতীয় স্বর্গে উঠিলেন। গেব্রিয়াল আঘাত করিলে দ্বার উন্মুক্ত হইল। তাঁহারা উভয়ে প্রবেশ করিলেন। চারিদিক চাকচিক্যময় বিশুদ্ধ লৌহখচিত। নোয়ার সাক্ষাৎকার মিলিল। তিনি মহম্মদকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তৃতীয় স্বর্গে উঠিলেন। চারিদিকে জ্বলন্তমণিমাণিক্যের আভা। মনুষ্যের সাধ্য নাই যে তাহার উপর দৃষ্টিস্থির রাখিতে পারে। এখানে এক সুদীর্ঘ পুরুষ বিরাজমান, লক্ষ সৈন্য তাঁহার অধীন। প্রকাণ্ড পুস্তক সম্মুখে প্রসারিত, তিনি উহাতে লিখিতেছেন ও মুছিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন যে তিনি মৃত্যুর অধিপতি। যাহারা জন্মিবে, তাহাদের নাম লিখিতেছেন, যাহারা মরিবে, তাহাদের নাম মুছিয়া দিতেছেন। এক্ষণে মহম্মদ ও গেব্রিয়াল চতুর্থ স্বর্গে, উহা শুভ্র রৌপ্যমণ্ডিত। সমুন্নত এক দেবদূত সেখানে বিরাজমান। অবিরলধারায় নেত্রযুগল হইতে অশ্রু বিগলিত হইতেছে; মনুষ্যের পাপরাশি দেখিয়া কেবলই ক্রন্দন করিতেছেন এবং মানবের অনাগত অমঙ্গল পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন। পঞ্চম স্বর্গ সুবর্ণময়। এখানে এরনের সাক্ষাতকার মিলিল। এরন অগ্নির অধিপতি; ভীমমূর্ত্তিতে বিরাজমান; চক্ষু হইতে বিদ্যুতের তেজ বিনির্গত হইতেছে; হস্তে জ্বলন্ত ভল্ল; অগ্নির মধ্যে তিনি বিরাজমান। এরন সহচরগণের সহিত পাপী ও অবিশ্বাসী মানবের উপর ঈশ্বরের কঠোর দণ্ড অবিশ্রাম পরিচালন করিতেছেন। তাঁহারা ষষ্ঠ স্বর্গে উঠিলেন। উহা স্বচ্ছ প্রস্তর বিনির্ম্মিত। এখানে একজন দেবদূত বর্ত্তমান, অর্দ্ধাঙ্গে অগ্নি অপরাংশে চির হিমানী; বরফের শৈত্যে অগ্নি নির্ব্বাণ হইতেছে না বা অগ্নির উত্তাপে হিমানী দ্রবীভূত হইতেছে না। চারিদিকে অন্যান্য দেবদূতেরা বন্দনা করিতেছে, বলিতেছে প্রভু! তুমি তুষার ও বহ্নিকে একত্রে রাখিয়াছ, আমাদিগকে তোমার বিধানের সহিত ঐরূপ একত্র যুক্ত কর। মহম্মদ জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন ইনি স্বর্গমর্ত্ত্যের প্রহরী। ইনিই শুভবুদ্ধি দিবার জন্য মানবের নিকট দেবদূত প্রেরণ করেন ও ঈশ্বরের দিকে সকলকে আকর্ষণ করেন। যতদিন পুনরুত্থান না ঘটিবে ততদিন উহাঁর কর্ম্মের অবসান নাই। এইখানেই মুসার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিল। তিনি মহম্মদকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন আমি ইসরাইলবংশীয়গণের জন্য যত না করিতে পারিয়াছি, তদপেক্ষা তুমি বহুল পরিমাণে তোমার জাতীয়গণকে স্বর্গে আনিতে পারিবে বুঝিতেছি।

সপ্তম স্বর্গে উঠিয়া এব্রাহামের সাক্ষাৎকার মিলিল। এই সুখদ স্থান দিব্যালোকে ভাস্বর; এতই মহিমাময় যে মনুষ্যের বাণী তাহা বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারে না। স্বর্গের এক এক অধিবাসীর সপ্ততিসহস্র হস্ত, সপ্ততিসহস্র মুখ; প্রত্যেক আস্যে সপ্ততিসহস্র জিহ্বা। প্রত্যেক জিহ্বায় সপ্ততি সহস্র ভাষা; অসংখ্য জিহ্বায় অসংখ্য ভাষায় তাহারা কেবলই ঈশ্বরের স্তুতিগান করিতেছে। ঈশ্বরের অদৃশ্য সিংহাসনের দক্ষিণ দিকে দিগন্তপ্রসারিত পদ্মপত্রের ছায়ায় বালুসম অসংখ্য দেবদূত বিশ্রাম করিতেছে। অসংখ্য পক্ষী অসংখ্য কণ্ঠে কোরাণের পবিত্র শ্লোক গান করিতেছে। দুগ্ধ ও মধু হইতে সুমিষ্টতর ফল ফলিয়া রহিয়াছে। এক একটী ফলে বিশ্বের অসংখ্য প্রাণীর ক্ষুধাতৃষ্ণা শান্তি হইতে পারে।

একএকটী অপ্সরা প্রতি ফলের শস্যের ভিতরে প্রকৃত বিশ্বাসীর হর্ষোৎপাদনের জন্য নিহিত রহিয়াছে। পদ্মলতার মূল হইতে চারিটি নদী বিগলিত; দুইটি স্বর্গের ভিতর দেশ দিয়া প্রবাহিত, দুইটি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, নাম নাইল্ ও ইউফ্রেটিস্।

মহম্মদ আরও ভিতরে চলিলেন; সম্মুখে ভজনমন্দির, চারিদিক রক্তাভ মাণিক্যখচিত, অসংখ্য অনির্ব্বাণ দীপশিখায় আলোকিত; গঠন কাবার অনুরূপ; সপ্ততিসহস্র উচ্চশ্রেণার দেবদূতেরা প্রত্যহ ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পায়। মহম্মদ তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া সাতবার প্রদক্ষিণ করিলেন। গেব্রিয়াল আর যাইতে পারিলেন না; মহম্মদ দ্রুতগতিতে আরও অগ্রসর হইলেন। আলোক ও অন্ধকার ভেদ করিয়া ভগবানের অনতিদূরে সম্মুখীন। বিংশতিসহস্র আবরণে ঈশ্বরের মুখ আবৃত। কাহার সাধ্য তাঁহার অনাবৃত মুখের দীপ্তি সহ্য করিতে পারে। তিনি একহস্তে মহম্মদের স্কন্ধদেশ ও অন্য হস্তে বক্ষোদেশ স্পর্শ করিলেন। সেই শৈত্যস্পর্শে মহম্মদের অন্তর্দেশ শীতল হইল। মহম্মদ দিব্য আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। চারিদিক সুগন্ধে আমোদিত হইল, সে সুখ সে সুগন্ধ অন্যে কে বুঝিবে। মহম্মদ ঈশ্বরের নিকট হইতে কোরাণের অনেক আদেশ পাইলেন। তাঁহারই আজ্ঞায় পঞ্চাশ বার দৈনিক প্রার্থনা প্রকৃত সাধকের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল।

মহম্মদ ঈশ্বরের নিকট হইতে বিদায় পাইলেন বটে, কিন্তু মুষা বলিলেন ৫০ বার প্রার্থনা মানবের পক্ষে অসাধ্য। তাই তিনি পুনরায় ঈশ্বরের নিকট যাইয়া অনুনয় বিনয়ে প্রার্থনাসংখ্যা পাঁচবার নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলেন। মহম্মদ মর্ত্তের দিকে অবতরণ করিতে লাগিলেন; আসিয়া দেখেন অশ্ব বিদ্যুল্লতা বাহিরে। তিনি তাহাতে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

পঁচাত্তর বৎসর হইল ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু এই দীর্ঘকালে ইহা দ্বারা দেশের কি কাজ হইল এই মাঘোৎসবের সময় সংক্ষেপে তাহা একটা বলিবার কথা। ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যই ব্রাহ্মসমাজ। কিন্তু দেখিতে পাই, প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্মসমাজ এদেশের শাস্ত্রমধ্যে আবদ্ধ পুরাণ ঋষিদিগের ব্রহ্মজ্ঞান বহুকাল পরে লোকচক্ষুর সমক্ষে উদঘাটিত করে। তখন অজ্ঞান ও কুসংস্কার দেশমধ্যে অবাধে রাজত্ব করিত এবং শিক্ষিতেরা মূর্ত্তিপূজায় মুক্তির আস্থা না রাখিতে পারিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিত। সেই সময় হিন্দুশাস্ত্রের এই একেশ্বরবাদ অনেকের পরধর্ম্ম গ্রহণ নিবারণ করে। ঐ সময় ব্রাহ্মসমাজে বেদপাঠ উপদেশ ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইত। সঙ্গীত গুলি প্রকৃত বৈরাগ্যের উদ্দীপক। তন্মধ্যে এমন কতকগুলি গীত আছে যাহা কেবল ধনীদিগকে লক্ষ্য করিয়াই রচিত। ফলত রামমোহন রায় বুঝিয়াছিলেন দেশের সর্ব্ববিধ সংস্কার করিতে গেলে অগ্রে ধনীসম্প্রদায়কে সংগ্রহ করা মুখ্য কাজ। কারণ সংস্কারের অনেক কার্য্য অর্থ ও সামর্থ্যসাধ্য। ইহাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তদীয় কীর্ত্তি একবারে লোপ পাইবার সম্ভাবনা হয়। এই সময় এদেশের ধনবানদিগকে সংগ্রহ করিবার তাঁহার যে গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল তাহা সম্পূর্ণ ফলবৎ হয়। এই সম্প্রদায় হইতেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার নির্ব্বাণপ্রায় কার্য্যের গুরুভার বিপুল উদ্যম ও উৎসা-

হের সহিত গ্রহণ করেন। তৎকালে যাঁহারা বিদ্যমান ছিলেন তাঁহারা জানিতেন রামমোহন রায়ের পর ব্রাহ্মসমাজের তিনি কিরূপে প্রাণসঞ্চার করিয়া তুলেন। তিনি নানা উপায়ে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা এক সময়ে দেশের যথেষ্ট উপকার করিয়াছে। সে সময়ে সাধারণের মধ্যে সংস্কৃত ও ইংরাজীর তাদৃশ বিস্তার হয় নাই কিন্তু তদানীন্তন অল্পসংখ্য শিক্ষিতের শিক্ষার ফল এই পত্রিকার সাহায্যে বঙ্গদেশময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এখন অনেক গ্রন্থ মুদ্রিত ও আলোচিত হইতেছে, কিন্তু তখন অনেক গ্রন্থই তালপত্র ও তেরেট পত্রের ভিতর আবদ্ধ ছিল। সেই সময়ে তত্ত্ববোধিনী ঐ সকল জীর্ণ শীর্ণ কীটদংষ্ট পুস্তকের ভিতর হইতে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় অনেক তত্ত্ব বাহির করিয়াছিল। বলিতে কি উত্তরমীমাংসা উপনিষদাদি গ্রন্থ যে কি তত্ত্ব প্রচার করিতেছে তাহা সংস্কৃতাধ্যায়ীদিগের মধ্যেও অনেকে জানিতেন না। তত্ত্ববোধিনী উদ্‌ঘাটন কর ইহা প্রথমাবস্থায় সেই সকল গ্রন্থ হইতে সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করিয়া লোক সকলকে চমকিত করিয়া তুলে এবং ইউরোপের বিজ্ঞান দর্শনাদিও বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত ইহা দ্বারা তৎকালে একটা ভাষা-সংস্কার হয়। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গভাষার গদ্য একটা কিম্ভূতকিমাকার ছিল। ইহা বহুলপরিমাণে পারসীক ভাষায় মিশ্রিত হইয়া আদালতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। রামমোহন রায় স্বীয় বিচার গ্রন্থে কিয়ৎপরিমাণে সেই জঞ্জাল হইতে ইহাকে নির্ম্মুক্ত করেন। পরে তত্ত্ববোধিনী ইহার সকল রকম জটিলতা ও আবর্জ্জনা দূর করিয়া ইহাকে সকল প্রকার ভাব প্রকাশের উপযোগী করিয়া তুলে। বলিতে কি এই সমস্ত কার্য্য একমাত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পর যাঁহারা ব্রাহ্ম হন তাঁহারা ইহাঁর উপদেশ ও দৃষ্টান্তে নবজীবন ও নবোৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া, লোকের সকল প্রকার দুর্দ্দশা দূর করিতে এবং জনসমাজের নানারূপ হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ স্মরণ করিলে এখনও নির্জীব মনে বলসঞ্চার হয়। তাঁহারা শাস্ত্র ও যুক্তিতর্ক সহকারে মূর্ত্তিপূজার প্রতি লোকের বদ্ধমূল কুসংস্কার দূর করিয়া যেমন একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন সেই সঙ্গে দেশের প্রকৃত হিতকর অনেক কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করেন। তাঁহারা বিদ্যা প্রচারের জন্য ইংরাজী ও বাঙ্গলা পাঠশালা সকল স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক স্থানে চিকিৎসক ও ঔষধের অভাবে অকাল-মৃত্যু লোকক্ষয় করিত। ইহাঁদের যত্নে স্থানে স্থানে ঔষধালয় স্থাপিত হয় এবং অল্প ব্যয়ে সকলে রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে থাকে। ইহাঁদের মধ্যে এমন হৃদয়বান লোক ছিলেন যে তাঁহারা অনাথ বিপন্ন রোগীর দিবারাত্রি স্বহস্তে সেবা করিতেও কাতর ছিলেন না। তৎকালে ইহাঁদের পরিচিত ও অপরিচিত যে, যে রকম বিপদে পড়ুক ইহাঁরা বদ্ধপরিকর হইয়া তাহার বিপদ উদ্ধারে যত্নবান হইতেন। তখন মিউনিসিপালিটি ছিল না কিন্তু ইহাঁরাই যাতায়াতের সুবিধার জন্য পথ প্রস্তুত করিতেন। গ্রামের স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখিবার জন্য বন জঙ্গল পরিস্কার করিতেন। ইহাঁরা সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় নীতিপর ও সংযমী ছিলেন। অনেকেরই শারীরিক বল অসাধারণ ছিল। এমন কি অনেক গুলি দুর্ব্বৃত্ত লোক বিদ্বেষের বশীভূত

হইয়া সক্রোধে আক্রমণ করিলেও একাকীই নিজ ভুজবলে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিতেন। অনেক স্থলে আজিও তাঁহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ বিদ্যালয় ঔষধালয় ব্রহ্মমন্দির বিদ্যমান আছে। সেই সকল সরল ও সাধু প্রকৃতির লোক দেশের প্রকৃত অভাব বুঝিতেন এবং স্বতঃ পরত চেষ্টাবান হইয়া তাহা দূর করিবার জন্য যত্ন করিতেন। এখন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় আর কেহই জীবিত নাই। তাঁহারা যে পদাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন তাহার অনুসরণ করিবার লোকও অল্প। এখন ব্রাহ্মসমাজ বহু অংশে বিভক্ত। কিন্তু বিভক্ত হইলেও মহর্ষি-প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদ আচার অনুষ্ঠান সমস্তই কোন না কোন রকমে রক্ষা করিতেছেন। এমন কি তাঁহারই প্রবর্ত্তিত এই ১১ই মাঘের মহাপর্ব্ব ব্রাহ্মমাত্রেই পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখিতেছি যে সকল সংস্কার বর্ত্তমানে অনাবশ্যক সেই সকল সংস্কার লইয়াই ইহাঁদের অনেকেই ব্যস্ত। তখন ব্রহ্মজ্ঞেরা এদেশের শ্রদ্ধাভক্তি ও বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন এখন যে কারণেই হউক সেইরূপ শ্রদ্ধাভক্তি ও বিশ্বাসের পাত্র প্রায়ই কেহ দৃষ্ট হন না। এই কারণে সেই পূর্ব্বকালের জন্য প্রাণটা কাতর হয়। যিনি স্বীয় চরিত্রবলে ব্রাহ্মসমাজকে এতকাল সম্মান-পদবীতে ধারণ করিবার স্তম্ভস্বরূপ হইয়া আছেন, পূর্ব্বকালে যাঁহার নেতৃত্বে দেশমধ্যে এই সমস্ত মহৎ অনুষ্ঠান হইয়াছিল আজ তিনিও জীবনের পশ্চিম প্রান্তে উপনীত ও অস্তোন্মুখ। ইহাঁর অবর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজে যে কি একটা অন্ধকার আসিবে জানি না কে তাহা অপসারিত করিবে।

Sermons of Maharshi Debendranath Tagore.

(Translated from Bengalee.)

SERMON LII.

Veneration Towards God.

Man is but like a drop of water or a grain of sand. In this vast world each one of us is like a speck of sand. It is when we enter God's path that we become great, and feel exceeding joy. When a particle of sand, carried by the wind up into the sky, glitters in sunlight, it reflects on its surface the entire sun, but when again it falls on the ground, it loses its sun-lit lustre, and mixed with the dust, becomes as foul as before. So it is with our soul, which when held in bondage by the infatuation of the world, becomes more and more impure, but when the light of the Supreme Spirit falls upon it, it is uplifted from its lowly state and all its beauty unfolds itself. The human soul, though little, is invested with true nobility when it enters the path of God. When we are divorced from God, all that happens to us is misfortune. We live really only when we remember Him ; We live truly only when we enjoy the joy of the Divine Spirit. When we alienate ourselves from Him, we fall into the clutches of death. The moment in which we remember God is the divine moment, and the place where we remember Him is Heaven. The place where and the time when we remem-

ber God are sanctified. That Holy One who can obtain ? He only obtaineth Him whose heart is filled with veneration towards Him. Who can enter that domain of holiness that we call heaven ? "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।" He who can steadfastly fix his mind on God and whose heart so yearneth after Him that he can not live without Him—the individual who has become so reverent in spirit and so God-devoted—only obtaineth God. When the senses are not agitated by desires but are restrained and become as obedient and submissive to the soul as the servant is to the master, then does the soul enjoy uninterruptedly the joy of God. The fruit of obtaining God is comfort and peace. So long as there has not been peace in the soul, so long as you have not found comfort in the heart, so long as anger has been raging within you, so long as there has been envy in you, in a word, so long as your mind has been burning with these passions, you can not have obtained God. The fruit of obtaning God is comfort and peace. "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিং অচিরেণাধিগচ্ছতি।" Reverence is the first requisite and with reverence you must seek the knowledge of God, and when you have obtained Divine knowledge, you will as surely obtain peace. God himself dispenseth righteousness to man so that he may obtain pure and perfect peace. The fruit of divine worship is peace and salvation. When we are in the company of the Lord, the burden is lifted from our heavy-laden heart, and grief and mental anguish vanish and we feel we have come into the possession of all possible riches. O supreme Spirit, send to our hearts love and veneration and manifest Thyself to us.

SERMON LIII.

Seeing and obtaining God.

Must we depart from the temple of this universe, this beautiful temple that we have entered, the temple that is so splendidly adorned, the temple that is coloured on all sides, day and night, by the sun and the moon in silver and golden hues—must we depart from this universe with the impression that it is a vast vacuity ? Must we refrain from partaking even in a minute degree of our great and glorious birth right ? Is the temple of the universe really vacant ? Is not the author of the universe present in it ? Where is the beauty in a vacant temple ? If we can not behold the deity of this temple, then where is its beauty ? The human soul is not born here to behold an empty temple. Is that only substance which is visible to our material eyes ? Is not there another substance than what we see with the eyes of our body ? The right of vision that has been vouchsafed to us is not confined to only objects visible te our eyes. Have we come to this world, endowed with the precious soul that we possess, only to see dead, inanimate matter ? The eye only sees objects that are of dead, inanimate matter--mere grains of dust—and if it strains itself to its utmost power, it can see the stars that shine over us. Can we not feel what the eye can not see, and the ear can not hear ? If we can not, shame to us ! Those who have faith in and reverence for God can through His mercy behold Him through this world of matter. The rays of the light of His goodness make their way through the sun and shine here ; the soul has the right to receive them in itself. The soul, when freed from perturbation, and in the enjoyment of peace, can behold God who is not subject to decay, death, auguish, and fear, and whom sin can not touch and who is all-holy. Our

body is visible to the eye, but not our soul, and though our soul is finite, He who dwelleth in the interior of our soul, is the Being Infinite. All that exists is the glory of that Infinite Being. "দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং।" Through the glory of His might does the universe run in its course during all time, and our soul realizes this truth and feels itself blessed. The soul can not enjoy felicity until it can feel the eternal glory of God, until it can proclaim that glory by the tongue of its body and until it can engage itself in deeds of pure righteousness. The soul has a craving to grasp the eternal reality of God, it has a louging to realize His infinite goodness, and it has a yearning to do righteousness which is in accordence with His will and behest. These yearnings of the human soul are sent to man by God and they are worthy of the angels. These longings help to keep us in the path of God. What remains of the soul if these longings are quenched for ever? Should we keep ourselves occupied only in appeasing the hunger and thirst of the body? Must we not strive to satisfy the hunger of our soul by obtaining God who is the One without a second, who is goodness itself, peace itself, and who alleviates the intensity of the illusions of sublunary life? Must we not cordially welcome to our soul the Supreme Soul? When the Lord of the heart comes to the heart, must we not then adore Him with flowers of love? Should the Master be denied a place in his own mansion? Should we banish God from His home and defile it with accumulated sins? Should we not offer even a drop of love to Him, whose love flows ceaselessly over us? What infatuation is this that has possessed us! O Lord, do thou deliver us from the deep darkness of worldly infatuation and carry us onward to Thee, so that sinful thoughts and worldly desires may never again divert us from Thee.

সমালোচনা।

ডেরাডুন মসূরি।—ইহা একখানি ভ্রমণ বৃত্তান্ত। শ্রীযুক্ত বাবু নৃপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত প্রণীত। আমরা এই পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। নৃপেন্দ্র বাবু ডেরাডুন প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া যাহা কিছু দেখিয়াছেন, ইহাতে তৎসমুদায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বন নদী পর্ব্বত প্রভৃতির বর্ণনা পাঠ করিলে ইচ্ছা হয় যেন সেই গুলি স্বচক্ষে গিয়া একবার দেখিয়া আসি। এই গ্রন্থের ভাষা ওজস্বী প্রাঞ্জল ও মধুর। বহু অনুসন্ধান পূর্ব্বক নৃপেন্দ্র বাবু স্থানীয় ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যাঁহারা মসূরি প্রভৃতি প্রদেশে ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা করেন এই পুস্তকখানি তাঁহাদের বিশেষ সহায়তা করিবে। আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া নৃপেন্দ্র বাবুকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসা করি। এই পুস্তকের ছাপা ও কাগজ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইয়াছে এবং ইহাতে কয়েকখানি সুন্দর ছবিও আছে।

বিজ্ঞাপন।

পঞ্চসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক
ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
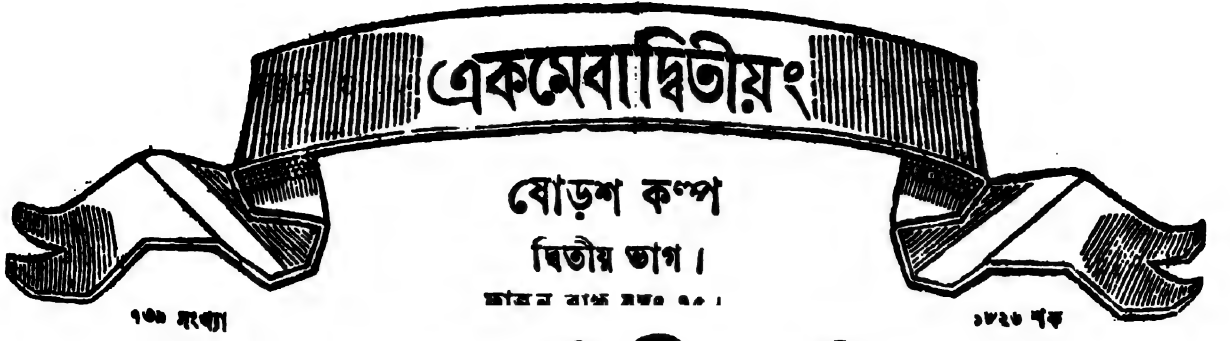
শোক-সংবাদ।

ধর্ম্মজগতের জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্য আজ অস্তমিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গত ৬ই মাঘ মধ্যাহ্নে আত্মীয় স্বজন সকলকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া লোকলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এই পুণ্যবান আজীবন-সংযত মহাপুরুষকে রোগযন্ত্রণা বিশেষরূপ ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি ঈশ্বরের কোমল করস্পর্শে তাঁহারই ক্রোড়ে সুখে নিলীন হইয়াছেন। দেখিলাম, অন্তিমকালে তাঁহার অন্তরঙ্গ অনেকেই নিস্তব্ধভাবে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। মধ্যে সেই মহাপুরুষ পর্য্যঙ্কে শয়ান। তাঁহার চক্ষু নিমীলিত, মুখে যন্ত্রণার কোনই চিহ্ন নাই, তিনি স্থির ধীর ও প্রশান্ত মনে ব্রহ্মের সহিত গাঢ়তম যোগে নিমগ্ন। বোধ হইল, এই ব্রহ্ম-যোগে না জানি ইনি কি আনন্দই ভোগ করিতেছেন! "এক্ষণে ব্রহ্মের আহ্বান আসিয়াছে, চলিলাম," তৎকালে সকলের নিকট এই বলিয়াই যেন তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠিক্ যেন স্বেচ্ছামৃত্যু। ঐ সময় যাঁহারা তাঁহার অন্তিমসাক্ষী ছিলেন এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যান। অনন্তর তাঁহার পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদি নগ্নপদে দীনবেশে তাঁহার পবিত্র দেহ বহন করিয়া শ্মশানক্ষেত্রে লইয়া যান। সঙ্গে সহস্রাধিক লোক। পরে চন্দনকাষ্ঠের চিতা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি তাঁহাকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া দিল। অজস্রধারায় প্রক্ষিপ্ত ঘৃত ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য সংযোগে চিতাগ্নি যার পর নাই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই মহর্ষিদেবের দেহ যেন পবিত্র হোমাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। শ্মশান স্থানে বহুসংখ্য বিদ্বান সম্ভ্রান্ত নানা জাতীয় লোক, ভদ্র-গৃহের স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত এই সাধুপুরুষের অগ্নিসংস্কার দেখিতে আসিয়াছিলেন। সকলেরই মুখশ্রী ঘন বিষাদে আবৃত এবং অনেকের নেত্র হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত হইতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া এই কবিতাটি, যাহা এক সময়ে তাঁহারই উদ্দেশে রচিত হইয়াছিল, তাহা মনে পড়িল।

> যমেব প্রারোদীর্জঠরশয়নাৎ ক্ষ্মাতলগতো
> মুদাবিষ্টা উচ্চৈর্জহসুরপরে চাত্র জগতি।
> যদাসন্নে কালে পরিণতবয়াস্ত্যক্ষ্যসি তনুং
> মহোল্লাসৈর্হাসস্ত্বয়ি ভবতু চান্যেষু রুদিতং।

"যখন গর্ভশয্যা হইতে ভূমিষ্ঠ হও তখন তুমিই কাঁদিয়াছিলে এবং এই জগতে অপরে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উচ্চস্বরে হাসিয়াছিল, আবার যখন বার্দ্ধক্যে—সময় আসিলে দেহত্যাগ করিবে তখন মহা উল্লাসের সহিত তুমি হাস এবং অন্যে কাঁদুক"। ফলতঃ দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহর্ষি দেবের মুখশ্রীতে যোগানন্দের উচ্ছ্বাস এবং দেহান্তে উপস্থিত সকলের হাহাকার দেখিয়া এই কবিতাটি মনে পড়িল। তৎকালে মনে হর্ষ বিষাদ যুগপৎ দুই-ই উপস্থিত হইল। কবি কল্পনাবলে ভবিষ্যৎ যাহা সূচনা করিয়াছিলেন এখন কার্য্যত তাহাই দৃষ্ট হইল এইজন্য হর্ষ, আর দেশের এমন অপূর্ব্ব রত্নকে জন্মের মত হারাইলাম এইজন্য গাঢ় বিষাদ। হা! এখন যদিও তাঁহার তিরোভাব হইয়াছে কিন্তু তিনি পবিত্র চরিত্রবলে সুজীবিত। আজ এই মহাত্মার অভাবে বঙ্গের—ভারতের সর্ব্বত্রই হাহাকার! সর্ব্বত্রই রোদন ও বিলাপ। আমরা তাঁহার প্রসঙ্গে এখন অধিক কিছুই বলিতে চাই না, আজ সমস্ত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের সমস্ত সংবাদপত্র সমস্বরে কি বলিতেছেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। হিন্দুসমাজের মুখপত্র "বসুমতী" তাঁহার অভাব কিরূপ অনুভব করিয়াছেন নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম, পাঠকেরা বুঝিবেন তিনি সর্ব্বসাধারণের কি ভক্তি ও গৌরবের বস্তু ছিলেন।

"এই বৃহস্পতিবারে সত্যই আমাদের বঙ্গজননীর কল্যাণ অমৃতপূর্ণ অঞ্চল হইতে একটি দুর্লভ ফল খসিয়া পড়িল। সাধুচরিত্র, ভগবানের প্রতি চিরনির্ভরশীল, মনুষ্যসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বিধাতা-নির্ম্মিত অমৃত ফল বলিয়াই মনে হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিগত শতাব্দীতে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই, ভবিষ্যতে তাঁহার ন্যায় মনুষ্যের আবির্ভাবের সম্ভাবনাও সুদূর-পরাহত,—হয়ত অসম্ভব; কারণ যে যুগের সংঘর্ষণে তাঁহাকে মানুষ হইতে হইয়াছিল, যে যুগের প্রভাব তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজ জীবনে প্রতিহত হইয়া তাঁহাকে অধিকতর আত্ম-নির্ভরের শক্তি প্রদান করিয়াছিল, সে যুগ, সে যুগের সমাজ. সে যুগের সংস্কারপদ্ধতি এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এ নূতন যুগ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গদেশের একজন বড় লোক ছিলেন, এমন স্বার্থপরতার দেশে, মিথ্যাচারের দেশে, এমন বহ্বাড়ম্বরের দেশে মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় একজন লোকের অভ্যুত্থান অতি বিস্ময়ের কথা। বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজকে—বঙ্গদেশের মনুষ্যসমাজকে ইহা বিধাতার বিশিষ্ট দান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

লোকে জানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বড় লোক ছিলেন। তাঁহার সুবিস্তীর্ণ জমীদারী, গৃহে কমলা আবদ্ধা;—কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে ধনবান বলিয়া জানিতেন এরূপ লোকের সংখ্যা অল্প। মহর্ষি বলিলে আমরা—বাঙ্গালীরা, কেবল মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই বুঝিতাম, বিদ্যাসাগর বলিলে যেমন মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেই বুঝিতাম সেইরূপ।—একালে রাজর্ষি দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি অনেকে হইতে পারেন, কারণ এখন উপাধিরই যুগ পড়িয়াছে, কিন্তু 'মহর্ষি ও বিদ্যাসাগর' এ দুইটি যেন ব্যক্তিগত উপাধি হইয়া গিয়াছে।—বিদ্যাসাগরের পরলোকগমনে বঙ্গে দয়ার সাগর শুকাইয়া গিয়াছে—কর্ম্মের পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ইহলোক ত্যাগে ভগবদ্ভক্তির ও ধর্ম্মের উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। বঙ্গের প্রাচীন সমাজের সহিত আধুনিক বঙ্গ-সমাজের যে যোগ ছিল

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোক গমনে তাহার অর্দ্ধেক ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, মহর্ষির দেহত্যাগে সে যোগ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইল। আজিকার দিনে,—আমাদের জাতির এই নৈতিক অবনতি, ধর্ম্মহীনতা ও বিশ্বাসাভাবের দিনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অভাব অতি গুরুতর অভাব বলিয়াই মনে হয়। যদিও তিনি বহুদিন পূর্ব্বেই সংসারের সকল সম্বন্ধ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার জীবনের ও তাঁহার উপদেশের প্রভাব ধর্ম্মপিপাসু শিক্ষিত সমাজকে পবিত্রতার পথে অগ্রসর করিবার চেষ্টা করিত। যে চরিত্রের দিকে চাহিয়া মানুষ আপনার ক্ষুদ্রতায় লজ্জিত হইয়া সেই চরিত্রের প্রতি মুগ্ধচিত্তে আকৃষ্ট হয়, সেই মহনীয় চরিত্র অবলম্বন স্বরূপ মনে করে—সেই পুণ্য চরিত্র মনুষ্য-লোক হইতে অন্তর্হিত হইলে দেশের পক্ষে তাহা কিরূপ দুর্ভাগ্যের কথা, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যৌবনে যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন—তাহার মত পুণ্য কাহিনী এ দেশের ইতিহাসে আর শুনি নাই। নিজের অসীম ঐশ্বর্য্যের দ্বার হইতে স্বেচ্ছায় তিনি আপনাকে দারিদ্র্যের রৌদ্রময় জ্বালাময় কঙ্করময় রাজপথে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যভ্রষ্ট হন নাই; উত্তমর্ণগণকে অনায়াসে বঞ্চিত করিয়া রাজার ন্যায় প্রচুর সম্পদে পূর্ণ হইয়া দেহপাত করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই, যাহার যাহা প্রাপ্য—সকলই তিনি শোধ করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি বিধাতার প্রসন্নতাও লাভ করিয়াছিলেন; কমলা তাঁহার প্রতি বিমুখা হন নাই, অবশেষে দেবী বীণাপাণি তাঁহাকে বীণাপুস্তকরঞ্জিত হস্তে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। সেই আশীর্ব্বাদ এখনও তাঁহার সংসারের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিতেছে। তাঁহার যোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়গণের নাম বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজে নিত্য প্রকীর্ত্তিত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় নব্বই বৎসর বয়সের দেহত্যাগ করিলেন। বহু শোক তাঁহার জীবনকে ভারাক্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী, প্রিয়তম পুত্র, প্রাণাধিক জামাতা, পৌত্র তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবানের প্রতি যাঁহার অসীম বিশ্বাস—সংসারকে যিনি মায়াময় বলিয়া বুঝিয়াছেন, শোকতাপ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহার গৃহ-উপবনের প্রস্ফুটিত কুসুম একে একে অদৃশ্য হইয়াছে, তিনি ভগবানকে সেই অভাবের স্থানে বসাইয়া বিগলিত অশ্রু দ্বারা প্রেমময়ের সিংহাসন ধৌত করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার সকল অপেক্ষা ক্ষতি মহাত্মা কেশবচন্দ্রকে হারাইয়া। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কোন দিন বলেন নাই, ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে ভিন্ন। সামাজিক প্রথার ভিন্নতা কখন ধর্ম্মনীতির মূল সূত্রকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে না। রাজা রামমোহন রায় সমাজের যে সংস্কার পথে অগ্রসর হন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেই পথকেই শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া মনে করিয়া সেই পথেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন সে পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথের অনুসরণ করিলেন।—যে দিন গুরু শিষ্যের, পিতা পুত্রের প্রধান বন্ধন—ধর্ম্মজীবনের বন্ধন এইরূপ ছিন্ন হইল সে দিন ব্রাহ্মসমাজের ঘোর দুর্দ্দিন, সেই দুর্দ্দি-

নের মেঘ ব্রাহ্ম-সমাজাকাশ হইতে আর পরিষ্কার হইল না।—কিন্তু কর্ত্তব্যজ্ঞানের নিকট স্নেহ পরাজিত হইল। স্নেহের অনুরোধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় নাই। প্রকৃত ব্রাহ্মণের যে সকল গুণ থাকা উচিত, মহর্ষি দীর্ঘ জীবনের কঠোর সাধনার দ্বারা তাহা পরিপূর্ণ রূপে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন এ কথা বলিলে, এ দেশের ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয় না। এ যুগে তাঁহার মত ব্রাহ্মণের বড় আবশ্যক ছিল।—কিন্তু বিধাতা কাহাকেও মনুষ্যের আশার অনুরূপ দীর্ঘজীবন দান করেন না, সুতরাং আমাদের আশা অপূর্ণ রহিয়া গেল, তাঁহার ভক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশামৃতবর্ষী কণ্ঠ চিরনীরব হইল। ভগবান তাঁহাকে আপনার স্নেহের কোলে টানিয়া লইলেন।—এজন্য আমরা শোক করিব না, আক্ষেপও করিব না, কিন্তু এ কথা আমরা কোন মতে ভুলিতে পারিব না যে, আজ কেবল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর নহে—কেবল কলিকাতার ধর্ম্ম-সমাজের নহে,—আজ সমগ্র বঙ্গের ধর্ম্ম ও নীতির আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অদৃশ্য হইলেন। সমগ্র ভারতের গৌরবময় চিরপূজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ্যের আদর্শ লুপ্ত হইল"।

চতুর্থী ক্রিয়া।

মহর্ষিদেবের কন্যাগণ সমারোহে তাঁহার চতুর্থী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই উপলক্ষে সকলেই ষোড়শ উৎসর্গ করেন। ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সজল নয়নে গদ্‌গদ-বাক্যে যে প্রার্থনা করেন নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

"হে পিতা, হে গুরুদেব! তুমি ত আমাদের ছেড়ে চলে গেলে, আমি এখন কি নিয়ে থাক্‌ব, কি কর্‌ব, তুমি যে আমার সবই ছিলে। তোমারি উপর আমার প্রাণ মন শক্তি সবই সমর্পণ করে রেখেছিলুম, সব শূন্য করে চলে গেলে। হে পিতা, তোমার সেই সৌম্য শান্ত দেব-মূর্ত্তি আর দেখ্‌তে পাব না, তোমার মুখের সেই অমৃতময়ী বাণী আর শুন্‌তে পাব না, এ মনে হলে যে প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে! এখন থেকে জীবন্মৃত হয়ে থাক্‌তে হবে। দেব! তুমি ত সাধারণ পিতার মত ছিলে না, যে কার্য্য কোন পিতায় করিতে পারে না তুমি যে তাহা করেছ। কিসে আমাদের জ্ঞান ধর্ম্ম ও আত্মার উন্নতি হয়, কিসে ঈশ্বরের পূজা প্রতিদিন করি, সেই চেষ্টা আজীবন করেছ। তুমিই আমার গুরু, তোমার প্রসাদেই পরমার্থ বিষয়ে যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করেছি। কিন্তু এই দুঃখ যে তোমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করে তোমাকে সুখী কর্‌তে পার্‌লুম না। আমাদের পরম সৌভাগ্য এবং একমাত্র গর্ব্বের বিষয় যে তোমার মত অমন পিতা পেয়েছিলুম। কত অনাথ বিধবা তোমার শোকে হাহাকার করে বেড়াচ্চে, তুমিই তাদের একমাত্র আশাভরসা ছিলে, কে আর তাদের মুখে অন্ন দেবে? প্রত্যহ আমি যখন তোমাকে প্রণাম কর্‌তুম তুমি তোমার কোমল ক্ষীণ হাতটি তুলে আমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে, সে কি আর জীবনে কখনো ভুল্‌তে পার্‌ব? সে রকম স্নেহ আর কার কাছে পাব? এখন এই আশীর্ব্বাদ তোমার কাছে ভিক্ষা

করুছি, যে তুমি আজীবন যাঁকে পূজা করে এসেছ, তাঁর পূজায় যেন এ জীবন অতিবাহিত করতে পারি। তোমার জন্যে ঈশ্বরের নিকট কি আর প্রার্থনা করব, তুমি তাঁর পরমভক্ত প্রিয়পুত্র ছিলে, রোগশয্যাতেও প্রতিদিন সূর্য্য দেখে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে, তাঁর পূজা শেষ করে, তবে দুগ্ধপান করতে। হে ঈশ্বর। তুমি তাঁর জীবনে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়েছ, তাঁর দ্বারা কত লোকের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দীপন করে দিয়েছ, তাঁকে ধন মান পুত্র পৌত্র সকল সম্পদেই সুখী করেছ, কোনই অভাব রাখ নাই। এখন কেবল তোমার কাছে এই প্রার্থনা করি, তাঁর চিরকালের আন্তরিক যে বাসনা, যে ব্রহ্মধামে গিয়ে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করবেন, সেই কামনা তুমি পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।”

আদ্য কৃত্য।

মহর্ষিদেবের পুত্রগণ দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিয়া তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ করেন। শ্রাদ্ধসভায় বিস্তর ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। প্রথমে ব্রাহ্মগণের মধুর সঙ্কীর্ত্তন হয়। পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তারা রৌপ্য-ষোড়শাদি উৎসর্গ করিলে আচার্য্যেরা ব্রহ্মোপাসনা করেন। উপাসনা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

“হে পরমপিতঃ, হে পিতৃতমঃ পিতৃণাম্, এ সংসারে যাঁহার পিতৃভাবের মধ্য দিয়া তোমাকে পিতা বলিয়া জানিয়াছি—অদ্য একাদশ দিন হইল, তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত জীবন হোমহুতাশনের ঊর্দ্ধমুখী পবিত্র শিখার ন্যায় তোমার অভিমুখে নিয়ত উত্থিত হইয়াছে। অদ্য তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনযাত্রার অবসানে তুমি তাঁহাকে কি শান্তিতে, কি অমৃতে অভিষিক্ত করিয়াছ—যিনি স্বর্গ কামনা করেন নাই, কেবল “ছায়াতপয়োরিব” ব্রহ্মলোকে তোমার সহিত যুক্ত হইবার জন্য যাঁহার চরমাকাঙ্ক্ষা ছিল, অদ্য তাঁহাকে তুমি কিরূপ সুধাময় চরিতার্থতার মধ্যে বেষ্টন করিয়াছ, তাহা আমাদের মননের অগোচর, তথাপি হে মঙ্গলময়, তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গল-ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তোমাকে বারবার নমস্কার করি। তুমি অনন্তসত্য, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত সত্যচিন্তা নিঃশেষে সার্থক হয়,—তুমি অনন্তকল্যাণ, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত শুভকর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সফল হয়,—আমাদের সমস্ত অকৃত্রিম প্রেম, হে আনন্দস্বরূপ, তোমারই মধ্যে সুন্দরভাবে ধন্য হয়,—আমাদের পিতৃদেবের জীবনের সমস্ত সত্য, সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত প্রেম তোমার মধ্যে অনির্ব্বচনীয়রূপে পরিপূর্ণ হইয়াছে, ইহা জানিয়া আমরা ভ্রাতাভগিনীগণ করযোড়ে তোমার জয়োচ্চারণ করিতেছি।

পৃথিবীতে অধিকাংশ সম্বন্ধই দানপ্রতিদানের অপেক্ষা রাখে—কিন্তু পিতামাতার স্নেহ প্রতিদানপ্রত্যাশার অতীত। তাহা পাপ, অপরাধ, কদর্য্যতা, কৃতঘ্নতা সমস্তকেই অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। তাহা ঋণ নহে, তাহা দান। তাহা আলোকের ন্যায়, সমীরণের ন্যায়—তাহা শিশুকাল হইতে আমাদিগকে নিয়ত রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তাহার মূল্য কেহ কখনো চাহে নাই। পিতৃস্নেহের সেই অযাচিত, সেই অপর্য্যাপ্ত মঙ্গলের জন্য, হে বিশ্বপিতঃ, আজ তোমাকে প্রণাম করি!

আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল, আমাদের পিতামহের মৃত্যুর পরে এই গৃহের উপরে সহসা ঋণরাশিভারাক্রান্ত কি দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। পিতৃদেব একাকী বহুবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে দুস্তর ঋণসমুদ্র সন্তরণ পূর্ব্বক কেমন করিয়া যে কূলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন —আমাদের অদ্যকার অন্নবস্ত্রের সংস্থান কেমন করিয়া যে তিনি ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইয়া আমাদের জন্য রক্ষা করিয়াছেন, আজ তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। সেই ঝঞ্ঝার ইতিহাস আমরা কি জানি! কতকাল ধরিয়া তাঁহাকে কি দুঃখ, কি চিন্তা, কি চেষ্টা, কি দশাবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া প্রতি দিন, প্রতি রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছে, তাহা মনে করিতে গেলে শরীর কণ্টকিত হয়। তিনি অতুল বৈভবের মধ্যে লালিতপালিত হইয়াছিলেন—অকস্মাৎ ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সম্মুখে কেমন করিয়া তিনি অবিচলিত বীর্য্যের সহিত দণ্ডায়মান হইলেন! যাহারা অপর্য্যাপ্ত ধনসম্পদ্ ও বাধাহীন ভোগসুখের মধ্যে মানুষ হইয়া উঠে, দুঃখসংঘাতের অভাবে, বিলাসলালিত্যের সংবেষ্টনে বাল্যকাল হইতে যাহাদের শক্তির চর্চ্চা অসম্পূর্ণ, সঙ্কটের সময় তাহাদের মত অসহায় কে আছে! বাহিরের বিপদের অপেক্ষা নিজের অপরিণত চারিত্রবল ও অসংযত প্রবৃত্তি তাহাদের পক্ষে গুরুতর শত্রু। এই সময়ে এই অবস্থায় যে ধনপতির পুত্র নিজের চিরাভ্যাসকে খর্ব্ব করিয়া, ধনিসমাজের প্রভূত প্রতিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া শান্তসংযত শৌর্য্যের সহিত এই সুবৃহৎ পরিবারকে স্কন্ধে লইয়া দুঃসহ দুঃসময়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন ও জয়ী হইয়াছেন, তাঁহার সেই অসামান্য বীর্য্য, সেই সংযম, সেই দৃঢ়চিত্ততা, সেই প্রতিমুহূর্ত্তের ত্যাগস্বীকার আমরা মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধিই বা করিব কি করিয়া এবং তদনুরূপ কৃতজ্ঞতাই বা কেমন করিয়া অনুভব করিব! আমাদের অদ্যকার সমস্ত অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের পশ্চাতে তাঁহার সেই বিপত্তিত্রে অকম্পিত বলিষ্ঠ দক্ষিণহস্ত ও সেই হস্তের মঙ্গল আশিষস্পর্শ আমরা যেন নিয়ত নম্রভাবে অনুভব করি।

আমাদের সর্ব্বপ্রকার অভাবমোচনের পক্ষে প্রচুর এই যে সম্পত্তি তিনি সম্পূর্ণ নিজের বলে রক্ষা করিয়াছেন, ইহা যদি অধর্ম্মের সহায়তায় ঘটিত, তবে অদ্য অন্তর্যামীর সম্মুখে সেই পিতার নিকটে শ্রদ্ধানিবেদন করিতে আমাদিগকে কুণ্ঠিত হইতে হইত। সর্ব্বাগ্রে তিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া পরে তিনি ধনরক্ষা করিয়াছেন—অদ্য আমরা যাহা লাভ করিয়াছি, তাহার সহিত তিনি অসত্যের গ্লানি মিশ্রিত করিয়া দেন নাই—আজ আমরা যাহা ভোগ করিতেছি, তাহাকে দেবতার প্রসাদস্বরূপ নির্ম্মলচিত্তে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিবার অধিকারী হইয়াছি।

সেই বিপদের দিনে তাঁহার বিষয়ী বন্ধুর অভাব ছিল না—তিনি ইচ্ছা করিলে হয় ত কৌশলপূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বসম্পত্তির বহুতর অংশ এমন করিয়া উদ্ধার করিতে পারিতেন যে, ধনগৌরবে বঙ্গীয় ধনীদের ঈর্ষাভাজন হইয়া থাকিতেন। তাহা করেন নাই বলিয়া আজ যেন আমরা তাঁহার নিকটে দ্বিগুণতর কৃতজ্ঞ হইতে পারি।

ঘোর সঙ্কটের সময় একদিন তাঁহার সম্মুখে একইকালে শ্রেয়ের পথ ও প্রেয়ের পথ উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। তখন সর্ব্বস্ব হারাইবার সম্ভাবনা তাঁহার সম্মুখে ছিল—তাঁহার স্ত্রীপুত্র ছিল, তাঁহার মানসম্ভ্রম ছিল

তৎসত্ত্বে যেদিন তিনি শ্রেয়ের পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন, সেই মহাদিনের কথা আজ যেন আমরা একবার স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের বিষয়লালসার তীব্রতা শান্ত হইয়া আসিবে এবং সন্তোষের অমৃতে আমাদের হৃদয় অভিষিক্ত হইবে। অর্জ্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা আমরা গ্রহণ করিয়াছি; বর্জ্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহাও যেন গৌরবের সহিত গ্রহণ করিবার যোগ্য আমরা হইতে পারি।

তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন,—কিন্তু তিনি যদি শুদ্ধমাত্র বিষয়ী হইতেন, তবে তাঁহার উদ্ধারপ্রাপ্ত সম্পত্তিখণ্ডকে উত্তরোত্তর সঞ্চয়ের দ্বারা বহুলরূপে বিস্তৃত করিতে পারিতেন। কিন্তু বিষয়বিস্তারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঈশ্বরের সেবাকে তিনি বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার ভাণ্ডার ধর্ম্মপ্রচারের জন্য মুক্ত ছিল—কত অনাথ পরিবারের তিনি আশ্রয় ছিলেন, কত দরিদ্র গুণীকে তিনি অভাবের পেষণ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, দেশের কত হিতকর্ম্মে তিনি বিনা আড়ম্বরে গোপনে সাহায্য দিয়াছেন। এইদিকে কৃপণতা করিয়া তিনি কোনোদিন তাঁহার সন্তানদিগকে বিলাসভোগ বা ধনাভিমানচর্চ্চায় প্রশ্রয় দেন নাই;—ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থ যেমন সমস্ত অতিথিবর্গের আহারশেষে নিজে ভোজন করেন, তিনি সেইরূপ তাঁহার ভাণ্ডারদ্বারের সমস্ত অতিথিবর্গের পরিবেষণশেষ লইয়া নিজের পরিবারকে প্রতিপালন করিয়াছেন। এইরূপে তিনি আমাদিগকে ধনসম্পদের মধ্যে রাখিয়াও আড়ম্বর ও ভোগোন্মত্ততার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এবং এইরূপে যদি তাঁহার সন্তানগণের সম্মুখ হইতে লক্ষ্মীর স্বর্ণপিঞ্জরের অবরোধদ্বার কিছুমাত্র শিথিল হইয়া থাকে, যদি তাঁহারা ভাবলোকের মুক্ত আকাশে অবাধবিহারের কিছুমাত্র অধিকারী হইয়া থাকেন, তাব নিশ্চয়ই তাঁহারা পিতার পুণ্যপ্রসাদে বহুতর লক্ষপতির অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ হইয়াছেন।

আজ এই কথা বলিয়া আমরা সকলের কাছে গৌরব করিতে পারি যে, এতকাল আমাদের পিতা যেমন আমাদিগকে দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি ধনের গণ্ডীর মধ্যেও আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। পৃথিবী আমাদের সম্মুখে মুক্ত ছিল—ধনী দরিদ্র সকলেরই গৃহে আমাদের যাতায়াতের পথ সমান প্রশস্ত ছিল। সমাজে যাঁহাদের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা হীন ছিল, তাঁহারা সুহৃদ্‌ভাবেই আমাদের পরিবারে অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছেন, পারিষদভাবে নহে—ভবিষ্যতে আমরা ভ্রষ্ট হইতে পারি, কিন্তু আমরা ভ্রাতাগণ দারিদ্র্যের অসম্মানকে এই পরিবারের ধর্ম্ম বলিয়া জানিতে পাই নাই। ধনের সঙ্কীর্ণতা ভেদ করিয়া মনুষ্যসাধারণের অকুণ্ঠিত সংস্রবলাভ যাঁহার প্রসাদে আমাদের ঘটিয়াছে, তাঁহাকে আজ আমরা নমস্কার করি।

তিনি আমাদিগকে যে কি পরিমাণে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহা আমরা ছাড়া আর কে জানিবে! যে ধর্ম্মকে তিনি ব্যাকুল সন্ধানের দ্বারা পাইয়াছেন, যে ধর্ম্মকে তিনি উৎকট বিপদের মধ্যেও রক্ষা করিয়াছেন, যে ধর্ম্মের উদ্দেশে তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মকে তিনি আপনার গৃহের মধ্যেও শাসনের বস্তু করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ছিল, তাঁহার উপদেশ হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই, কিন্তু

কোনো নিয়মের শাসনে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে, আমাদের কর্ম্মকে বদ্ধ করেন নাই। তিনি কোনো বিশেষ মতকে অভ্যাস বা অনুশাসনের দ্বারা আমাদের উপরে স্থাপন করিতে চান নাই—ঈশ্বরকে, ধর্ম্মকে স্বাধীনভাবে সন্ধান করিবার পথ তিনি আমাদের সম্মুখে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই স্বাধীনতার দ্বারা তিনি আমাদিগকে পরম সম্মানিত করিয়াছেন—তাঁহার প্রদত্ত সেই সম্মানের যোগ্য হইয়া, সত্য হইতে যেন স্খলিত না হই, ধর্ম্ম হইতে যেন স্খলিত না হই, কুশল হইতে যেন স্খলিত না হই! পৃথিবীতে কোনো পরিবার কখনই চিরদিন একভাবে থাকিতে পারে না,—ধন ও খ্যাতিকে কোনো বংশ চিরদিন আপনার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না—ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণচ্ছটার ন্যায় এই গৃহের সমৃদ্ধি নিশ্চয়ই একদিন দিগন্তরালে বিলীন হইয়া যাইবে, ক্রমে নানা ছিদ্রযোগে বিচ্ছেদ-বিশ্লেষের বীজ প্রবেশ করিয়া কোন্ একদিন এই পরিবারের ভিত্তিকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া দিবে—কিন্তু এই পরিবারের মধ্য দিয়া যিনি অচেতন সমাজকে ধর্ম্মজিজ্ঞাসায় সজীব করিয়া দিয়াছেন, যিনি নূতন ইংরাজিশিক্ষার ঔদ্ধত্যের দিনে শিশু বঙ্গভাষাকে বহুযত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যিনি দেশকে তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার তপঃপরায়ণ একলক্ষ্য জীবনের দ্বারা আধুনিক বিষয়লুব্ধ সমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পুনঃস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই পরিবারকে সমস্ত মনুষ্যপরিবারের সহিত সংযুক্ত করিয়া-দিয়া, ইহার সর্ব্বোচ্চ লাভকে সমস্ত মনুষ্যের লাভ করিয়া-দিয়া, ইহার পরম ক্ষতিকে সমস্ত মনুষ্যের ক্ষতি করিয়া-দিয়া আমাদিগকে যে গৌরব দান করিয়াছেন, অন্য সমস্ত ক্ষুদ্র মানমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া অদ্য আমরা তাহাই স্মরণ করিব ও একান্ত ভক্তির সহিত তাঁহার নিকটে আপনাকে প্রণত করিয়া দিব ও যাঁহার মধ্যে তিনি আশ্রয়লাভ করিয়াছেন, সমস্ত ধনমানের ঊর্দ্ধে, খ্যাতিপ্রতিপত্তির ঊর্দ্ধে তাঁহাকেই দর্শন করিব!

হে বিশ্ববিধাতঃ, আজ আমাদের সমস্ত বিষাদ-অবসাদ দূর করিয়া দাও—মৃত্যু সহসা যে যবনিকা অপসারণ করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া তোমার অমৃতলোকের আভাস আমাদিগকে দেখিতে দাও! সংসারের নিয়ত উত্থানপতন, ধনমানজীবনের আবির্ভাবতিরোভাবের মধ্যে তোমার "আনন্দরূপমমৃতং" প্রকাশ কর। কত বৃহৎ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হইতেছে, কত প্রবল প্রতাপ অস্তমিত হইতেছে, কত লোকবিশ্রুত খ্যাতি বিস্মৃতিমগ্ন হইতেছে, কত কুবেরের ভাণ্ডার ভগ্নস্তূপের বিভীষিকা রাখিয়া অন্তর্হিত হইতেছে—কিন্তু হে আনন্দময়, এই সমস্ত পরিবর্ত্তনপরম্পরার মধ্যে "মধু বাতা ঋতায়তে" বায়ু মধুবহন করিতেছে, "মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" সমুদ্রসকল মধুক্ষরণ করিতেছে—তোমার অনন্ত মাধুর্য্যের কোনো ক্ষয় নাই—তোমার সেই বিশ্বব্যাপিনী মাধুরী সমস্ত শোকতাপ বিক্ষোভের কুহেলিকা ভেদ করিয়া অদ্য আমাদের চিত্তকে অধিকার করুক্!

মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধীঃ, মধু নক্তম্ উতোষসঃ, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যোরস্তু নঃ পিতা, মধুমান্নো বনস্পতিঃ, মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ!

ওষধীরা আমাদের পক্ষে মাধ্বী হউক রাত্রি এবং উষা আমাদের পক্ষে মধু হউক, পৃথিবীর ধূলি আমাদের পক্ষে মধুমান্ হউক, এই যে আকাশ পিতার ন্যায় সমস্ত জগৎকে

ধারণ করিয়া আছে ইহা আমাদের পক্ষে মধু হউক্, সূর্য্য মধুমান্ হউক্ এবং গাভীরা আমাদের জন্য মাধ্বী হউক্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরে নিম্নোক্ত সঙ্গীত হইয়া শ্রাদ্ধ-সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

যাওরে অনন্ত ধামে দেহতাপ পাসরি
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি,
শোক নাহি যে লোকে,
কেবলি আনন্দ স্রোত
চলেছে প্রবাহি॥
যাওরে অনন্ত ধামে. অমৃত নিকেতনে,
শ্রান্তিহর শান্তিময় বিরাম-বিতানে।
দেবঋষি, রাজঋষি, ব্রহ্মঋষি যে লোকে
ধ্যানভরে গান করে একতানে।
যাওরে অনন্তধামে জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে
শুভ্র সেই চির বিমল পুণ্যকিরণে
যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান,
যাও তুমি, যাও সেই দেব সদনে॥

সুরট মল্লার—একতালা।

তাঁরে রেখো রেখো তব পায়
যেথা ভবের জ্বালা জুড়ায় হে
ভবের জ্বালা জুড়ায়।
যেথা জরা নাহি আসে,
মরণ নাহি গ্রাসে,
শোক তাপ দূরে যায়;
সেই শীতল অমৃত ছায়।
যিনি সবারে ত্যজিয়ে
তোমারে খুঁজিয়ে
ফিরেছেন ধরামাঝে?
যাঁরে বিষয় বাসনা ভুলায়ে,
রত করিলে তোমারি কাজে॥
এবে করমে ধন্য ধরমে পুণ্য
ফুরাল সে জীবন,
আজি অনাথ মোদের
কর কর তব কল্যাণ বিতরণ;
তাঁর শেষ সাধ ছিল "বাড়ী যাব"
হল পূর্ণ সে আকিঞ্চন
ওগো জগতজননি লভিলেন তব
শান্তির নিকেতন॥

পঞ্চসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

প্রাতঃকাল।

সভাগৃহ যথাসময়েই লোকপূর্ণ হইয়াছিল। বন্দনাগীত সমাপ্ত হইলে আচার্য্যেরা বেদি গ্রহণ করিলেন। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় নিম্নোক্ত রূপে উদ্বোধন করিলেন।

আজ মাঘের সেই একাদশ দিবস। আজিকার উৎসব কোলাহল ভেদ করিয়া বিষাদের ক্রন্দন—হাহুতাশ চারিদিক হইতে সমুত্থিত হইতেছে। ভারতীয় সমগ্র হিন্দু-সমাজ যাঁহাকে পাইয়া গৌরবান্বিত, যাঁহার ভাস্বর পুণ্যজীবনে প্রাচীন ঋষিভাব পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বিদেশীয় ধর্ম্মের দুরন্ত আক্রমণ—নাস্তিকতার ভীষণ মুখব্যাদান হইতে জন্মভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য যিনি সফলতার সহিত সর্ব্বপ্রথমে একাকী অদম্য তেজে অগ্রসর হইয়াছিলেন, শিক্ষিত জনসমাজকে প্রকৃত ধর্ম্ম ও সাধনার দিকে আকর্ষণ করিবার কল্পে যিনি সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া দেহের শেষ রক্তবিন্দু পাত করিয়াছিলেন, যাঁহার অক্ষয় উদার ভাণ্ডার প্রকৃত সত্যধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য চিরপ্রমুক্ত ছিল, যাঁহার অমায়িক স্নেহধারা—যাঁহার অতুল্য চরিত্রবল সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলকে সমানভাবে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ রাখিয়াছিল, সেই মহান্ আদর্শ আজ আমা-

দের মধ্য হইতে তিরোহিত। সে ধ্রুবতারা অলক্ষ্য দূরদূরান্তর গগনে আজ উদ্ভাসিত। জাহ্নবীর জলে দেবেন্দ্রনাথের দেহের পবিত্র ভস্মরাশি বিধৌত হইয়া গিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের অভাবে আজ আমরা দিশাহারা লক্ষ্যহীন, সমগ্র ভারতবর্ষ গাঢ় তমসাচ্ছন্ন, আমরা সকলে পিতৃহীন!

উৎসবক্ষেত্রে একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য যে আজ সকলে মিলিত হইয়াছ, যাঁহার কৃপায় এই পরিপুষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্ম—উন্নততম একেশ্বরবাদ পাইলে, আজ তাঁহার উদ্দেশে কি প্রণিপাত করিবে না? পিতৃহীন ভ্রাতৃবৃন্দ! সর্ব্বাগ্রে আজ পিতৃতর্পণ কর, যে পিতার পিতা পরমপিতার পূজার্চ্চনার অধিকারী হইবে।

এই সেই পবিত্রমন্দির, যেখানে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনব্যাপী তর্কতরঙ্গ সার্থকতা লাভ করিয়াছিল, এই সেই পবিত্র বেদী যেখান হইতে মহর্ষিদেবের কণ্ঠনিঃসৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র ব্যাখ্যান সমাগত ভক্তমণ্ডলীর অন্তরে প্রেমভক্তির তড়িচ্ছটা সঞ্চারিত করিয়াছিল, সম্মুখে এই সেই পবিত্র স্থান যেখানে বসিয়া মহর্ষি প্রতিদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র শিক্ষা প্রদান করিতেন! মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, জীবনব্যাপী আরব্ধ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া দিব্যলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার পুণ্য পদাঙ্করেখা অনুসরণ করিতে আজ সকলে অগ্রসর হও। ব্যক্তিগত জীবনে ত দূরের কথা, যদি আমাদের সমষ্টিগত জীবনে মহর্ষির বিমল চরিত্রের অত্যুন্নত সত্যনিষ্ঠার অত্যুগ্র তপস্যার আভাস মাত্রও প্রতিফলিত হয়, তবে নিশ্চয় জানিও, যে আমাদের এত আদরের ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের কখনই বিনাশ নাই।

যখন পৃথিবীর চারিধার অন্ধকারময় হয়, তখনই স্বর্গের দিকে সকলের পতিত হয়; যখন এখানকার আশা ম্লানভাব ধারণ করে, তখন চাতকের ন্যায় মনুষ্য সতৃষ্ণ নয়নে ঈশ্বরের চরণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে; যখন শোক তাপের নিষ্পীড়নে হৃদয়ের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়, তখন সে অমৃতবারির আশ্বাসে যোড়করে ঊর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান হয়। ঈশ্বরের প্রেমমুখ তাঁহার উৎসাহজনন আশ্বাসবাণী ঘোর বিপদের সময় যেমন অনুভূত হয়, এমন আর কোন অবস্থাতে নহে। সেই জন্যই বলিতেছি, উৎসবমুখে আজ আবার উদ্বোধনের আবশ্যক কোথায়? সেই পরম পিতা পরম মাতা আমাদের সন্তাপাশ্রু মার্জ্জনা করিয়া দিবার জন্য এখনই এখানে বিরাজমান, আমাদের দুর্ব্বলতা পরিহার করিবার জন্য আজ এখানে অবতীর্ণ। তাঁহাকে অন্তরে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহার সস্নেহ বাহুবেষ্টনের মধ্যে আপনাদিগকে সুরক্ষিত জানিয়া, তাঁহার মঙ্গলময় উদার আলিঙ্গনের দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে অবস্থিত জানিয়া, আইস আমরা ঋষিগণ ও দেবেন্দ্রনাথের উষ্ণ-নিশ্বাস-বিজড়িত পবিত্র মন্ত্রে, এই পবিত্র নিকেতনে, এই পুণ্যদিনে, সেই দেবদেবের পূজার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হই। দেবেন্দ্রনাথের অমোঘ আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া আইস এখনই এখানে সকলে জীবনের সাফল্য সম্পাদন করি।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এই উপদেশ পাঠ করিলেন।

যিনি সত্যের পরম নিধান তাঁহার ইচ্ছাতে সৃষ্টি স্থিতি লয়। তাঁহার ইচ্ছা যখন জাগ্রত হয় তখন সৃষ্টি, তাঁহার ইচ্ছা যখন কার্য্য করে তখন স্থিতি এবং সেই

ইচ্ছা যখন বিশ্রাম করে তখন লয়। তাঁহার ইচ্ছাই বৈচিত্র্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য বিধান করে, তাঁহার ইচ্ছাই জড়ের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে, তাঁহার ইচ্ছাই হৃদয়ের মধ্যে আত্মাকে স্থাপন করে। আত্মা জগতের সুন্দরতম উচ্চতম পদার্থ, আত্মাই সেই সত্যের জ্ঞান-চ্ছায়া, প্রেম-চ্ছায়া, মঙ্গল-চ্ছায়া। এখানে যত দুঃখ, যত শোক, যত দুর্গতি তাহা মনকে দগ্ধ করিয়াও আত্মার সংস্পর্শে স্বয়ং দগ্ধ হইয়া নির্ব্বাণ হয়। এইজন্য সকল বেদ একবাক্যে বলেন যে আত্মা দ্রষ্টব্য, আত্মা শ্রোতব্য, আত্মা মন্তব্য—এইজন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, আত্মা দ্রষ্টব্য, আত্মা শ্রোতব্য, আত্মা মন্তব্য। সে আত্মা কোথায় প্রতিষ্ঠিত? আত্মা পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহা পূর্ণরূপে শিক্ষা দিয়াছেন বলিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ণ। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই পরম সত্যের আলোক-তরঙ্গ হইতে প্রবাহিত হইয়া যে মহাপুরুষের পবিত্র হস্তে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তিনি তাহা এখানে রাখিয়া ঈশ্বরের আহ্বানে উত্তরায়ণপথে ব্রহ্মধামে গমন করিয়াছেন। কে সেই ধন্য পুরুষ? তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তাঁহার বিধান এই যে মানবগণ প্রত্যহ দ্বিসন্ধ্যা ব্রহ্মোপাসনা করিবেক, সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা করিবেক, মাসিক ব্রহ্মোপাসনা করিবেক এবং সম্বৎসরে ব্রহ্মোৎসব করিবেক।

আজ ব্রহ্মোৎসবের দিন, আজ ব্রহ্মোৎসব পূর্ণ হইল। সেই মহাপুরুষ পৃথিবীতে ব্রহ্মনাম প্রচার করিবার জন্য ১৭৩৯ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃহস্পতিবাসরে উষালোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নিষ্কলঙ্ক সত্যভাবে দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, সংসার ও সিদ্ধির পূর্ণ আদর্শ মনুষ্যমণ্ডলীর মঙ্গলের জন্য দিকে দিকে বিস্তীর্ণ করিবার জন্য আপনার শরীর, মন, আত্মা, বিষয় বৈভব ব্রহ্মযজ্ঞে আহুতি দিয়া নিষ্কাম হইয়াছিলেন। ব্রহ্মনাম-সরোবরে শুভ্র শতদল পদ্মের ন্যায় তাঁহার চিত্ত চিরস্থির। সেই দেব দেবেন্দ্রনাথ, ঐ দেখ, অমরনিকেতনে পরমপিতা পরমেশ্বরের অমৃত-ক্রোড়ে বসিয়া আমাদের সহিত উৎসবানন্দে আজ পুলকিত। দেবগণ তাঁহার চারিদিকে সমাসীন, স্বয়ং পরমপিতা তাঁহার মুখে অমৃত দান করিতেছেন। শুন ঐ দেবদুন্দুভির মধুর ধ্বনি, শুন ঐ অমৃত-বাণী ব্রহ্মনাম—কেবল মর্ত্ত্যে নয়, লোক-লোকান্তর আনন্দিত করিয়া বিঘোষিত হইতেছে। ভুলিয়া যাও আজ শোক তাপ, ভুলিয়া যাও আজ মোহ মায়া, ভুলিয়া যাও আজ অভাব অনুতাপ। আজ কেহ ক্রন্দন করিও না, আজ অধিকতর আনন্দের দিন, কেন না মহর্ষি আজ ব্রহ্মলোক অমৃতধামে। আজ পরমেশ্বরের পরম ভক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অমরধামে। তিনি জীবনের যে পরমাদর্শ ঈশ্বরের নিকট হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহত্যাগে আজ তাহা স্ফুটতর ভাবে আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রকাশিত। আজ ইহলোক ও পরলোকের সঙ্গে যে সম্বন্ধ তাহা স্পষ্টতর অনুভব করিতেছি, আজ আত্মা পরমাত্মার যে যোগ তাহা জাজ্বল্য রূপে দর্শন করিতেছি। আজ বুঝিলাম "দ্বা সুপর্ণা" শ্রুতির কি অর্থ, আজ বুঝিলাম, "ঋতং পিবন্তৌ" শ্রুতির কি অর্থ, আজ বুঝিলাম কি প্রকারে ঈশ্বরে আত্মসমাধান করিতে হয়, আজ বুঝিলাম কি প্রকারে ব্রহ্মে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারা যায়। মহর্ষির জন্মে শিক্ষা, জীবনে শিক্ষা, দেহত্যাগে শিক্ষা। তাঁহার তিরোভাবে আজ মাঘোৎসব ধন্য হইল। তাঁহার তিরোভাবে আজ শিক্ষা পূর্ণ হইল, তাঁহার

তিরোভাবে আজ জ্ঞান উজ্জ্বল হইয়া সর্ব্ব-কর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া ত্যাগের ধর্ম্ম, নিষ্কাম ধর্ম্ম জাগ্রত ও জীবন্ত হইল। হে ভক্ত ব্রাহ্মগণ, হে ধর্ম্মানুরাগী সাধু সজ্জনবর্গ, আজ আমরা তাঁহার উপদেশ শিক্ষা করিয়া, তাঁহার আদর্শের আলোকে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জীবন-পথে পর্য্যটন করি। আজ কেহ শূন্য বক্ষে, শূন্য হস্তে গৃহে ফিরিও না—শাশ্বত আনন্দ সম্মুখে; সেই আনন্দস্বামী, মঙ্গলময় মহাসুন্দর, জীবননাথ সম্মুখে দীপ্যমান রহিয়াছেন দেখিয়া কৃতার্থ হও।

হে পরমপিতা, অখিল মাতা! সূর্য্য অস্তমিত হইলে যেমন দিকদিগন্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ সেই মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের তিরোধানে আজ আমার সমুদায় হৃদয় যে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে; তুমি যেমন একদিন সকল দেবতার বল হরণ করিয়াছিলে সেইরূপ আজ যে আমার সকল বল অপহৃত হইয়াছে! আমার চক্ষু অন্ধ, মস্তিষ্ক বিকৃত, উদ্যম আহত এবং মন মুহ্যমান হইয়া গিয়াছে। এই বিপদ সময়ে হে দীননাথ হে পরম গতি, একবার দেখা দিয়া আমাকে জীবন্ত কর। তোমার ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা কর। আর একবার মহর্ষির আত্মাকে আমার আত্মার সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া তাঁহার ও তোমার অভয়-বাণী শ্রবণ করাইয়া এবং তোমার কোমল ক্রোড়ে তাঁহার আবির্ভাব প্রকাশ করিয়া মৃত প্রাণে জীবন-সঞ্চার কর।

পরে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হয়।

সায়ংকাল।

সন্ধ্যাকালের উপাসনা মহর্ষিদেবের গৃহ-প্রাঙ্গণে হইয়াছিল। ব্রহ্মোৎসব হইবে না এ কথা পূর্ব্ব হইতেই প্রচার হয় এ জন্য লোকসমাগম তাদৃশ হয় নাই। উপাসনাদি পূর্ব্ববৎই হইয়াছিল। প্রথমে বেদগান হইলে আচার্য্যেরা বেদিগ্রহণ করেন। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব নিম্নোক্তরূপে উদ্বোধন করিলেন।

আজ আবার ভারতবর্ষ ব্রহ্মোৎসবের পুণ্য গন্ধে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আবার আজি ভূর্ভুবঃস্বর্লোকবাসী দেবমানবের কণ্ঠে অভয় ব্রহ্মনামের বিজয় মঙ্গলগান ধ্বনিত হইতেছে! কিন্তু হায়, এই মঙ্গলকোলা-হলের অভ্যন্তরে এবার মর্ত্ত্য মানবের কোমল কণ্ঠের পরিস্ফুট বিষাদের সুর মিশ্রিত!

পাঁচদিন পূর্ব্বে ভারতের ভাগ্যাকাশ হইতে যে পরমোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অস্তমিত হইয়াছে, তাহাতে আজ সমস্ত দেশ বিদেশের সমগ্র সাধুসজ্জনসমাজে শোকের হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে!

সমস্ত পৃথিবীতে ভারতের আধ্যাত্মিক গুরুত্বগৌরব যে অখণ্ড মহাতত্ত্বের উপর নির্ভর করে, তাহা অবিনাশী হইলেও নষ্টভাগ্য ভারতের সকল সৌভাগ্যের সঙ্গে যখন অন্তর্হিত হইতেছিল, তখন-কার সেই ঘোর দুর্দ্দিনে বিধাতার করুণায় সেই নির্ব্বাপিতপ্রায় সত্যতত্ত্বের মঙ্গলদীপ যে ক্ষণজন্মা পুরুষসিংহের তরুণহৃদয়-মন্দিরে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; যৌবনের দুর্ভেদ্য মোহরাশি দলিত বিদলিত করিয়া—পৈত্রিক অতুল বিষয় বৈভব মণিমাণিক্য অতুল্য সম্মান অসামান্য অগণ্য বিলাসোপ-করণ তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া যিনি একদিন বৈরাগ্যের আড়ম্বরহীন তুঙ্গতায় পৃথিবীর নশ্বর ঐশ্বর্য্যের উদ্ধত গর্ব্বকে সবলে পদানত ও খর্ব্ব করিয়াছিলেন; যিনি কঠোর সাধনে তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমকে লাভ করিয়া তাঁহারি মঙ্গলাদেশ শুনিয়া হিমগিরি-শিখর হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মোহনিদ্রিত

সমগ্র হিন্দুসমাজকে নবতর-কল্যাণতররূপে সনাতন ধর্ম্মের মঙ্গলমন্ত্রে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন; যাঁহার দিব্যবাণীর মঙ্গলাহ্বানে অগণ্য মানবহৃদয় মোহনিদ্রা পরিহার করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হইয়াছে; যাঁহার জীবনব্যাপী জ্বলন্ত ঈশ্বরপ্রেমের পীযূষধারা লক্ষ লক্ষ পাষাণ হৃদয়কে গলাইয়া দিয়াছে; যাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যান প্রাচীন উপনিষদের ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণগণের পূজার বস্তু ও চিরন্তন সহায় হইয়াছে; যে সত্যসঙ্কল্প মহাপুরুষের নিষ্কলঙ্ক পুণ্যজীবন নিবাতনিষ্কম্প দীপের ন্যায় চিরকাল জগতে সত্যের মঙ্গলজ্যোতি বিকীরণ করিয়াছে; যিনি এই ব্রহ্মোৎসবের প্রতিষ্ঠাতা; যিনি এই দীর্ঘকাল স্বয়ং এই মহোৎসব পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন; আমাদের সেই পিতৃস্থানীয় বরণীয় মহাপুরুষ—আমাদের সেই পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—ভারতবর্ষের সেই গৌরব-রবি আজি অস্তগত! তবু আমরা আজ উৎসব করিতে মিলিয়াছি,—অন্তরের অদম্য শোকবেগ সবলে দমিত করিয়া আজ আমরা উৎসব করিব। ইহা ত অন্য উৎসব নহে; ইহা ব্রহ্মোৎসব! ইহা অমর আত্মার অমর উৎসব, ইহা আমাদের দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় মহোৎসব। এই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তিনি—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

যাঁহা হইতে এই ভূত সকল জন্মগ্রহণ করে, জন্মিয়া যাঁহাতে জীবিত থাকে এবং প্রলয়ে যাঁহার প্রতি গমন করে। অতএব জন্মে ও জীবনে যেমন তাঁহার উৎসব, প্রলয়েও তেমনি তাঁহার উৎসব; মৃত্যু কখনও তাঁহার উৎসবদ্বার রুদ্ধ করিতে পারে না। মহাপুরুষের জীবন এবং মরণ উভয়ই ব্রহ্মোৎসবের লীলাভূমি। মহাপুরুষের জীবনে যেমন ব্রহ্মাণ্ডপতির বিচিত্র মঙ্গল-মহিমা পরিস্ফুট হইয়া ত্রিতাপতপ্তদিগের অন্তরে শান্তির বারি সিঞ্চন করে; মহাপুরুষের মৃত্যুতে তেমনি সচ্চিদানন্দময়ের অমৃতরূপ উদ্ভাসিত হইয়া মরণভয়াকুল মর্ত্ত্য মানবকে অমৃতের প্রতি আকর্ষণ করে।

মৃত্যু যখন ঘনঘর্ঘর-ঘোর-ভৈরবরবে সংসারের সকল নশ্বর সুখাস্বাদনধ্বনি শান্ত বিধ্বস্ত করিয়া তাহার বিজয়বৈজয়ন্তী আমাদের নয়নের সম্মুখে প্রোথিত করে, তখনি আমাদিগের পরাপেক্ষী ক্ষুদ্র কর্ত্তৃত্বাভিমানের ব্যাকুল চেষ্টা, অসঙ্গত তুচ্ছ অহঙ্কার লাঞ্ছিত তুচ্ছীকৃত হয়; নিজের ক্ষুদ্রতা—দীনতা,—সংসারের অসহায়তা তখন সূর্য্যালোকের ন্যায় দীপ্যমান হইয়া উঠে; ধন জন মানের—রূপ বল যৌবনের দুর্জ্জয় অভিমান তখন তৃণের মত তুচ্ছ হইয়া—দলিত হইয়া—বিদূরিত হইয়া যায়; তখন বিচিত্র কামনার ভোগ্য বিষয়রাশি দেবতারূপে আবির্ভূত হইয়া আমাদের প্রজ্ঞাচক্ষুকে অন্ধ করিয়া শতরজ্জুতে বন্ধনপূর্ব্বক আমাদিগকে তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরাইতে পারে না। সেই স্তব্ধ শান্ত কালে—সংসারের বিচিত্র কোলাহল যখন স্থগিত, কামনার কঠিন রশ্মিজাল যখন প্রমুক্ত, তখনি ঐ শোন আকাশে ধ্বনিত হইতেছে "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"। মৃত্যুর কঠিন বজ্রপাতে যখন আমরা অসহায় হইয়া—অধীর হইয়া—ব্যাকুল হইয়া ঊর্দ্ধ-পানে তাকাইতেছি তখনি ঐ শোন আমাদের দেবেন্দ্রনাথের দিব্যকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে "ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ম্।"

যিনি প্রতি বৎসর প্রত্যক্ষ রূপে এই উৎসবের মধ্যে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিতেন, মৃত্যুর পার্থিব ব্যবধান ভেদ করিয়া তিনি আজ নিশ্চয় সুদূর অতীত যুগের ঋষিগণের

সহিত এই উৎসবক্ষেত্রে অবতীর্ণ; এ যে তাঁহার প্রাণের ব্রহ্মোৎসব। এক্ষণে আমরা বাস্তবিকই তাঁহার সন্নিকর্ষ অনুভব করিতেছি, শোক দুঃখ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা এক্ষণে বিস্মৃত হও; জন্মে জীবনে মরণে যাঁহার চরণচ্ছায়া সমান ভাবে আমাদের উপরে বিরাজিত, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার মহিমায় অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যে এক অখণ্ড যোগসূত্রে সম্বদ্ধ, যাঁহার মঙ্গলনিয়মে মৃত্যুর যবনিকান্তরালে আত্মা অমৃত; এক্ষণে আমরা তাঁহার উপাসনা করিতে বসিয়াছি।

অন্তর্যামী প্রভো! তুমি আমাদের সকলি দেখিতেছ, সকলি জানিতেছ, যতই কিছু বলি আর যাহাই কিছু ভাবি, আমাদের বিশ্বাস বড় দুর্ব্বল, আমাদের চিত্ত বড় অসহায়! ৬ই মাঘের মধ্যাহ্নে তুমি আমাদের যে ধন—যে মহারত্ন—যে মহামাণিক্য কাড়িয়া লইয়াছ, হে দেব!—হে দেবদেব! তাহাতে শুধু আমরাই দরিদ্র হই নাই—সেই মহাধনের অভাবে আজ সমগ্র বঙ্গদেশ—সমস্ত ভারতবর্ষ—সমস্ত পৃথিবী দরিদ্র হইয়াছে। পূর্ণস্বরূপ! এই মহারত্ন হরণ করিয়া কেন তুমি আমাদিগকে দীনহীন করিলে তাহা তুমিই জান। আমাদের অভয় আশ্রয়তরু ভাঙিয়া দিয়া কেন তুমি আমাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়াছ, তাহা জানি না; তোমার বিশ্বের অনন্ত রহস্যের গুপ্ত দ্বার আমাদের নিকটে সদাই সুগুপ্ত! কিন্তু হে দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়! তুমি যে সকল বিঘ্নবিপত্তিতে নিখিল দুঃখ শোকে আমাদের সঙ্গে রহিয়াছ—তুমি যে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—সকল কালের শরণ্য, এই বিশ্বাস—এই বিশ্বাস-নিষ্ঠা আজ আমাদের অন্তরের মধ্যে সুদৃঢ়রূপে অখণ্ডরূপে প্রতিষ্ঠিত কর। আর সেই মহাপুরুষ—যিনি আজ তোমার সহিত নিত্যযোগযুক্ত হইয়া তোমার মধুরমঙ্গলজয়সঙ্গীতে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধ্যাত্মরাজ্য ধ্বনিত করিতেছেন, তাঁহাকে বল, যেমন এ লোকে তাঁহার অশেষ সরস করুণা আমাদের শত দুঃখ শোক দূর করিয়াছে, তেমনি সকল কালে লোকলোকান্তর হইতে যেন তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদের সুশীতল ধারা আমাদের মস্তকে প্রবাহিত হয়! তোমার করুণা—তোমার ভক্তের আশীর্ব্বাদ আমাদের চিরকালের সহায় হউক! আমাদের দুর্ব্বল শব্দ শক্তি আর ক্ষুদ্র আধ্যাত্মিক বল আজ আমাদিগকে উদ্বোধিত করিতে পারিবে না; আজ সকল দুঃখ শোক দূর করিয়া হৃদয়াকাশের দুর্ভেদ্য মোহমেঘ অপসারিত করিয়া তোমার করুণা আর তোমার ভক্তের আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে উদ্বোধিত করুক্! আমরা তোমার উপাসনা করিয়া ধন্য হই

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

উপাসনা শেষ হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে উপদেশ দিয়াছিলেন সময় ক্রমে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

পরে ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

ইমন—চৌতাল।

শক্তিরূপ হের তাঁর
আনন্দিত, অতন্দ্রিত,
ভূর্লোকে, ভুবর্লোকে,
বিশ্বকাজে, চিত্ত মাঝে,
দিনে রাতে॥
জাগরে জাগ জাগ
উৎসাহে উল্লাসে,
পরাণ বাঁধরে মরণ-হরণ
পরমশক্তি সাথে॥

শ্রান্তি আলস বিষাদ
বিলাস দ্বিধা বিবাদ
দূর কর রে!
চলরে,—চলরে কল্যাণে,
চলরে অভয়ে, চলরে আলোকে
চল বলে!
দুখ শোক পরিহরি
মিলরে নিখিলে নিখিলনাথে॥

ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

(আমার) মন তুমি নাথ লবে হরে'
(আমি) বসে আছি সেই আশা ধরে'।
নীলাকাশে ঐ তারা ভাসে,
নীরব নিশীথে শশী হাসে,
(আমার) দুনয়নে বারি আসে ভরে',
আছি আশা ধরে'।
স্থলে জলে তব ধূলিতলে
তরু লতা তব ফুলে ফলে
নরনারীদের প্রেমডোরে
নানা দিকে দিকে নানা কালে
নানা সুরে সুরে নানা তালে
নানামতে তুমি লবে মোরে
আছি আশা ধরে।

দেশমল্লার—ধামার।

গরব মম হরেছ প্রভু
দিয়েছ বহু লাজ,
কেমনে মুখ সমুখে তব
তুলিব আমি আজ।
তোমারে আমি পেয়েছি বলি
মনে মনে যে মনেরে ছলি
ধরা পড়িনু সংসারেতে
করিতে তব কাজ,
কেমনে মুখ সমুখে তব
তুলিব আমি আজ।
জানিনে নাথ! আমার ঘরে,
ঠাঁই কোথা যে তোমারি তরে,
নিজেরে তব চরণ পরে
সঁপিনি রাজরাজ!
তোমারে চেয়ে দিবস যামী
আমারি পানে তাকাই আমি
তোমারে চখে দেখিনে স্বামী
তব মহিমা মাঝ,
কেমনে মুখ সমুখে তব
তুলিব আমি আজ॥

বাগেশ্রী—তেওরা।

নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে
ওগো অন্তরযামী,
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া
তোমারে হেরিব আমি,
ওগো অন্তরযামী!
জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে,
তোমার চরণে নমিয়া পুলকে,
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম্ম
তোমারে সঁপিব স্বামী,
ওগো অন্তরযামী!
দিনের কর্ম্ম সাধিতে সাধিতে
ভেবে রাখি মনে মনে
কর্ম্ম অন্তে সন্ধ্যাবেলায়
বসিব তোমারি সনে।
দিন অবসানে ভাবি বসে ঘরে
তোমার নিশীথ-বিরাম-সাগরে
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা
নীরবে যাইবে নামি,
ওগো অন্তরযামী!

আড়ানা—একতালা।

সকল গর্ব্ব দূর করি দিব
তোমার গর্ব্ব ছাড়িব না!
সবারে ডাকিয়া কহিব, যেদিন
পাব তব পদ-রেণুকণা!
তব আহ্বান আসিবে যখন,
সে কথা কেমনে করিব গোপন?

সকল বাক্যে সকল কর্ম্মে
প্রকাশিবে তব আরাধনা।
যত মান আমি পেয়েছি যে কাজে,
সে দিন সকলি যাবে দূরে।
শুধু তব মান দেহে মনে মোর
বাজিয়া উঠিবে এক সুরে।
পথের পথিক সেও দেখে যাবে
তোমার বারতা মোর মুখভাবে,
ভবসংসার বাতায়নতলে
বসে রব যবে আনমনা!

কাফি—তেওরা।

যে কেহ মোরে দিয়েছে সুখ
দিয়েছে তাঁরি পরিচয়
সবারে আমি নমি।
যে কেহ মোরে দিয়েছে দুখ
দিয়েছে তাঁরি পরিচয়
সবারে আমি নমি।
যে কেহ মোরে বেসেছে ভাল
জ্বেলেছে ঘরে তাঁহারি আলো
তাঁহারি মাঝে সবারি আজি
পেয়েছি আমি পরিচয়
সবারে আমি নমি।
যা কিছু কাছে এসেছে আছে,
এনেছে তাঁরে প্রাণে
সবারে আমি নমি।
যা কিছু দূরে গিয়েছে ছেড়ে
টেনেছে তাঁরি পানে
সবারে আমি নমি।
জানি বা আমি নাহি বা জানি
মানি বা আমি নাহি বা মানি
নয়ন মেলি নিখিলে আমি
পেয়েছি তাঁরি পরিচয়;
সবারে আমি নমি॥

সিন্ধুবিজয়—তেওরা।

ঐ যে দেখা যায় আনন্দ-ধাম
—দিব্য-শোভন
ভব-জলধির পারে—
মহা জ্যোতিষ্মান্।
শোক-তাপিত-জন সবে চল
সকল দুখ হবে নির্ব্বাণ;
শান্তি পাইবে হৃদয়-মাঝে
প্রেমে পূরিবে মন-প্রাণ।
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ
না জানি কি ধ্যানে মগন!
স্তিমিত-লোচন, বীত-শোচন,
—কি অমৃতরস করে পান!
কি সুধাময় গান গায় গো সুরগণ
কীর্ত্তন করি ব্রহ্ম-নাম;
কোটি সূর্য্য তারা গ্রহগণ
নৃত্য করে তাহে অবিরাম॥

কাফি কানাড়া—কাওয়ালি।

এ কি এ মোহের ছলনা! (হায় রে!)
বার বার ধাই, সুখ-ভ্রমে দুখ পাই,
তবুও হ'ল না কেন চেতনা। (হায় রে!)
ঘোরতর তরঙ্গে পড়ি,
ডুবিল ডুবিল জীবন-তরী,
তারো তারো হরি অকূল-কাণ্ডারী,
চারি দিকে মোহ-ঘন রয়েছে আঁধারি',
প্রভু হে কাতরে কর করুণা॥ (হায় রে!)

বেহাগ—তেওরা।

দাঁড়াও আমার আঁখির আগে
তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে।
সমুখ আকাশে চরাচর লোকে
এই অপরূপ আকুল আলোকে
দাঁড়াও হে!
আমার পরাণ পলকে পলকে
চখে চখে তব দরশ মাগে।
এই যে ধরণা চেয়ে বসে আছে
ইহার মাধুরী বাড়াও হে
ধূলায় বিছানো শ্যাম অঞ্চলে
দাঁড়াও হে নাথ! দাঁড়াও হে!

যাহা কিছু আছে সকলি ঝাঁপিয়া
ভুবন ছাপিয়া জীবন ব্যাপিয়া
দাঁড়াও হে
দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া
তোমার লাগিয়া একেলা জাগে ॥

লুম খাম্বাজ—ঠুংরি।

আজি যত তারা তব আকাশে,
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে।
নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া,
মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া হে,
তব নিকুঞ্জের মঞ্জরী যত
আমারি অঙ্গে বিকাশে।
দিকে দিগন্তে যত আনন্দ
লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ
আমার চিত্তে মিলি একত্রে
তোমার মন্দিরে উচ্ছাসে।
আজি কোনোখানে কারেও না জানি,
শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী হে,
নিখিল নিশ্বাস আজি এ বক্ষে
বাঁশরীর সুরে বিলাসে ॥

Sermons of Maharshi Debendranath

IV.

(Translated from Bengalee.)

SERMON LIV.

God our End and Aim—I.

Bring into the temple of your body the Deity to whom is consecrated the temple of the universe. Set in the firmament of your heart the Supreme Lord who fills the sky that spreads illimitably before us. Accept as the sustainer of your soul Him who is the King of kings and the sustainer of the material and spiritual universes, and enshrine in your heart Him who is the Lord of all. Enthroning God in your mind, devote yourselves to His worship in thought, speech and action. The religion that we have embraced is Brahmoism; Brahma or the Supreme Spirit is the God of Brahmoim. May Brahma be our only end and aim, and may nothing else than Brahma have charm for our mind. We have embraced Brahmoism in order to worship Brahma. May our inner vision be never turned away from Him who is the supreme end and aim of our soul. May our inner eyes be immoveably fixed on that Being who is without beginning and without end and to whom none is superior; may our inner eyes be never diverted from Him by any individual to any finite substance as the object of our worship. After what a long time have we abondoned the worship of finite objects and sought the refuge of the Infinite Spirit! Let none drive us back to the degeneration of matter worship. May we never again be divorced from Him! May God be our end in all that we do and all that we know! To keep our vision steadily fixed upon Him what we want is love for Him; it is only by the force of love for God that the soul can keep itself loyal to Him. It is after a long interval that Brahmoism—the Religion of the one True God—the religion that is so difficult to attain, has made its appearance among us; we have now to protect it with all love and all care. In order to protect this religion we must refine our intellect, we should keep our senses under control, subdue the evli passions, keep our heart pure and the eyes

of our soul ever fixed on God. How will you feel blessed, if you cherish no regard for Brahmoism and feel no longing for God? Our body has been given us for the performance of righteous deeds and we have been endowed with the mind to acquire knowledge; and knowledge looks to God for truths. If we look up to God with love, we behold that He looks at us with love and benignity in His eyes. Resting in Him with love we obtain immortality. It is through our love for God that we rise up daily with the sun, and wakening and uplifting the soul, devote ourselves to His worship with all the members of the family. It is through our love for God that we enthrone Him in the midst of all ceremonies solemnizing the domestic occurrences, and proclaim with all our heart His eternal glory in our our own and other lands. All that we can possibly do under the inspiration of pure love, we can do for the sake of God. Inspired by love of God, we can spend all our strength for Him. God is in our soul, God is in our heart; God is our crown, God is our ornament. When we are afflicted by illness, we flee to Him and cryingly pray to Him for relief; when we find ourselves plunged in perils, we surrender ourselves to Him. God is our medicine in illness and our saviour in perils. He is the food to satisfy our hunger, and He is the drink to slake our thirst.

SERMON LV

God our End and Aim—II.

The Omnipresent Spirit who is self-manifest is ever with us; why can we not then see Him? He is the inner soul of our inner being, yet why can not we behold Him in our inner self? He is our associate from birth to death, and from death to eternity; why do we then forsake His company and choose to remain infatuated by the world? He is the eye of our eyes, the life of our life; why do we not then walk in the world making our heart His abode? What sweetness has the world that it can keep us away from the nectareous sweetness of God? Why do we deprive ourselves of the taste of the divine nectar and pursue the world and its pleasures? God has sent the soul down to this earth, that it may ennoble itself by obeying the laws of righteousness established by Him and then return to His lap and be blessed by beholding His joyous image; yes, the soul is here that it may grow in purity by the performance of righteous deeds, and go back to the Lord's lap and behold His benign countenance. God has sent us here that by work we may ennoble and purify our souls, and we cherish the hope to obtain immortality when we return to His lap with our souls ennobled. From our very infancy, our soul is being trained for its acceptance with God. Even when we were being nourished with mother's milk, the end of our life that through youth and old age we shall grow and develop, and after death obtain God—this end, this desting was in ceaseless work in us then, though we knew it not. But we often miss our end and sink into worldliness and lose God. Distracted by the commotion of worldly life, may we never lose sight of the supreme end of our existence; may we do righteousness and return to the lap of God. God Himself helpeth the satisfaction of this good desire of our heart. We suffer the troubles of life, only that we may be able to come unto God. God exists in our soul as its companion, as one who is joined to it. The sloka "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে" in the Book of the Brahmo Religion is ever vivid in our minds. In this body

of ours dwelleth the Supreme Soul with the human soul. At the command of the Supreme Soul, the human soul doeth righteorsness, and the Supreme Soul rewardeth it according to the merit of its deeds. Realize what a refuge we have in our heart in God in this dreadful world. We are weak, and God, remaining in our soul, removeth our weakness. What fear can we have if we rest in God? As there are stars in the infinite, omnipresent space which can never run away from it, so do the souls exist in the omnipresent, infinite God and can not go away from Him. Behold then the Omnipresent Spirit in your soul and obtain Him. He is our only end and aim. We have become Brahmos; Brahma or the Supreme Soul is our only aim. The worship of Brahma is the only true worship. We have all assembled here in this hall of the Brahmo Samaj so that we may learn how to ceaselessly worship the Brahma. May we never depart from this supreme end of our life. Forefend us, O God, and manifest to us thy being, eternal and imperishable, send to our hearts righteous and good thoughts and feelings and deliver us from the infatuation of the world.

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৫, অগ্রহায়ণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১৮৯৸৵৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬৬৫।০
সমষ্টি	...	৮৫৫ ৵৩
ব্যয়	...	২১৫৸ ৩
স্থিত	...	৬৩৯।৵০

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
১৩৯।৵০

৬৩৯।৵০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ		১৪৩ ৵৩

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
১০৲

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন রায়
১০৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
৫৲

পরলোকগত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের
প্রদত্ত বেঙ্গল বণ্ডেড্ ওয়ার হাউসের
সেয়ারের ডিবিডেণ্ট
মাঃ শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়
৫০৲

কোম্পানির কাগজের সুদ
৬৮৵৯

১৪৩৵৯

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৩।/০
পুস্তকালয়	...	৫ ৵৬
যন্ত্রালয়	...	২৭৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১।০
সমষ্টি	...	১৮৯৸৵৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১২৩৸৵৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৩।/০
যন্ত্রালয়	...	৬৮।/০
সমষ্টি	...	২১৫৸ ৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি
কার্য্যাধ্যক্ষ ও ধনরক্ষক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৫, পৌষ মাস।
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২২৭৸৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬৩৯।৶০
সমষ্টি	...	৮৬৭ ৴।০
ব্যয়	...	২৮০।৶৩
স্থিত	...	৫৮৬৸৴৯

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
৮৬৸৴৯

৫৮৬৸৴৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ১৯৩৲

মাসিক দান।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়
১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত
২৲

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত
১৲

১৯৩৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৲
পুস্তকালয়	...	১৫৸৶০
যন্ত্রালয়	...	১৪৸০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১৸০
সমষ্টি	...	২২৭৸৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৯২৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৬৴৬
পুস্তকালয়	...	৻৯
যন্ত্রালয়	...	৬১৸৴০
সমষ্টি	...	২৮০।৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি
কার্য্যাধ্যক্ষ ও ধনরক্ষক।

১৮২৬ শকের ১লা ফাল্গুন হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ট্রষ্টীগণের আদেশে নিম্নলিখিত আচার্য্য ও কর্ম্মচারীগণ নিযুক্ত হইলেন।

আচার্য্য ও সভাপতি।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উপাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
,, ,, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী।
,, ,, শিবধন বিদ্যার্ণব।
,, ,, শম্ভুনাথ গড়গড়ি।
,, ,, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
,, ,, যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রচারক ও কর্ম্মাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

ধনরক্ষক।

শ্রীযুক্ত বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

গায়ক।

শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী।
,, শ্যামসুন্দর মিশ্র।

বাদক।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে চতুর্দ্দিক হইতে বহুতর সমবেদন পত্র ও টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তদীয় পরিবারবর্গ এই সবিনয় বিজ্ঞাপ্তির দ্বারা সকলের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিতেছেন। প্রত্যেকটীর স্বতন্ত্র উত্তর দেওয়া দুঃসাধ্য হইয়াছে বলিয়া আশা করি সকলে ক্ষমা করিবেন।

ষোড়শ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
চৈত্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৫।
৭৪০ সংখ্যা

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২৬ শক, ২৭ পৌষ।

উপদেশ।

এমন সময় ছিল, যখন কিছুই ছিল না, কেবল অন্ধকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তাহার মধ্যে এক স্বয়ম্ভু সনাতন পুরুষ বিরাজ করিতেছিলেন। তিনিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারই ইচ্ছাতে আকাশে কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র উদ্ভাসিত হইল। তিনি শম্ভুস্বরূপ হইয়া অদ্যাপি ইহাদিগকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এই ভূলোকও তাঁহার সৃষ্টি। আমরা কিছু আপন ইচ্ছাতে এখানে আসি নাই। সেই জগৎপ্রসবিতা পরম মাতাই আমাদিগকে প্রসব করিয়াছেন। এখনও আমরা তাঁহার স্নেহোত্তপ্ত ক্রোড়েই রহিয়াছি। তিনি পৃথিবীকে আমাদের সুখের স্থান করিয়া দেন নাই, ইহা কিছু ফুলের শয্যা নহে। ইহাকে শিক্ষার স্থান করিয়া দিয়াছেন। শিক্ষার স্থান মাত্রেই কঠোর হইয়া থাকে। কঠোর শৈলো পরিও যেমন কোমল শৈবাল জন্মিয়া থাকে, তেমনি কঠোর এই শিক্ষাস্থান হইতেও আমাদের সুশিক্ষা ও সুমঙ্গল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এই পৃথিবী আমাদের অনন্ত উন্নতির প্রথম সোপান। যন্ত্রীর সহিত যন্ত্রের যে সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত আমাদের সে প্রকার সম্বন্ধ নহে। এক স্বাধীন পুরুষের সহিত অপর স্বাধীন পুরুষের যে সম্বন্ধ, তাঁহার সহিত আমাদের সেই প্রকার সম্বন্ধ। ঈশ্বর আমাদের আত্মায় নানা বৃত্তি প্রবৃত্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন। এই সকল বৃত্তি প্রবৃত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারাই এখানকার শিক্ষার উদ্দেশ্য। অপরাপর শিক্ষা ইহার আনুষঙ্গিক। এখানকার শিক্ষার কাঠিন্য এই যে, বাহ্য বিষয় সকল ইন্দ্রিয়রূপ দুর্গ সকলকে সর্ব্বাগ্রে অধিকার করিয়া লয়। আমরা প্রথমে অনেক দূর ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া পড়ি। পরে বুদ্ধিবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইতে থাকিলে ইন্দ্রিয় ও বাহ্য বিষয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার শিক্ষারম্ভ হয়। প্রবৃত্তি দমনই প্রধান শিক্ষা—প্রধান তপস্যা। কত কত মহাজনও এই প্রবৃত্তি দমনে—আত্ম দমনে অস-

মর্থ হইয়া ঘোরতর যাতনায় পতিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও এই প্রবৃত্তি দমনে এক সময়ে অশক্ত হইয়া একবার পাশক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া দুর্গতি ভোগ করিলেন, আবার মোহবশতঃ সেই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বনবাসের অসহনীয় ক্লেশ সহ্য করিলেন। প্রবৃত্তিদোষেই দুর্য্যোধন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া প্রাণ হারাইলেন। প্রবৃত্তিদোষেই যদুবংশ ধ্বংশ হইয়া গেল। আলেকজেণ্ডার সমগ্র পৃথিবী জয় করিলেন, কিন্তু স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিতে পারেন নাই। তিনি যে সংগ্রামক্ষেত্রে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সংসার-সংগ্রামক্ষেত্র তাহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। এখানকার বিভীষিকা দর্শনে কাহার হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার না হয়? কত পাপ কত বিপদ আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের সহিত সংগ্রাম করা কি আয়াসসাধ্য ব্যাপার! এই সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিলেই আমাদের প্রকৃত বল লাভ ও প্রকৃত শিক্ষা হয়। কিন্তু জয়লাভ করিবে কিসের বলে? আমাদের নিজের সে সমগ্র শক্তি কোথায়? কিন্তু শিক্ষাদাতা নিজেই আমাদের উৎসাহদাতা—বলদাতা। তাঁহাকে সেনাপতি করিলেই আমরা এই দুর্জ্জয় রণে জয়লাভ করিতে পারিব। তিনি নিজে জ্ঞানদাতা গুরু হইয়া নিঃশব্দে হৃদয়ের অভ্যন্তরে জয়লাভের উপদেশ দিতেছেন। মাতা যেমন সহজে আমাদিগকে মাতৃভাষা শিক্ষা দেন, তিনি তেমনি আমাদিগকে সহজেই বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া অনন্ত উন্নতির পথে চলিবার শিক্ষা দিতেছেন। আধ্যাত্মিক কর্ণে কেন না আমরা তাঁর সেই উপদেশ শ্রবণ করিব? কেন না তাঁর ইঙ্গিত ধরিয়া চলিব? সেই পরমমাতার শিক্ষা-কৌশল স্মরণ করিলেও রোমাঞ্চিত হইতে হয়। তিনি যথার্থই আমাদের হৃদয়ে মধুর রবে নিঃশব্দে উপদেশ দেন। আমরা যখনই তাহা না শুনিয়া বিপথে পদার্পণ করি, তখনই তিনি তাঁর প্রেমপূর্ণ আনন লুকায়িত করেন। সে সময়ে হৃদয় কেমনই বিষাদে পূর্ণ হয়, কি জ্বালাই উপস্থিত হয়। এই তাঁর সুমধুর দণ্ড। এই শাস্তি পাইয়াই আমাদিগকে পবিত্রতার পথে ফিরিতে হয়। এক সময়ে না এক সময়ে আমাদিগকে ফিরিতেই হইবে। এই তাঁহার শিক্ষার কৌশল, এই তাঁহার করুণার পরিচয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অতি কঠোর দণ্ড ভোগের পূর্ব্বে সহজেই তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেই সুপথে আইসেন তিনি কি ভাগ্যবান্। এখানে থাকিয়াই তিনি সকল বিঘ্ন অতিক্রম করে। প্রেমময়কে লাভ করিয়া তাঁহার কি অপ্রতিম আনন্দ! তিনি নিজে আনন্দে বিভোর হইয়া কত হৃদয়েই সেই আনন্দ সিঞ্চন করেন। তাঁহার জীবনে সুখ মরণে সুখ। এসুখ সংসারের অতীত সুখ। তিনি ইহ সংসারে পবিত্র সুখ ও ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া, মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে গমন করেন। স্বর্গলোকের প্রবেশদ্বারেই দেবতাদিগের প্রেমগান তাঁহার পবিত্র কর্ণে প্রবিষ্ট হয়। তাহা দ্বারাই তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত যাহা কিছু যাতনা ও অপবিত্রতার সংস্কার অপনীত হইয়া যায়। তিনি সেখানে তাঁহার পরমপ্রেমাস্পদকে পাইয়া দেবগণের সঙ্গে পরম সুখী হয়েন। হায়! সে কি শান্তিরসাস্পদ স্থান! তথায় রোগ নাই, শোক নাই, ক্রোধ নাই, দ্বেষ নাই, বিবাদ নাই, বিসম্বাদ নাই, হিংসা নাই, কলহ নাই, যুদ্ধ নাই বিগ্রহ নাই, কেবলই যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস উৎসারিত হইতেছে। তাই যোগী যোগবলে এখান হইতেই সেই আনন্দধাম

দর্শন করিয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে বলিতেছেন,

"ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম,
অপূর্ব্ব শোভন, ভব-জলধির পারে
জ্যোতির্ম্ময়।
শোক তাপিত জন সবে চল
সকল দুখ হবে মোচন।
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে
প্রেম জাগিবে অন্তরে" ॥

হে দেব! তুমি আমাদিগকে এখানে এমন শিক্ষা দাও, যাহাতে আমরা মরণান্তে সেই স্থানের যোগ্য হইতে পারি। এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

সার সত্যের আলোচনা।

বিগত প্রবন্ধে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের কল-কারখানা-সম্বন্ধে যে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহা আনুপূর্ব্বিক এই;—

(১) চক্ষুঃশ্রোত্রাদির সারভূত দশেন্দ্রিয়ের উপর সোয়ার হইয়া রহিয়াছে প্রাণ-মন-বুদ্ধি, এক কথায় অন্তঃকরণ *।

(২) অন্তঃকরণের হস্তে রাশগুচ্ছ বাগানো রহিয়াছে—ত্রিবিধ শক্তি; (১) জীবনী শক্তি প্রাণের হস্তে, (২) ইচ্ছাশক্তি মনের হস্তে, (৩) এবং ধীশক্তি বুদ্ধির হস্তে। ঐ তিনপ্রকার শক্তির স্থূল আবরণ হ'চ্চে তিনপ্রকার তৈজস-নাড়ী;—জীবনী-শক্তির স্থূল আবরণ মর্ম্মবহা নাড়ী, ইচ্ছা-শক্তির স্থূল আবরণ কর্ম্মবহা নাড়ী, ধীশক্তির স্থূল আবরণ চেতোবহা নাড়ী।

(৩) বাহন-ঐ যে সূক্ষ্ম দশেন্দ্রিয়, তাহা সূক্ষ্মশরীরের বহিরঙ্গ; আর সোয়ার-ঐ যে অন্তঃকরণ, তাহা সূক্ষ্মশরীরের অন্তরঙ্গ।

সূক্ষ্মশরীর ঐ দ্বিবিধ অঙ্গের অঙ্গী।

(৪) সূক্ষ্মশরীরের বহিরঙ্গের এ মুড়া হইতে অন্তরঙ্গের ও-মুড়া পর্য্যন্ত একটা ক্রমাভিব্যক্তির সোপান-পথ রহিয়াছে। সেই সোপান-পথের মাঝের ধাপে প্রাণের সঙ্গে দোসর জোটে মন, এবং শেষের ধাপে মনের সঙ্গে দোসর জোটে বুদ্ধি।

(৫) বুদ্ধির দুই অঙ্গ—(১) সামান্য-জ্ঞান এবং (২) বিশেষ-জ্ঞান।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে এইখানে থামিয়া-দাঁড়াইয়া একটি কথা ইঙ্গিত করা হইয়াছিল এই যে, দ্রষ্টা সামান্য-জ্ঞানের দ্বার দিয়া আত্মসত্তা উপলব্ধি করে, এবং বিশেষ-জ্ঞানের দ্বার দিয়া বস্তুসত্তা উপলব্ধি করে। শেষের এই কথাটির আদ্যোপান্ত ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যা'ক্।

প্রাণ, মন, বুদ্ধির উত্তরোত্তর ক্ষেত্রে আগমন।

যে সময়ে শকুন্তলা দুষ্যন্ত রাজার ধ্যানে তদ্গতচিত্তে নিমগ্না, সেই সময়ে যখন দুর্ব্বাসা ঋষি তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন প্রদীপের বর্ত্তিকায় যেমন করিয়া আগুন ধরানো হয়, তেমনি করিয়া দুর্ব্বাসা ঋষির কোপপ্রদীপ্ত মুখরশ্মি শকুন্তলার চাক্ষুষ তৈজস-নাড়ীতে কম্পন ধরাইয়াছিল, তাহাতে আর ভুল নাই। কিন্তু হইলে হইবে কি—সে তৈজস-কম্পন যেখানে আরব্ধ হইয়াছিল, সেইখানেই আটক পড়িয়া রহিয়া গেল। প্রাণের অন্ধকারাবৃত বহিঃপ্রাঙ্গণেই আটক পড়িয়া রহিয়া গেল, তাহার ঊর্দ্ধে মনের দীপালোকিত চেতনাগৃহে বাহিয়া উঠিতে পারিল না। যাহাই হো'ক্ না কেন—শকুন্তলার

* কি কারণে প্রাণকে অন্তঃকরণের কোঠায় স্থান দেওয়া বিধেয়, তাহা পূর্ব্বের এক প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে।

নয়নারবিন্দে তুর্ব্বাসা ঋষির জটাজূটধারী ছবি যাহা পড়িয়াছিল, তাহাও তো এক-প্রকার চাক্ষুষ-ক্রিয়া? তাহাও তো দ্যাখা। কিন্তু সে দেখা একপ্রকার অন্ধকারে ছায়া দ্যাখা, তাহা না-দ্যাখা'রই নামান্তর। মন কিন্তু আশ্চর্য্য সোনার কাটি! মনের সং-স্পর্শমাত্রে চাক্ষুষ-ক্রিয়ার ঘুম ভাঙিয়া যায়; ঘুম ভাঙিয়া যায় বটে, কিন্তু চক্ষুতে তবুও ঘুমের ঘোর লাগিয়া থাকে। ফলে, মনের দ্যাখা একপ্রকার স্বপ্ন-দ্যাখা;—তাহা প্রাণের দ্যাখা'র ন্যায় সুপ্ত দ্যাখাও নহে, আর, বুদ্ধির দ্যাখা'র ন্যায় প্রবুদ্ধ দ্যাখাও নহে—পরন্তু তুয়ের মাঝামাঝি। শুধু-কেবল "দেখিতেছি-মাত্র" বলিলে যেরূপ দ্যাখা বুঝায়, তাহাই মনের দ্যাখা! দেখি-তেছি-মাত্র রকমের দ্যাখা যে একপ্রকার স্বপ্ন-দ্যাখা, তাহার প্রমাণ এই যে, স্বপ্নকালে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা দেখিতেছি-মাত্র ছাড়া আর-কিছুই নহে। স্বপ্নকালে দ্রষ্টার শরীরে চেতনা (Sensation) যে থাকে না, তাহা নহে; স্বপ্নের বন-ভ্রমণে গায়ে কাঁটা বিঁধিলে স্বপ্নদর্শকের চেতন হয় খুবই—হয় না কেবল চৈতন্য (Self-consciousness)। স্বপ্ন-কালে দ্রষ্টার একটিবারও এরূপ চৈতন্য হয় না যে, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। স্বপ্নকালে দ্রষ্টার চেতনা (Sensation) থাকে, কিন্তু চৈতন্য (Self-consciousness) থাকে না;—আত্মবিস্মৃতি স্বপ্নের কণ্ঠাশ্লেষিণী সখী। মণি অপেক্ষা মাণিক্যের মূল্য অনেক বেশী, এটা যখন সকলেরই জানা কথা, তখন এ কথা বলা বাহুল্য যে, চেতনার অপেক্ষা চৈতন্যের মূল্য অনেক বেশী। চৈতন্য অপূর্ব্ব স্পর্শমণি! চৈতন্যের সংস্পর্শে মনের স্বপ্ন ভাঙিয়া-গিয়া পূর্ব্বমুহূর্ত্তে যাহা দেখিতেছি-মাত্র ছিল, পরমুহূর্ত্তে তাহা জানিতেছি হইয়া উঠে। চৈতন্য বুদ্ধিরই অন্তরঙ্গ। তাই বুদ্ধির দ্যাখা মনের দ্যাখা অপেক্ষা আরো এক-ধাপ উচ্চ অঙ্গের দ্যাখা। মনের দ্যাখা সচেতন, কিন্তু সজ্ঞান নহে। বুদ্ধির দ্যাখাই সজ্ঞান দ্যাখা। মন দেখে-মাত্র; বুদ্ধি দেখে শুধু না, সেই সঙ্গে জানে যে, আমি অমুক বস্তু দেখিতেছি। দ্যাখা'র সঙ্গে এইরূপ যখন জানা'র দ্যাখাসাক্ষাৎ হয়—চৈতন্যের দ্যাখাসাক্ষাৎ হয়—তখন দ্রষ্টার চক্ষু হইতে স্বপ্নের ঘোর চলিয়া যায়; স্বপ্নের ঘোর চলিয়া গেলে সত্যাস-ত্যের খোঁজ পড়ে; সত্যাসত্যের খোঁজ পড়িলে বুদ্ধি স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; স্বকার্য্য-সে আর-কিছু না—সত্যের অবধারণা। ফল কথা এই যে, যেমন গৃহ-বিড়াল বনে গেলেই বন-বিড়াল হয়, তেমনি প্রাণের অচেতন দ্যাখা মনে পৌঁছিলেই সচেতন দ্যাখা হয়, এবং মনের আত্মবিস্মৃত রকমের অজ্ঞান দ্যাখা বুদ্ধিতে পৌঁছিলেই সজ্ঞান দ্যাখা হয়। সজ্ঞান দ্যাখা'র কার্য্যক্ষেত্রে বুদ্ধির তুই অঙ্গ একত্রে খাটে; এক অঙ্গ হ'চ্চে সামান্য জ্ঞান, আর-এক অঙ্গ হ'চ্চে বিশেষ-জ্ঞান।

বুদ্ধির যুগলাঙ্গ।

বুদ্ধিপ্রদেশের কোনো একটি ছোটো-খাটো জ্ঞানক্রিয়া ধরা যা'ক্—যেমন "আমি জানিতেছি যে, আমি গোলাপফুল দেখিতেছি" এই একটি জ্ঞান-ক্রিয়া। এরূপ স্থলে আমার জ্ঞান একযোগে তুইটি ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতেছে; একটি ব্যাপার হ'চ্চে আমি জানিতেছি, আর-একটি ব্যাপার হ'চ্চে আমি গোলাপফুল দেখিতেছি। বুদ্ধির এই যে দ্যাখা, এটা দ্যাখা শুধু না—এটা এক-প্রকার জানা। জানিতেছি'র সংস্পর্শ গুণে দেখিতেছিও একপ্রকার জানিতেছি হইয়া দাঁড়াইতেছে; তাহা না হইবে কেন? পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি যে, জ্ঞান একপ্রকার

স্পর্শমণি। জ্ঞানের সংস্পর্শগুণে দেখিতেছি যখন জানিতেছি হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাকে জ্ঞান বলিব না তো আর কি বলিব? তাহা জ্ঞান তাহাতে আর ভুল নাই; তবে কিনা, তাহা বিশেষ একপ্রকার জ্ঞান; তা বই, তাহা সামান্যজ্ঞান নহে—নির্বিশেষ জ্ঞান নহে। কেন না, দেখিতেছি-ব্যাপারটি বিশেষ একপ্রকার জ্ঞানের ধর্ম্ম—চাক্ষুষ-জ্ঞানের ধর্ম্ম; তা বই, তাহা নির্বিশেষে (বা সামান্যত) সকল জ্ঞানের ধর্ম্ম নহে—জ্ঞানমাত্রেরই ধর্ম্ম নহে। জানিতেছিই সামান্যত সকল জ্ঞানের ধর্ম্ম—জ্ঞানমাত্রেরই ধর্ম্ম। তবেই হইতেছে যে, "আমি জানিতেছি যে, আমি গোলাপফুল দেখিতেছি" এই মোট জ্ঞানক্রিয়াটা'র অঙ্গ দুইটির একটি হ'চ্চে আমি জানিতেছি—এটা সামান্য-জ্ঞান; আর-একটি হ'চ্চে আমি গোলাপফুল দেখিতেছি—এটা বিশেষ-জ্ঞান।

আত্মসত্তা এবং বস্তুসত্তা।

বুদ্ধির ঐ যে দুই অঙ্গ—সামান্য-জ্ঞান এবং বিশেষ-জ্ঞান, তাহাদের মধ্যে প্রথম অঙ্গটি অর্থাৎ সামান্য-জ্ঞান দুভাঁজ-করা কাগজের মতো দ্বিমণ্ডিত। সামান্য-জ্ঞানে ব্যাপার একটি দেখিতে পাওয়া যায় বড়ই আশ্চর্য্য, তাহা এই:—

"আমি যে জানিতেছি" এটাও জানিতেছি, জানিতেছি-কে জানিতেছি। সামান্য-জ্ঞান নিজেও যেমন, সামান্য জ্ঞানের বিষয়ও তেমনি, দুইই জানিতেছি ভিন্ন আর-কিছুই নহে। সামান্য-জ্ঞানকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তুমি কি জানিতেছ?—তোমার জ্ঞেয় বিষয় কি? সামান্য-জ্ঞান বলিবে যে, এইটা কেবল আমি জানিতেছি যে, আমি জানিতেছি; আমার জ্ঞেয়-বিষয়ই হ'চ্চে আমি জানিতেছি। তবেই হইতেছে যে, সামান্যজ্ঞানে আপনার নিকটে আত্মসত্তা স্বতঃপ্রকাশমান।

অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, জানিতেছি-কেও যেমন, দেখিতেছিকেও তেমনি—দুটা'কেই জানিতে পারা যায় কেবল জ্ঞানে; তা বই, দুয়ের কোনোটিকেই চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্ঞান-ক্রিয়াকেও চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না, দর্শন-ক্রিয়াকেও চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। জানিতেছি'র নিকটে প্রকাশ পায় "জানিতেছি, এবং "দেখিতেছি" দুইই; পক্ষান্তরে, দেখিতেছি'র নিকটে জানিতেছি তো প্রকাশ পায়ই না—তা ছাড়া, দেখিতেছি নিজেও প্রকাশ পায় না। জানিতেছি'র কাছে জানিতেছি প্রকাশ পায়, কিন্তু দেখিতেছি'র কাছে দেখিতেছি প্রকাশ পায় না। তবেই হইতেছে যে, "আমি জানিতেছি" এই সামান্য-জ্ঞানে আত্মসত্তা প্রকাশ পায়; পক্ষান্তরে, "আমি গোলাপফুল দেখিতেছি" এই বিশেষ-জ্ঞানে আত্মসত্তা প্রকাশ পায় না। বিশেষ জ্ঞানে—কি তবে প্রকাশ পায়? বস্তু-সত্তা প্রকাশ পায়। "আমি গোলাপফুল দেখিতেছি" এই বিশেষ জ্ঞানে দৃশ্যমান গোলাপফুলের সত্তাই প্রকাশ পায়।

কেহ বলিতে পারেন—"বিশেষ-জ্ঞানে দৃশ্যমান গোলাপফুলের সত্তা প্রকাশ পায়" এ যাহা তুমি বলিতেছ, এ কথা আমি মানি; কিন্তু "সামান্য-জ্ঞানে আত্মসত্তা প্রকাশ পায়" এ কথাটা আমার নিকটে তেমন প্রামাণিক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। সত্য বটে যে, সামান্য-জ্ঞানে জ্ঞানের নিজ-সত্তা প্রকাশ পায়, কিন্তু জ্ঞানের নিজ-সত্তা তো আর আত্মসত্তা নহে, জ্ঞাতা'র নিজ-সত্তাই আত্ম-সত্তা।" ইহার উত্তরে পাতঞ্জল-যোগসূত্রের প্রসিদ্ধ বৃত্তি-কার ভোজ-রাজ কি বলিতেছেন—তাহা প্রণিধান কর।

পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রের সমাধিপাদের নবম সূত্র এই যে, "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।" 'শব্দ-জ্ঞানের পাছু-পাছু দৌড়ায় যে-একপ্রকার বস্তুশূন্য অধ্যবসায় (অর্থাৎ ফাঁকা আওয়াজ), তাহারই নাম বিকল্প।" বৃত্তিকার ইহার ভাবার্থ খোলসা করিয়া ভাঙিয়া বলিতেছেন এইরূপ ঃ—

বস্তুনস্তথাত্বমনপেক্ষমাণো যোঽধ্যবসায়ঃ স বিকল্প উচ্যতে। যথা পুরুষস্য চৈতন্যং স্বরূপমিতি। অত্র দেবদত্তস্য কম্বল ইতি শব্দজনিতে জ্ঞানে ষষ্ঠ্যা যোঽধ্যবসিতো ভেদস্তমিহাবিদ্যমানমপি সমারোপ্য প্রবর্ত্ততেঽধ্যবসায়ঃ। বস্তুতস্তু চৈতন্যমেব পুরুষঃ।"

ইহার অর্থ।—বস্তুটা যে কি, তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া যদি কোনো কথা শূন্যের উপরে দাঁড় করানো হয়, তবে তাহারই নাম বিকল্প ; যেমন, "পুরুষের (অর্থাৎ আত্মার) চৈতন্য" এই কথাটি। আত্মার চৈতন্য বলিলে বুঝায়—দেবদত্তের কম্বলের ন্যায় চৈতন্য যেন আত্মার উপরে বাহির হইতে চাপানো হইয়াছে। বস্তুত চৈতন্যই আত্মা।

স্কট্‌লাণ্ডদেশীয় প্রসিদ্ধ দর্শনকার হ্যামিল্টন্‌ও তাহাই বলেন। চৈতন্য কিনা Selfconsciousness.। পঞ্চদশীর গ্রন্থকার বলেন —"সংবিৎ"ই (consciousness) আত্মা। তিন কালের তিন মহাপণ্ডিত একবাক্যে বলিতেছেন যে, চৈতন্যই আত্মা। এরূপ একটা সর্ব্ববাদিসম্মত কথা'র ছল ধরিতে চেষ্টা না করিয়া উহার তাৎপর্য্য এবং মর্ম্ম সবিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝিয়া দেখাই শ্রেয়ঃকল্প। এ কথা তো কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, চৈতন্য আপনি আপনার নিকটে প্রকাশ পায়। তবেই হইতেছে যে, চৈতন্য আপনিই জ্ঞান, আপনিই জ্ঞাতা, আপনিই জ্ঞেয়, তিনই একাধারে। অতএব এটা স্থির যে, চৈতন্যরূপী সামান্য-জ্ঞানে আত্মসত্তা স্বতঃপ্রকাশমান। তা ছাড়া, সাংখ্যসারনামক একখানি অনতিপ্রাচীন গ্রন্থে এইরূপ লেখে যে,

"দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধো জানেহমিতি ধীবলাৎ।"

"সামান্যত 'জানিতেছি' এইরূপ বুদ্ধির বলেই দ্রষ্টা সিদ্ধ হয় অর্থাৎ দ্রষ্টার সত্তা সপ্রমাণ হয়।" আমরাও তাহাই বলিতেছি ; বলিতেছি যে, দ্রষ্টা সামান্য-জ্ঞানের দ্বার দিয়া আত্মসত্তা উপলব্ধি করে।

সামান্য-বিশেষের পরস্পরাপেক্ষিতা।

উপরে দেখা গেল যে, বুদ্ধির জ্ঞানালোকে যখন সত্তা প্রকাশ পায়, তখন আত্মসত্তা এবং বস্তুসত্তা, দুইই একযোগে প্রকাশ পায়। আত্মসত্তা প্রকাশ পায় সামান্য-জ্ঞানে ; বস্তুসত্তা প্রকাশ পায় বিশেষ-জ্ঞানে। তাহার মধ্যে একটি কথা আছে ; সেটি এই ঃ—

শুধু-কেবল মাথাটাকে অথবা শুধু-কেবল ধড়টা'কে যেমন সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন শরীর বলা যাইতে পারে না, তেমনি, শুধু-কেবল সামান্য-জ্ঞানকে অথবা শুধু-কেবল বিশেষ-জ্ঞানকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন জ্ঞান বলা যাইতে পারে না। সামান্য-জ্ঞানও যেমন, বিশেষ-জ্ঞানও তেমনি, দুইই জ্ঞানের একাঙ্গ-মাত্র ; তা বই, দুয়ের কোনটিই পূর্ণাবয়ব জ্ঞান নহে। সামান্য-জ্ঞান চায় বিশেষ-জ্ঞানকে ; বিশেষ-জ্ঞান চায় সামান্য-জ্ঞানকে। ধীশক্তির কার্য্যই হ'চ্চে সামান্য-জ্ঞানকে বিশেষ-জ্ঞান দিয়া ফোটাইয়া তোলা এবং বিশেষ-জ্ঞানকে সামান্য-জ্ঞান দিয়া শোধন করিয়া তোলা। বিষয়টি যেমন গুরুতর, তেমনি দুরূহ ; অতএব এবারে এইখানেই সমাপ্তি করা বিধেয়। সামান্য-বিশেষের মধ্যে, তথৈব আত্মসত্তা এবং বস্তু-সত্তার মধ্যে, শক্তির কিরূপ চলাচলি হয় ; এবং দুয়ের মধ্যে মর্ম্মান্তিক ঐক্যসূত্রই বা কিরূপ, এই সকল দুরূহ বিষয়

বারান্তরের আলোচনার জন্য হাতে রাখিয়া দেওয়া হইল।

নেয়ার জাতি।

এই জাতি মালাবার উপকূলে বাস করে। ইহারা একপ্রকার হিন্দু। ইহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং আচার ব্যবহার যার পর নাই অতি অদ্ভুত। ইহারা ভূতযোনিতে বিশ্বাস করে এবং কহিয়া থাকে যে রাত্রে ভূত প্রেত প্রভৃতি বহির্গত হয় এবং তাহাদের নিজ নিজ কাজ করে, কিন্তু দিবাভাগে তাহারা দেখা দেয় না। সুতরাং যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাহারা নিজেদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য শেষ করিতে না পারে তবে তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আরও মানুষ যদি তাহাদিগকে দেখিতে পায় তাহা হইলেও তাহারা কাজ হইতে বিরত হয়। ঐদেশে এরূপ প্রবাদ আছে যে এই সকল ভূত প্রেতদিগের হাতে অনেক কাজ আছে এবং রাত্রি শেষে তাহাদিগকে কাজ হইতে বিরত হইতে হয় বলিয়া দেশের স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণ গৃহ, পুস্করিণী প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। একটী গল্প আছে। "এক দিন সমস্ত ভূত একত্র হইয়া কাজের প্রত্যাশায় তাহাদের দলপতির নিকট গিয়াছিল। দলপতি তাহাদিগকে কাজ দিল। তাহারা তাহা সম্পূর্ণ করিয়া আবার তাহার কাছে গেল। দলপতি তখন পাশা খেলিতেছিল। তাহার বেশী কথা কহিবার সময় ছিল না। সুতরাং সে তাহাদিগকে সমুদ্রের তরঙ্গ গুণিতে আজ্ঞা দিয়া নিবিঘ্নে খেলিতে লাগিল। ভূতগণও আদেশ পাইয়া তথা হইতে চলিয়া আসিল। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা বুঝিল যে তাহাদের কার্য্য শেষ হইবার নহে। বড় কষ্ট হইল। কিন্তু কি করিবে? তাহারা ত অবাধ্য নয়। কাজেই দলপতির আজ্ঞা মত তাহারা সেই কাজই করিতে লাগিল, এবং এখনও করিতেছে। নেয়ার জাতি বাঙ্গালা দেশের ন্যায় বৎসরের নির্দ্দিষ্ট একদিন চন্দ্র দেখিলে অশুভ হয় তাহাতে বিশ্বাস করে। একটী গল্প আছে। একদিন ভগবান গণপতি উত্তম মধ্যম রূপ ভোজনের পর বনপথ দিয়া যাইতে যাইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। কেহ তাঁহার এ অবস্থা দেখিল কি না ইহা জানিবার জন্য তিনি চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। দেখিলেন কেহ নাই, কেবল আকাশের চন্দ্র তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন। ইহাতে গণপতি এতই ক্রুদ্ধ হইলেন যে তিনি বৎসরের ঐ দিন যে ব্যক্তি চন্দ্র দর্শন করিবে তাহার উপর অভিসম্পাত করিলেন। তাই উক্ত দিবস চন্দ্র দর্শন করিলে বড় অমঙ্গল হয়।

মালাবার অধিবাসী নেয়ারদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস খুব প্রবল এবং তাহাতে কুসংস্কারও অনেক। বাঙ্গালাদেশের ন্যায় বহু পুরাকাল হইতে তাহাদের মধ্যে সাপের পূজা প্রচলিত আছে। ইহাতে তাহাদের বিশ্বাসও প্রায় অটল। তাহাদের মধ্যে বাস্তুসাপ বড় পূজার পাত্র। গোখুরা সাপ মারা বড় ভয়ানক কার্য্য বলিয়া তাহাদের ধারণা। কারণ সাপই গৃহের রক্ষক। যদি সর্পের ক্রোধোদ্দীপন কর তাহা হইলে সংসারের কাহারও না কাহারও গুরুতর বিপদ হইবে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ আছে। ইহারা যাদু বিদ্যার প্রভাবে সাপকে বশীভূত করিতে পারে। ইঁহাদের গৃহে অনেক গোখুরা সাপের বাস আছে। এমন কি চলিতে গেলে প্রায়ই সাপের গায়ে পা পড়ে। কিন্তু সেই সকল সাপ গৃহের কাহারও অনিষ্ট করে না, বরং তাহাদের উপকার করে

এবং কথা শুনে। যদি কাহাকেও গোখুরা সাপে দংশন করে তাহা হইলে তাহার বিষ ঝাড়াইবার জন্য এই ব্রাহ্মণদিগকে ডাকা হয়।

নেয়ারদিগের বিবাহ প্রথায় ধর্ম্মের তত সম্বন্ধ নাই এবং বিবাহে বিশেষ বন্ধনও কিছু নাই। ইহা একরূপ যথেচ্ছাচার। তবে হিন্দুজাতির যেমন সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ উহাদের তেমনি এক ধারায় বিবাহ নিষিদ্ধ। আজ কাল এই ঘৃণিত প্রথার সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে। তাহাদিগের মধ্যে বিবাহের বন্ধন কিছু মাত্র নাই বলিয়া সম্পত্তির অধিকার স্ত্রী-পরম্পরাক্রমে আবদ্ধ। পুত্র কদাচ সম্পত্তি অধিকার করিতে পায় না। এই জাতি পিতাকে নগণ্যের মধ্যে ধরে, সাংসারিক কার্য্যে তাহার গৌরব কিছুমাত্র নাই। মাতা হইতেই বংশের ধারা চলিয়া থাকে। সম্পর্ক দুর হইলেও ইহারা তাহা স্বীকার করে যদি কোনও ক্রমে মাতৃধারায় মিলিয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং"।

শাঙ্কর ভাষ্য সম্মত অর্থ।

শ্বেতকেতু কহিলেন পিতঃ যে বস্তু জ্ঞাত হইলে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারা যায় তাহা কি আমাকে বলুন। এই প্রশ্নে আরুণি কহিলেন, সৌম্য! "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং।" সৎ অর্থে অস্তিতামাত্র, যাঁহাকে সমস্ত বেদান্তে সূক্ষ্ম, নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বগত, এক, নিরবয়ব, বিজ্ঞান স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে ইহাই সৎ। 'এব' অবধারণার্থ প্রযুক্ত। অবধারণ কিরূপ পরে তাহা কথিত হইতেছে। এই যে নামরূপক্রিয়াবৎ বিকারী জগৎ উপলব্ধি করিতেছ ইহা সৎই ছিল। কোন্ সময়ে? 'অগ্রে' অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে।

তুমি বলিতেছ উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎ ছিল, তবে কি এখন অর্থাৎ বর্ত্তমান অবস্থায় সৎ নয়? অবশ্য এখনও ইহা সৎই, কিন্তু এখন নামরূপবিশেষণবৎ এবং 'ইদং' অর্থাৎ 'এই' শব্দের এবং তদ্বুদ্ধির বিষয় এই জন্য ইদং অর্থাৎ 'এই' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। উৎপত্তির পূর্ব্বে কিন্তু কেবল সৎ শব্দ ও তৎবুদ্ধির গম্যমাত্র ছিল এই জন্য 'সৎ এব' এইরূপ অবধারণ করা হইয়াছে। অবশ্য বলিতে পার অবর্ত্তমান অবস্থাতেও জগতকে যখন সৎ বলিতেছ তখন 'ইদং' শব্দ ও তৎবুদ্ধি কেন না তাহাতে প্রযুক্ত হয়? আমি প্রত্যুত্তরে বলিব যেমন সুষুপ্তাবস্থায় বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও 'ইদং' এই শব্দ ও তৎবুদ্ধির গোচর হয় না সেইরূপ উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ সৎ হইলেও নামবৎ ও রূপবৎ 'ইদং' 'এই' ইত্যাকার ব্যবহার তৎসম্বন্ধে হইতে পারে না। যদি বল সুষুপ্তিতে বস্তুসত্তা থাকে না। তোমার এ কথা ঠিক নয়, তোমার এই বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। সুষুপ্তিতে বস্তুসত্তা থাকে। কারণ সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির বস্তুসত্তার অনুভূতি হয় কিন্তু অনুভূত বস্তু ও অনুভবিতার অভাব ঘটিলে কখন অনুভূতি হইতে পারে না, বস্তুত সুষুপ্তিতে বস্তু সৎমাত্র থাকে। সেইরূপ উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ কেবল সৎমাত্র ছিল এইরূপ বুঝিও। এই বিষয়টী দৃষ্টান্ত দিয়া তোমাকে বলিতেছি শুন। মনে কর কোন ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্ণে মৃৎপিণ্ড প্রসারিত দেখিয়া গ্রামান্তরে গিয়াছিল। অপরাহ্ণে সে প্রত্যাগত

হইয়া সেই স্থানেই ঘটশরাবাদি নানা ভেদ ভিন্ন কার্য্য দর্শন করিয়া বলিয়া থাকে এই ঘটশরাবাদি পূর্ব্বাহ্নে কেবল মৃত্তিকাই ছিল, এ যেমন সেইরূপ উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎই ছিল এ কথার অর্থ এইরূপই বুঝিও।

'একমেব' একই এ কথার তাৎপর্য্য এই স্বকার্য্যপতিত অন্য আর কিছুই নাই 'একমেব' দ্বারা তাহাই বুঝাইতেছে। তৎপরে আছে 'অদ্বিতীয়' ইহার তাৎপর্য্য এই, যেমন মৃত্তিকার ঘটাদি আকারে পরিণতি হইবার পক্ষে কুলালাদি নিমিত্ত কারণ দৃষ্ট হয় সেইরূপ সৎব্যতীত সতের সহকারি কারণ অন্য কোন বস্তু নাই 'অদ্বিতীয়' এই বিশেষণ দ্বারা তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহার দ্বিতীয় কোন বস্তন্তর নাই এই অর্থেই অদ্বিতীয়।

ভাল, বৈশেষিকেরা সমস্তেরই তো সৎসামানাধিকরণ্য স্বীকার করে। কারণদেখা যায় দ্রব্যগুণাদিতে সৎশব্দ ও তৎবুদ্ধির অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। যথা সৎ দ্রব্য, সৎ গুণ, সৎ কার্য্য।

হাঁ, ইদানীং অর্থাৎ বর্ত্তমানে তাহাই বটে কিন্তু বৈশেষিকেরা উৎপত্তির পূর্ব্বে একই সৎ অদ্বিতীয় বলিতে চায় না। উহাদের মতে তৎকালে কার্য্যের অসত্তা। সুতরাং মৃদাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা বৈশেষিকপরিকল্পিত সৎ হইতে এই সৎকে ভিন্ন কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের একরূপতা এবং দৃষ্টান্তের কার্য্য কারণের অভিন্নতা হেতু বৈশেষিক পক্ষ কিছুতেই খাটিতেছে না। সৎকারণবাদিরা কার্য্য কারণকে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করে।

কবিতা।

আর পারিনে গো আর পারিনে
এ জীবনভার বহিতে।
ওগো তোমার দণ্ড দণ্ডে দণ্ডে
পারিনে যে আর সহিতে।
আমি যে দীপ আঁধার কুটীরে
জ্বালাই গো অতি যতনে,
সে দীপ বাতাসে নিবাইয়া দেয়,
অন্ধ করি দুই নয়নে।
আমি ভাসিতে ভাসিতে যে কূলে
যাই গো প্রাণের আশাকে,
তাহাও তখনি স্রোতে ভেঙ্গে যায়
ভেঙ্গে যায় হৃদি আঘাতে
কত দিন হায় আর কত দিন
হবে গো এ ভাবে রহিতে?
আমার পাপের হবে না কি শেষ?
হবে চিরদিন দহিতে?

Sermons of Maharshi Debendranath Tagore.

(Translated from Bengalee.)

SERMON LVI.

Man's Relation to God.

"সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি।"

"All that happens every moment proceeds from that shining Being who is bright as the lightning."

"সনোবন্ধুর্জ্জনিতা সবিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈ-রয়ন্তঃ।"

"He is our friend, He is our father, He is the dispenser of all things-He knows all the worlds and universes. The angels that inhabit the supernatural, divine world, exist in God, tasting of the nectareous sweetness that is in Him."

"তদ্বিপ্রাসোবিপন্যবোজাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণো-র্যৎ পরমং পদং।"

"The Brahmans who have annihilated desire and are wide awake to their spiritual needs worship the supreme feet of the Omnipresent."

"তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যাঃ।"

"All worlds, the whole universe, ask of Him."

From where do all these phenomena proceed ? At whose command does the sun rise every morning ? Whose is the law by which the sun shines the brightest at noon and gives heat to the world ? Whose is the law by which the sun sets in the evening ? Whose is the law by which the moon rises in the sky and sheds a light sweet as nectar ? Whose is the law by which the child is born from the womb, and resembles its parents ? Whose is the law by which the child blooming into youth gladdens the heart of its parents ? Whose is the law by which the youth grows into an old man and develops love of God in himself and is thus ennobled in character ? Whose is the law by which the old man casts aside his decayed body and ascends in spirit to the next world ? Whence do all things proceed ? In whom do they all exist ? Whose is the law by which birth and death are governed ? Whose is the law by which the tree first puts on leaves and then flowers and lastly bears fruit and the fruit becomes so sweet that its juice regale the palate of all who taste it. When the hot season comes and the heat becomes intense, whose is the law by which the clouds gather in the sky, rain falls, and the distressing heat vanishes ? Whose is the law by which with frost comes the winter ? Whose is the law which brings to us prosperity or adversity ? Who is it that causeth all these phenomena ? Who is it that holds the universe ? These are the questions which every one asks. If you could get right answers to the questions, "Whose is the governing power that makes the beneficial laws of the universe ever act without deviation ?" and "Who is the primal source of all the good-evolving work that we observe ?" then your desire for knowledge will be gratified, your hearts will be sanctified, your souls will be ennobled and your lives will be sweetened. But from whom will you get true answers to these queries ? Ever since creation the earth has been revolving round the sun, as if for light on these mysteries, but she has not got it. The sun, though full of light, has no light to throw on these questions. Immanent in the sun dwelleth He who knows the sun to its core, but the sun knows Him not and has ever remained mute about Him. The mountain that rises from the bosom of the ocean and whose lofty peak piercing the clouds touches even the heavens, has also remained speechless ; even this aspiring mountain can not give answers to these questions. Ask of the rose of Shiraj, ask of the lotus floating on the placid bosom of the lake Mànas-sarobar in the Himalayas, ask of the lark, that creature ofthe skies ; they make no answere ; they all are but silent witnsses. If you expect to get the right answers to those questions, then ask the Rishis, bright with the light of knowledge and wisdom acqired by austere spuiritual exercises—the Rishis of ancient India,

who were mighty with the potency of asceticism, fortunate in having been blessed with the grace of the angels, and who, pure and spiritual as they were, felt and realized God through knowledge even as one feels a fruit placed on the palm of the hand ; put your questions to these holy spirits and from them you will get the right answers. Ask them, who is the Being that keeps every thing under unyielding law ? If the sun had been nearer the earth, the earth would have been consumed by its heat, and if it had been further off from the sun it would have been a region covered with snow ; who is it that has placed the sun at such right distance from the earth that its light is rendered the source of life and joy to its inhabitants ? Ask these fortunate Rishis your questions and from them you will get the proper answers, the answers that will gratify your thirst for knowledge, purify your hearts, ennoble your souls and sweeten your lives. Eagerly, lovingly and with all reverence put to the Rishis these questions and see what answers you receive from them. They to whom I beg you to ask these questions said "সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি," "All that happens every moment proceeds from that shining Being who is bright as the lightning". All that happens is not the result of any blind force, but the work of that Supreme Spirit who is without form, yet beautiful. If your hearts and minds are not enveloped by the mist of worldly infatuation you will at once perceive this great truth, and behold that Being, who is the Truth, the Truth of all truths, revealed before you. The spiritual truths which the Rishis learnt through knowledge and inspiration, countless years ago, in the hoary past, have been handed down from one generation to another by word of mouth. Many of the books of ancient India, containing words of deep wisdom have been burnt down, the fetters of subjection have been put around her limbs, the darkness of ignorance has so shrouded her that measureless are the depths of degradation to which she is sinking, yet the divine words of the Upanishads have come down to us, untouched by the hand of destruction, words that sweeten our lives to this day. Reflect on the great fact that no power has availed in destroying these truths. The truths that were uttered by the Rishis who lived in the Himalayas came down flowing to us like the Ganjes and the jumna that take their rise in those very mountains, and by these truths the slumbering intuitions of our soul are being now revived into active life. All that happens is ordained by the Being who is bright as the lightning. This is a truth about which there is not the least doubt. Even as we perceive that all is rendered visible to us because the sun shines in the heavens, so do we discern that law and order reign because God is. Every moment of our life does God protect us. Need we determine God's mercy by any calculation ? His mercy is beyond all calculation, for it is vouchsafed to us every moment of our life. Every moment does God send to us the life that animates us. Verily our life hangs on a moment, the twinkling of an eye ; in a moment it can pass away and then it can not be brought back. All that happens every moment is ordained by God ; yet we live in absolute forgetfulness of God. But He, the Being bright as lightning, never forgets us.

(To be continued)

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৫, মাঘ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১৫৭৮।৵৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৮৬৷৶৯
সমষ্টি	...	২১৬৫ ৻৩
ব্যয়	...	১৫৭১৵৬
স্থিত	...	৫৯৩৸৶৯

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
একেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৯৩৸৶৯

৫৯৩৸৶৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৩৯৮৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮০৲

স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের এক্জীকিউটার মহাশয়গণ

২০৮৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১০০৲

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী

২৲

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী

২৲

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

২৲

শ্রীমতী বর্ণকুমারী দেবী

২৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু

২৲

১৩৯৮৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৫৷০
পুস্তকালয়	...	২২৷৵৬
যন্ত্রালয়	...	১২৬৸০
গচ্ছিত	...	৭৸৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন	...	৭৷৶০
সমষ্টি	...	১৫৭৮।৵৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমজ	...	১৪৭৭ ৻৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৪৸৵৩
পুস্তকালয়	...	৫৲
যন্ত্রালয়	...	৭৪৵৬
সমষ্টি	...	১৫৭১৵৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি
কার্য্যাধ্যক্ষ ও ধনরক্ষক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩১ চৈত্র বৃহস্পতিবার বর্ষশেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। যিনি জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

পরদিন ১ বৈশাখ শুক্রবার নববর্ষ। এ দিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্নপ্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ ৫ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।